কোয়ান্টাম তত্ত্বের আজব দেশ

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

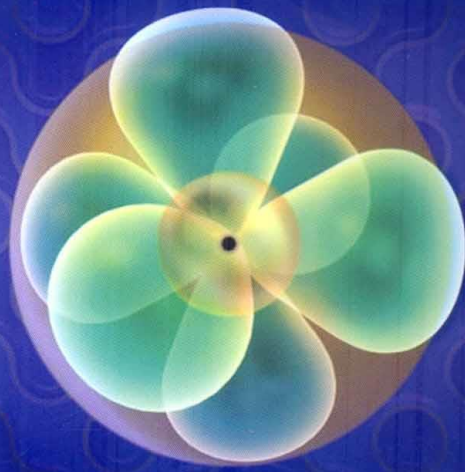

কোয়ান্টাম কথাটির মধ্যে যেন একটি জাদু আছে, সবাই তাতে একটি রহস্যময়তার গন্ধ পায়। কিন্তু আধুনিক পদার্থবিদ্যাকে মৌলিক বাতাবরণ দেয়া এই তত্ত্বটির স্বাদ সহজ কথায়ও দেয়া যায়। পদার্থবিদ্যার যেই চিরায়ত রূপটি আমাদের চিন্তার ভঙ্গির সঙ্গে খাপ খায়, কোয়ান্টাম তত্ত্বে তার অনেক কিছু ওলট্ পালট হয়ে গেছে– রহস্যময়তার কারণটি ওখানেই। অথচ অণু-পরমাণুর পর্যায়ে গিয়ে স্বয়ং প্রকৃতিই কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভঙ্গিতেই শুধু নিজেকে ধরা দেয়। কাজেই যতই আজব দেশের মত মনে হোক্ না কেন, আমাদেরকে ও ভাবেই প্রকৃতিকে উদ্ঘাটন করতে হচ্ছে। আর এই কাজে কোয়ান্টাম তত্ত্ব কিন্তু দারুণ সফল। আজব হয়েও নিখুঁত বাস্তবতা নির্ণয় করতে পারার এই কাহিনী খানিকটা তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে এই বইতে।

প্রচ্ছদ চিত্র: এটমের কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক ছবি (কুয়াশা মডেল)। এতে ইলেক্ট্রনের অবস্থা-সম্ভাবনা বিভিন্ন আকৃতির ও ঘনত্বের 'অরবিটাল'গুলো থেকে ধরা পড়ে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের আজব দেশ

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত বন্ধু
অধ্যাপক আলী আসগরকে
যিনি জটিল বিজ্ঞানকেও দৈনন্দিন আড্ডার
উৎসাহ নিয়ে আলোচনা করে
আনন্দ পেতেন ও আনন্দ দিতেন।

ভূমিকা

কোয়ান্টাম কথাটির মধ্যেই যেন এমন একটি জাদু আছে যে বিজ্ঞানে উৎসাহী সবাই এর প্রতি একটি কৌতুহল অনুভব করে, এর মধ্যে একটি অজানা রহস্যের গন্ধ পায়। দুর্ভাগ্যক্রমে পদার্থবিদ্যার ছাত্রদের কাছে ছাড়া এটি কখনো বড় একটা আলোচনায় আনা হয়না, ফলে রহস্যটি কিছুটা হলেও উপভোগ করা থেকে অনেকে বঞ্চিত থাকে। অন্য দিকে বিজ্ঞানের বাইরে যে কোন কিছুকে কোয়ান্টাম নামে আখ্যায়িত করে তাকেও রহস্যময় করে তোলা কারো কারো জন্য সহজ হয়। এটি ঠিক যে পদার্থবিদ্যার অনেক কিছুর মত এটি খুবই গণিত-নির্ভর একটি বিষয়; কিন্তু তাই বলে খুব সহজ কথায় এর কিছু স্বাদ যে দেয়া যায়না তা নয়, যে কোন সাধারণ পাঠককেই দেয়া যায়। এর জন্য শুরুতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আগের বিজ্ঞানের কয়েকটি মৌলিক বিষয় একটু আনতে হয়– ওই নিউটনের গতির নিয়ম, অণু-পরমাণু, তরঙ্গ, তাপ-আলো-রেডিও ইত্যাদি তরঙ্গের বিকিরণ-এইসব। স্কুলে পড়া এ জিনিসগুলো যাঁরা বহুদিন আগে ভুলে গিয়েছেন তাঁদেরো মনে পড়ে যাবে। মনে পড়া একটু দরকার, কোয়ান্টাম তত্ত্ব এসে এসবকে একেবারে যেভাবে বদলে দিয়েছে সেটি বুঝতে। এমন বদলে যাবার কথা ছিলনা, কারণ সেই নিউটনের আমল থেকে এগুলো এতই সফল এবং এতই প্রতিষ্ঠিত ছিল যে এই বিজ্ঞানকে বলাই হয় চিরায়ত বিজ্ঞান, এতখানি মৌলিক সত্য যে চিরকাল সত্য থাকবে। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব এসে এর সব কিছু গোলমাল করে দিয়েছে। এই গোলমাল করে দেয়াটা বুঝলেই কোয়ান্টাম তত্ত্বে আমাদের হাতেখড়ি হয়ে যায়।

আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্ব এসেছিলো চিরায়ত পদার্থবিদ্যায় দেখা দেয়া কিছু সংকট থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টায়– ওই বিকিরণ তরঙ্গের সংকট, তরঙ্গের আঘাতে কণিকা উৎখাতের ব্যাখ্যার সংকট, এটমের ভেতরের প্রকৃত চেহারা বের করতে গিয়ে সংকট। এই প্রত্যেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে চিরায়ত ধারণা আর চল্‌ছেনা, নতুন ধারণা কোয়ান্টামকে আন্‌তে হচ্ছে। এর ফলে সংকট সমাধানে তরঙ্গকে দেখতে হচ্ছে কণিকার মত করে (যেটি 'কোয়ান্টাম' বা গুচ্ছ), কণিকাকে দেখতে হচ্ছে তরঙ্গের মত করে– যেন রীতিমত বস্তু তরঙ্গ। এভাবে তরঙ্গ আর কণিকাকে একাকার করে ফেলা চিরায়ত বিজ্ঞানের একেবারেই নীতি-বিরুদ্ধ; কিন্তু তবুও প্রকৃতিই যখন তাই বল্‌ছে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় কী। তবে কোয়ান্টামের এসব ধারণা মানতে হয় শুধু খুব ক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষেত্রে, অণু-

পরমাণুর মত ক্ষুদ্র জিনিসে। এর বড় হলে সেখানে কোয়ান্টাম-নীতির প্রভাবটি এতো নগণ্য যে সেগুলোর ক্ষেত্রে চিরায়ত বিজ্ঞানের কোন ব্যত্যয় ঘটেনা। তবে প্রকৃতির অধিকাংশ রহস্যের পেছনে তো অণু-পরমাণুরই জগত– তাই তার ব্যাখ্যা কোয়ান্টাম তত্ত্বেরই দখলে।

ওই যে বস্তু তরঙ্গ, বোঝা গেলো যে তার উঠানামার মধ্যেই কোন কণিকার নানা গতীয় অবস্থা নিহিত থাকে, কিন্তু বস্তু তরঙ্গে যে জিনিসের ওই ওঠানামা তা কোন পরিচিত জিনিস নয়। নানা তাত্ত্বিক অনুমানের পরীক্ষার পর শেষ পর্যন্ত যেটি প্রমাণিত হলো তাতে এই ওঠানামাটি একটি গাণিতিক রাশির ওঠানামা যা ওই অবস্থাগুলোর সম্ভাবনাটিই নির্দেশ করে– সেই হিসেবে এটি সম্ভাবনার তরঙ্গ। এই সম্ভাবনা অবশ্য সরাসরি আমাদের পরিচিত সম্ভাবনা নয়, যেই অর্থে একটি কয়েন টস্ করলে ১০০ বারের মধ্যে ৫০ বার হেড পাওয়ার সম্ভাবনা (সম্ভাবনাটি ৫০ শতাংশ); তবে কোয়ান্টাম তত্ত্বে বস্তু তরঙ্গের ওঠানামার পরিমাণকে এরকম পরিচিত সম্ভাবনার রূপ দেয়া সম্ভব। কোয়ান্টাম তত্ত্ব এভাবে যে কোন কণিকার অবস্থার সম্ভাবনা দিতে পারে– তত্ত্বের সমীকরণ সমাধান করে এই সম্ভাবনা পাওয়া যায়, যেমন কণিকাটি থাকার সম্ভাবনা কোথায় কত। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক একটি ইলেকট্রন ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র পথ পার হয়ে একটি পর্দার কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে পড়বে কি পড়বেনা তার সম্ভাবনা এভাবে পাওয়া গেলো ৫ শতাংশ; এর অর্থ ১০০টি ইলেকট্রন এই কাজ করলে তার মধ্যে ওই বিন্দুতে যাবে ৫টি, বাকিগুলো পর্দার অন্যান্য বিন্দুতে যাবে সেখানকার সম্ভাবনা অনুযায়ী। দেখা গেলো কোয়ান্টাম তত্ত্ব ওভাবে পর্দায় ইলেকট্রনের তুলনামূলক বিন্যাসটি অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, এবং তা হুবহু বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায়। অথচ চিরায়ত তত্ত্ব এভাবে পারেনা– অণু-পরমাণুর জগতে ওই তত্ত্ব একেবারে বিকল। এ কারণেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের জয় জয়কার।

কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয়। উপরের উদাহরণে ১০০টি ইলেকট্রনের মধ্যে ৫টি যে পর্দার ওই বিন্দুতে যাবে সে কথা বলে দিতে পারলেও ঠিক পরের ইলেকট্রনটি সেখানে যাবে কিনা, বা কোন্ ৫টি যাবে এ সম্পর্কে এটি কিছুই বল্‌তে পারেনা। কোয়ান্টাম তত্ত্বে কোন কণিকার সত্যিকার গতিবিধি অনিশ্চিত থেকে যায়। চিরায়ত বিজ্ঞান কিন্তু যে কোন একটি কণিকা কী ভাবে কোন্ পথে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে তা নিখুঁত ভাবে হিসেব করে বলে দেবার দাবী করতো– ওই কারণেই ওটি এমন শক্তিশালী চিরস্থায়ী তত্ত্ব হতে পেরেছিলো; বড় জিনিসের ক্ষেত্রে এখনো ওই দাবী সত্য। ক্ষুদ্র জিনিসের উপযুক্ত তত্ত্ব কোয়ান্টাম তত্ত্ব যে তা পারছেনা এটি কোন কোন বিজ্ঞানীর মর্ম বেদনার কারণ হলেও তাতে আসল

সব ফলাফল নিখুঁত ভাবে পেতে কোন সমস্যা হয়না। এর কারণ আসল ফলাফল অনেক সংখ্যক কণিকার ওপর সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসেবেই আসে, এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্ভাবনা-ভিত্তিক ভবিষ্যদ্বাণী সেখানে দারুণ শক্তিশালী। আসলে আধুনিক পদার্থবিদ্যার প্রায় সব কিছুকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিরিখেই ব্যাখ্যা করতে হয়, সম্ভাবনার ভিত্তিতেই- যে কারণে মনে হচ্ছে প্রকৃতি নিজেই শুধু এই ভিত্তিতেই কথা বল্‌তে রাজি। 'নিশ্চিত' ভাবে কণিকাটির অবস্থা কী, তা বল্‌তে দেয়া প্রকৃতির যেন ইচ্ছে নয়, নীতিগত ভাবেই নয়।

কোয়ান্টাম তত্ত্বই যখন প্রকৃতির নিজেকে তুলে ধরার ভাষা, তার সঙ্গে খানিকটা হলেও পরিচিত হয়ে যাওয়াই ভাল; এই বইটি তারই কিছু চেষ্টা। এতে এখানে ওখানে খানিকটা অংকের উল্লেখ আছে বটে, তবে তা যোগ-বিয়োগ বা সাধারণ গ্রাফ আঁকার বা বোঝার থেকে বেশি কিছু নয়। এতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়েছে যে ভাবে ধাপে ধাপে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে অনেকটা সেভাবে– কারণ ওভাবেই একে বুঝতে সুবিধা। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কিছু প্রয়োগকেও যথাসম্ভব সহজ করে বলার চেষ্টা করা হয়েছে। এর অনেকগুলো বিষয় কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায়না, কোন কোনটির আবিষ্কার বা উদ্ভাবন এ তত্ত্বের কারণেই সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে আছে লেজার, সেমিকন্ডাক্টর, সুপারকন্ডাক্টর, কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থা (এন্টেঙ্গেলমেন্ট) ইত্যাদি। কোয়ান্টাম কম্পিউটার, বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেশন ইত্যাদির মত চলমান দুর্দান্ত গবেষণাগুলোর কিছু পরিচয়ও এতে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কিন্তু এত সব দারুণ সাফল্য সত্ত্বেও এটি স্বীকার করতে হবে যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব আমাদের জন্য একটি আজব দেশ, বিজ্ঞানীরা সহ সব মানুষের জন্যই তাই। এর কারণ আমাদের মস্তিষ্ক কোয়ান্টাম তত্ত্বের মত করে ভাবতে অভ্যস্ত নয়, এটি শুধু চিরায়ত বিজ্ঞানের মত করেই চিন্তা করতে পারে, আমাদের অনুভূতিগুলো ওভাবেই তৈরি। শেষ অবধি আমাদেরকে সব কিছু চিরায়ত বিজ্ঞানের মত করেই বুঝে নিতে নয়– আমাদের দেখা, আমাদের পরিমাপ করা, সবকিছুতেই। কোয়ান্টাম তত্ত্বের রহস্যময়তাটি ও জায়গাতেই।

মুহাম্মদ ইব্রাহীম
জানুয়ারী ২০২১

সূচি

বিজ্ঞানের কিছু চল্‌তি তত্ত্ব - ৯

চিরায়ত বিজ্ঞানের তিনটি সংকট - ২৩

বস্তু তরঙ্গ - ৪৫

বস্তু তরঙ্গেই অবস্থার খবর - ৫৮

শুধু সম্ভাবনার খবরই সম্ভব - ৭৩

অনিশ্চিত এ জগতের ফলাফল নিশ্চিত - ৯০

কোয়ান্টাম জগত - ১১১

বাকি ইতিহাস - ১৪০

বিজ্ঞানের কিছু চল্‌তি তত্ত্ব

আজকের বিজ্ঞানের একটি খুবই চমকপ্রদ তত্ত্বের কথা বলার জন্যই এই বই। কোয়ান্টাম তত্ত্ব এখন পদার্থবিদ্যার সব চেয়ে মৌলিক তত্ত্ব। বিজ্ঞানের এদিকটার সবকিছু এরই আলোকে বিবেচনা করতে হয়; যদিও দৈনন্দিন পরিচিত অনেক কিছুর বর্ণনায় এর প্রয়োজন হয় না। আমরা দৈনন্দিন সেগুলোর ক্ষেত্রে চল্‌তি বিজ্ঞানের ভাষায় কথা বলি। আমাদের ভাবনা চিন্তার বা বোধশক্তির যে প্রকৃতি তাতে ওই চল্‌তি বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলো আমাদের জন্য সহজ ভাবে আসে। কোয়ান্টাম তত্ত্বটি আমাদের চিন্তার কাছে বেশ একটু অদ্ভুতই মনে হয়। কিন্তু এই অদ্ভুত তত্ত্বের মধ্য দিয়েই শুধু প্রকৃতির নিখুঁত ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। এ তত্ত্বের ব্যবহার ছাড়া প্রকৃতির অনেক আচরণের ব্যাখ্যাই করা যাচ্ছেনা। হয়তো প্রকৃতি নিজেও সে রকম অদ্ভুত বলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যাতেই সে সত্যিকার ভাবে ধরা দেয়। আমরা তাই সেই ব্যাখ্যাটিকে বোঝার খানিকটা চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে চল্‌তি তত্ত্বের কিছু কিছু জিনিসকেও একটু দেখা দরকার, নইলে বুঝবো কী করে যে এই চল্‌তি তত্ত্বের বাইরে গিয়ে ওই অদ্ভুত তত্ত্ব প্রয়োজন হলো কেন।

চিরায়তই আরামপ্রদ

একটু উঁকি দিয়ে দেখা কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভঙ্গিঃ

বিজ্ঞানের চলে আসা চিন্তাকে যেমন আগে বলেছি সে রকম চল্‌তি বিজ্ঞানই বল্‌তে পারতাম– কিন্তু তাতে এর প্রতি অবিচার হতো। চল্‌তি এই অর্থে যে আটপৌরে বিজ্ঞানে এখনো এরই ব্যবহার চল্‌ছে– স্কুলের পাঠ্য বিজ্ঞানেও এর বাইরে বড় একটা যেতে হয়না। কিন্তু আরো বড় অর্থে একে বলা হয় চিরায়ত– ধ্রুপদী বা ক্ল্যাসিকাল। যেই অর্থে আমরা বলি ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত বা ক্ল্যাসিকাল চিত্রকলা সেই অর্থে। কোয়ান্টাম তত্ত্বসহ বৈপ্লবিক কিছু তত্ত্ব এর বাইরে চলে গেলেও বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত এই বিজ্ঞান একটি চিরায়ত ধারা বজায় রেখেছে যার কিছু মূল সুরে বার বার ফিরে যেতে হয়। এই অর্থেই এটি ক্ল্যাসিকাল। তিন শ' বছর আগে সেই নিউটনের আমল থেকে আধুনিক বিজ্ঞান যখন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে তখন থেকে এই চিরায়ত বিজ্ঞানের শুদ্ধতায় বিজ্ঞানীদের দারুণ আস্থা জন্মেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে এই আস্থা চরমে পৌছেছিল, তাই মনে করা হয়েছে এই যে নিউটনীয় শুদ্ধ বিজ্ঞান, দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত বিজ্ঞান, তা চিরজীবী

হবে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার পর পরই এই আস্থা, এই শুদ্ধতা, আর টিকে থাকেনি। নতুন নতুন কিছু ধারণা এসে চিরায়ত বিজ্ঞানকে উল্‌টে পালটে দিয়েছে, যেগুলোর মধ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রধান। স্বাভাবিক ভাবে এর ওলট পালট বুঝতে আমাদেরকে চিরায়ত বিজ্ঞানের কিছু কথা দিয়েই শুরু করতে হবে। তবে সবার আগে একটু উঁকি দিয়ে দেখতে চাই অদ্ভুত কোন্ ভঙ্গির বিজ্ঞান এই কোয়ান্টাম তত্ত্ব– যা আমাদের বোধশক্তিতে এত বেঢক্ ঠেকে?

কোয়ান্টাম তত্ত্বে অণু-পরমাণুর ক্ষুদ্র জগতের আচরণ চিরায়ত বিজ্ঞানে তার আচরণ থেকে একেবারেই বদ্‌লে গেছে। বড় কথা হলো এত দিন বস্তু, তরঙ্গ, গতি ইত্যাদির সম্পর্কে যে জিনিসকে যে ভাবে আমরা জানতাম তা যেন এতে এসে নিজেদের পরিচিত অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। যেমন কোন কিছু 'সুনির্দিষ্ট' ভাবে জানি এই কথাটির মানে চিরায়ত বিজ্ঞানে যা, কোয়ান্টাম তত্ত্বে কিন্তু তা নয়। ধরা যাক একটি কণিকা এই মুহূর্তে কোন্ বিন্দুতে আছে, কী তার বেগ, সেই অনুযায়ী পরের মুহূর্তে অন্য কোন্ বিন্দুতে যাবে তার অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। চিরায়ত বিজ্ঞান এটি হিসেব করে নিখুঁত ভাবে বলে দেবার দাবী করে। শুধু চিরায়ত বিজ্ঞানে কেন, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতেও ব্যাপারটি কী ঘট্‌ছে কী ঘট্‌বে সে সম্পর্কে নিশ্চিত জানা যাবে এমনটিই মনে করা হয়। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে তা সম্ভব হয়না। সেখানে এই মুহূর্তে কণিকাটি কোন্ জায়গায় আছে তার উত্তরে বল্‌তে পারি, সব বিন্দুতে কণিকাটির থাকার সম্ভাবনা আছে সেই সব প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য এটি থাকার সম্ভাবনা একটি জটিল রাশি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। এই সব রাশি মিলিয়ে বুঝতে হবে, কণিকাটি কোথায় আছে; এমনি ভাবে মিলিয়ে বুঝতে হবে কী তার বেগ, ইত্যাদি সব খবরও। তার মানে কি এগুলো সুনির্দিষ্ট নয়? ওই রাশিগুলোর হিসেব নিকেশের পর যে ফল বেরিয়ে আসবে তা শুধু সুনির্দিষ্ট নয়, আগের চিরায়ত হিসেব থেকেও অনেক বেশি নিখুঁত। কিন্তু সেটি সুনির্দিষ্ট মোট ফলের জন্য। এক একটি বিশেষ কণিকার ক্ষেত্রে কিসের জন্য এটি কী হবে, কোন্ দিকে যাবে তা আগে থেকে নীতিগত ভাবেও বলা সম্ভব নয়। শুধু বিভিন্ন বিকল্পের সম্ভাবনাগুলো দেয়া সম্ভব।

আসলে সম্ভাবনা কথাটির মানেও এখানে বদ্‌লে গেছে। চিরায়ত বিজ্ঞানে সম্ভাবনা বল্‌তে বুঝি একটি ভগ্নাংশ– যেমন একশ'বার লুডুর দান ফেল্‌লে কতবার ছক্কা পড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে সেই জটিল রাশির দ্বারা যে সম্ভাবনাকে বোঝাচ্ছি এমন সম্ভাবনা আমাদের চিরায়ত বিজ্ঞানে সম্ভব নয়। চিরায়ত বিজ্ঞানে যেমন সবকিছুর একেবারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পর্যায় পর্যন্ত হিসেব করে জানতে পারবো, অন্তত নীতিগত ভাবে সেই পর্যায়েই মাপতে পারবো এই বিশ্বাস ছিল, কোয়ান্টাম

তত্ত্ব জানাচ্ছে সেটি সম্ভব নয়। এটি বরং খুব ক্ষুদ্র পর্যায়ের একটি অনিশ্চয়তার কথা বলে যা বড় বড় পর্যায়ের ফলাফলকেও নিশ্চিত ভাবে বদলে দিতে পারে, একেবারে অকল্পনীয় সব ফলাফল সৃষ্টি করতে পারে।

এসব অদ্ভুত ব্যাপার সত্ত্বেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাফল্য কিন্তু অসামান্য। তাতে বোঝা যায় প্রকৃতি নিজে আমাদের কাছে এভাবেই ধরা দিতে চায়। বিভিন্ন রঙের আলো, পদার্থের নানা গুণ, রাসায়নিক দ্রব্যের বিক্রিয়া ইত্যাদি অনেক সাধারণ ঘটনাকে আমরা চিরায়ত বিজ্ঞানে যেভাবে বুঝতাম বলে মনে করতাম তাতে যথেষ্ট ফাঁক থেকে যায়– একমাত্র কোয়ান্টাম তত্ত্বই সত্যিকার অর্থে এগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারে। আর একক কণিকা, কঠিন পদার্থের কৃষ্টাল, সেমিকন্ডাক্টর, লেজার, অতি-শীতল বস্তু ইত্যাদিকে নিয়ে যে ঘটনা তা একান্তই কোয়ান্টাম তত্ত্বেরই ব্যাপার– ওই তত্ত্বের বাইরে এদের কোন বর্ণনাই অসম্ভব।

চিরায়ত বিজ্ঞান কোন কোন ক্ষেত্রে দারুণ ভাবে ব্যর্থ হবার ফলেই কোয়ান্টাম বিজ্ঞান এসেছে। সেই ব্যর্থতাগুলো বোঝার জন্য চিরায়ত বিজ্ঞানের কিছু কিছু জিনিসকে দেখা দরকার।

চিরায়ত বিজ্ঞানে কণিকা, তরঙ্গ, গতিঃ

চিরায়ত বিজ্ঞানকে আরামপ্রদ বলা যায় এই অর্থে যে প্রকৃতির সবকিছু সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা এটি আমাদেরকে দেয় তা আমাদের মস্তিষ্কের কাছে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়। বাইরে আমরা যা দেখি, এসব যেভাবে বুঝি তার সঙ্গে এ ব্যাখ্যা বেশ খাপ খায়, অন্তত আমাদের বোধশক্তির দিক থেকে। কণিকা, তরঙ্গ, বা গতির মত বিজ্ঞানের বেশ মৌলিক জিনিসগুলোর ক্ষেত্রেও এ কথা বলা যায়। এগুলো এবং চিরায়ত বিজ্ঞানের আরো কিছু জিনিসকে বেছে বেছে আমরা এখানে আলোচনায় আনছি, তার কারণ কোয়ান্টাম তত্ত্বে এগুলোই প্রধানত বদলে গিয়েছে। বদলে যাওয়াটি বোঝার জন্যই এগুলোর দিকে একটু তাকানো প্রয়োজন।

বস্তুর গতিবিধি ব্যাখ্যার আর সে গতি সম্পর্কে হিসেব কষে ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষেত্রে চিরায়ত বিজ্ঞান বরাবর কাজ করেছে। কোন কিছুর এ মুহূর্তের অবস্থান ও বেগ যদি জানি তাহলে অতীতের বা ভবিষ্যতের অন্য যে কোন মুহূর্তে কী হবে তা একেবারেই নিশ্চিত ভাবে বলে দেয়া সম্ভব এর থেকে। এটি করার জন্য মূলত লাগবে নিউটনের তিনটি গতি সূত্র এবং তাঁর মাধ্যকর্ষণ তত্ত্ব। এগুলো স্কুলে সবাই পড়ে; গত তিন শ' বছরে অনেক বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ এগুলো চমৎকার ভাবে ব্যবহারের আরো নানা কৌশল আবিষ্কার করেছেন। মূল সূত্রগুলো কিন্তু

খুবই সহজ। প্রথম গতি সূত্র অনুযায়ী সমবেগে সরল রেখায় চলা কোন বস্তু ওভাবেই চিরকাল চল্‌তে থাকবে যদি না তার ওপর কোন বল্ প্রয়োগ হয়। দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী বল প্রয়োগের সঙ্গে একই অনুপাতে চলন্ত বস্তু তার বেগ পরিবর্তন করে অথবা দিক পরিবর্তন করে। অবশ্য বস্তুটির ভর যত বেশি হবে এই পরিবর্তন একই অনুপাতে ততই কম হবে। তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। আর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব অনুযায়ী যে কোন বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে– উভয়ের ভর যত বেশি আকর্ষণ বল তত বেশি, উভয়ের মধ্যে দূরত্বের বর্গ যত বেশি আকর্ষণ বল তত কম। সঠিক আকর্ষণ বল পেতে ওই দুই বস্তুর ভরের গুণফলকে দূরত্বের বর্গ দিয়ে ভাগ করতে হবে; এবং এই সব কিছুকে মাধ্যাকর্ষণের ধ্রুবক নামে একটি খুব ক্ষুদ্র সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে যেই সংখ্যাটি বাস্তব ক্ষেত্রে আকর্ষণের পরিমাপ থেকেই পাওয়া গেছে। ধ্রুবক মানে সেই সংখ্যা পরিবর্তিত হয়না। মাধ্যাকর্ষণ ধ্রুবক নামের এই ধ্রুবকটির মান মহাবিশ্বের সব কিছুর জন্য একই থাকে, তাই একে একটি বিশ্ব-ধ্রুবক বলা যায়। বিজ্ঞানে অল্প কয়েকটি ধ্রুবক এই রকম।

নিউটনের গতিসূত্র ও মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম ব্যবহার করে এক মুহূর্তের একটি বস্তুর অবস্থান ও বেগ থেকে অন্য যে কোন মুহূর্তে এর অবস্থান ও বেগ খুবই নিখুঁত ভাবে নির্ণয় করা যায়। বেগের জন্য যা পারি, শুরুর এবং শেষের ভরবেগের ক্ষেত্রেও একই কথা আমরা বলতে পারি। ভরবেগ হলো বস্তুটির ভর আর বেগের গুণফল। বস্তুটি অন্য বস্তুকে ধাক্কা দিলে কত জোরে এই সংঘর্ষ হবে তা বোঝার জন্য বেগের থেকে ভরবেগই বেশি সুবিধাজনক। তাছাড়া ভরবেগের একটি চমৎকার গুণ আছে। কোন সিস্টেমের মধ্যে যত বস্তু যত বেগেই থাকুক, সেগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ বা অন্য সব ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় প্রত্যেকটির ভরবেগ যতই বদলে যাক্, ওগুলোর মোট ভরবেগ কিন্তু সব সময় অপরিবর্তিত থাকে– যেই ব্যাপারটিকে বলা হয় ভরবেগের নিত্যতা। অবশ্য এর জন্য শর্ত হলো ওই সিস্টেমের বাইরে থেকে তার ওপর কোন বল্ কাজ করতে পারবেনা। আসলে সিস্টেম বল্‌তে আমরা সে রকম বাইরের জগত থেকে আলাদা করা পরিসর বুঝাই যার পুরোটাকে এক সঙ্গে বিবেচনা করতে পারি। বস্তু সরল রেখায় সমবেগে চল্‌লে আমরা তার ভরবেগ পাই। যদি বক্র রেখায় তা চলে অন্যরকম একটি ভরবেগ তার থাকে, ওভাবে কোনাকুনি গিয়ে সংঘর্ষের জোর যার ওপর নির্ভর করে। এ জন্য একে বলা হয় কৌণিক ভরবেগ। ভর আর বেগ ছাড়াও কত বড় বৃত্ত করে এটি চলে তার ওপরও এর কৌণিক ভরবেগ নির্ভর করে। ভর, বেগ এবং বৃত্তটির ব্যাসার্ধের গুণফলই কৌণিক ভরবেগ। ভরবেগের মত একটি

সিস্টেমের মোট কৌণিক ভরবেগেরও নিত্যতা রয়েছে– শর্তটি হলো বাইরের থেকে এই সিস্টেমের ওপর কোন মোচড় কাজ করতে পারবেনা।

আরো একটি জিনিসের নিত্যতা রয়েছে তা হলো শক্তির। কোন কিছুর শক্তি হলো তার কাজ করার পরিমাণ। গতি থাকলে তাতে শক্তিও থাকবে– সেটি গতীয় শক্তি। গতি না থাকলেও পরে গতি সৃষ্টি হতে পারে এমন পরিস্থিতিতে থাকা জিনিসেরও শক্তি থাকবে– সেটি জমা (পোটেনশিয়াল) শক্তি। যেমন নদীতে বাঁধ দিয়ে পানিকে উঁচু করলে তাতে জমা শক্তি থাকে। গতীয় শক্তির প্রকাশ দুটি পৃথক জিনিসে ঘটতে পারে– একটি হলো কণিকায়, অন্যটি তরঙ্গে। কণিকা বলতে ক্ষুদ্র জিনিস বোঝালেও আভ্যন্তরীন গঠনহীন যে কোন গোলকাকার বস্তুকেই কণিকা বলে ধরে নেয়া যায়। কণিকার মাধ্যমে শক্তির প্রকাশ ঘটলে কণিকাটির নিজ গতিতে শক্তিকে বয়ে নিয়ে যায়– একটি মার্বেল বা একটি বল চলার সময় যেমন শক্তি বয়ে নিয়ে যায়। তরঙ্গ কিন্তু তা করেনা। তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তখন যখন এর মাধ্যমটি কাঁপে বা স্পন্দিত হয়; স্পন্দন কিন্তু একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘটতে থাকে, মাধ্যমটির ওই অংশ কোথাও যায়না, কিন্তু তরঙ্গটি শক্তি বয়ে নিয়ে যায় পর পর সংলগ্ন জায়গাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গিয়ে। পুকুরের পানিতে বার বার হাত ডুবিয়ে আমরা পানির তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারি, যে তরঙ্গ দেখাও যায়। হাত নাড়ানোটি ওখানে তরঙ্গ সৃষ্টির স্পন্দনকারী। এতে পানির তরঙ্গ এগিয়ে যায়, সঙ্গে শক্তিকেও নিয়ে যায়, কিন্তু কাঁপার সময় যেখানকার পানি সেখানেই থাকে। অন্যান্য মাধ্যমে অন্যান্য ভঙ্গিতে আমরা শব্দের তরঙ্গ, স্প্রিং এর তরঙ্গ, দড়ির তরঙ্গ ইত্যাদি নানা তরঙ্গ দেখি বা অনুভব করি। সবক'টিতে ওপরের ব্যাপারগুলো একই থাকে।

শক্তি ওই দুই রূপের একটিতেই শুধু থাকতে পারে; হয় কণিকায় ভর করে, নয় তরঙ্গে ভর করে। একই শক্তি দুই রূপেই থাকতে পারেনা। তাই প্রকৃতিতে যাকে আমরা কণিকা হিসেবে পাই তা সব সময় কণিকাই থাকে, আর যাকে তরঙ্গ হিসেবে পাই তা তরঙ্গই থাকে। একটি মার্বেল বা একটি এটম তাই সব সময় কণিকা, শব্দ তরঙ্গ সব সময়ই তরঙ্গ। পরে দেখবো কণিকা ও তরঙ্গের এই পৃথক সত্তাটি শুধু চিরায়ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই খাটে, কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষেত্রে খাটেনা।

সব তরঙ্গ দেখা যায়না, কাজেই এদের কোন কোনটি যে তরঙ্গ সে কথাটাই বহুদিন স্পষ্ট ছিলনা। যেমন আলো যে একটি তরঙ্গ সেটি শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে আলোর বিভিন্ন আচরণে তরঙ্গের মত আলামত পেয়ে। সব তরঙ্গে এসব আলামত থাকে। যেমন প্রত্যেকটি তরঙ্গের কিছু পরিমাপের বিষয় থাকে–

পুকুরের পানির তরঙ্গ বড় ও দেখা যায় বলে আমরা সেখানে এই বিষয়গুলোকে দেখার ও সহজে মাপার ব্যবস্থা করতে পারি। তরঙ্গের যে ঢেউ-খেলানো আকৃতি তার ওঠানামায় একটি শীর্ষবিন্দু আছে আর একটি তলার বিন্দু আছে। পর পর দুটি শীর্ষবিন্দুর মধ্যে যে দূরত্ব তাকে বলা হয় তরঙ্গ-দৈর্ঘ। একই তরঙ্গেরও নানা রকমফেরে এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ যথেষ্ট ছোট বড় হতে পারে– পুকুরের পানির তরঙ্গ আর সমুদ্রের পানির তরঙ্গে ব্যাপারটি চোখে দেখা যায়। এর সবই রুলার বা ফিতা দিয়ে মাপা যাবে। কিন্তু অন্যদিকে অনেক তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ খুবই ক্ষুদ্র, তা দেখাও যায়না, মাপতে হয় নানা কৌশলে। যে কোন তরঙ্গের মধ্যে এক সেকেণ্ডে কতটি পূর্ণ ঢেউ বা পূর্ণ তরঙ্গ-দৈর্ঘ একটি জায়গা অতিক্রম করে তাকে বলা হয় এর ফ্রিকোয়েন্সি। এটি তরঙ্গ-দৈর্ঘের সঙ্গে সম্পর্কিত; তরঙ্গ-দৈর্ঘ যত ছোট, ফ্রিকোয়েন্সি তত বেশি। তরঙ্গের শীর্ষ এর শূন্য অবস্থান থেকে যত উঁচু হবে সেটি তত বেশি শক্তি বহন করে; যতটা উঁচু সেটিকে বলা হয় তরঙ্গের উচ্চতা। সব তরঙ্গের গতির একটি বেগ থাকে। যেমন পুকুরে হাত নেড়ে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হলো তা সেখান থেকে দূরে পারে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে লক্ষ্য করে তার বেগ মাপা যায়। মনে রাখতে হবে বেগটি মাধ্যমের নয়, শুধু তরঙ্গের।

তরঙ্গের কিছু মৌলিক আচরণ সব তরঙ্গে থাকতে বাধ্য। এর মধ্যে বিশেষ একটি আচরণ দেখে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি যে আলো একটি তরঙ্গ। এই আচরণটিকে বলা হয় ইন্টারফেরেন্স, যার মানে পরস্পরকে ভাঙ্গাগড়া। পুকুরের তরঙ্গের ওপর ব্যাপারটি দেখার চেষ্টা করি। একটি খাড়া তক্তার মধ্যে দুটি বড় বড় খাড়া ফাটল বা ফাঁক সৃষ্টি করি যারা একের থেকে অন্যটা খানিকটা দূরে। তক্তাটির পেছনে পুকুরে বার বার কিছু ডুবিয়ে তরঙ্গ সৃষ্টি করলে এটি এই ফাটল দুটির ভেতর দিয়ে গিয়ে সামনের দিকে এগোবে। দুই ফাটলের মুখে মনে হবে যেন দুটি উৎস থেকে দুটি তরঙ্গ আলাদা ভাবে এগিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং কিছুদূর গিয়ে একটি অন্যটির গায়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। একে বলা যেতে পারে এক তরঙ্গের অন্য তরঙ্গের ওপর 'উপরিপাতন'। সেখানে একটি মজার কাণ্ড দেখবো। ফাটল পার হয়ে পুকুরের পানির ওপর একটি কম চওড়া লম্বা জায়গা দেখবো সেখানে পানির উচ্চতা যথেষ্ট বেশি, কিন্তু তার পাশেই অন্য ওরকম লম্বা জায়গায় এটি একেবারে স্থির। তার পাশে আবার উচ্চতা বেশি, তার পাশে আবার স্থির; এমনি ভাবে পর পর। এরকম বেশি উচ্চ আর স্থিরের মাঝখানটায় সবক্ষেত্রে মাঝারি উচ্চতার অংশ থাকে। এটি হয়েছে ওই ইন্টারফেরেন্স বা পরস্পরকে ভাঙ্গাগড়ার কারণে। দুই ফাটল থেকে দুই তরঙ্গ যখন একের ওপর অন্যটি পড়েছে, তখন কোথাও কোথাও একের শীর্ষবিন্দু অন্যটির শীর্ষবিন্দুর ওপর পড়ে উভয়ে তখন

ঊর্ধমুখী তাই উভয়ে মিলে উচ্চতম গড়াটাই ঘটেছে, একত্র হয়ে দ্বিগুণ উচ্চতা সৃষ্টি করেছে। এর পরের জায়গায় একটির শীর্ষবিন্দুর থেকে অন্যটির শীর্ষবিন্দু কিছুটা পিছিয়ে, কাজেই সেখানে একের শীর্ষ বিন্দুর ওপর গিয়ে পড়ে অন্যের শীর্ষ থেকে কিছুটা নিচের বিন্দু। তাই মোট উচ্চতা সেখানে মাঝারি। কিন্তু এর পাশে আরেকটি জায়গায় এক তরঙ্গের শীর্ষবিন্দু অন্যটির তলার বিন্দুর ওপর গিয়ে পড়েছে– প্রথমটি ছিল ঊর্ধমুখী আর দ্বিতীয়টি নিম্নমুখী। এই দুইয়ে তাই কাটাকুটি হয়ে শূন্য উচ্চতা সৃষ্টি করেছে– এখানটায় পানি তাই শান্ত। এভাবে তাই পর পর পানি ফোলা এবং শান্ত– যেন একটি ঝালরের মত।

যে কোন তরঙ্গের ক্ষেত্রেই তার ছোট বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ অনুযায়ী ছোট বড় ফাটলের মধ্য দিয়ে এই এক্সপেরিমেন্টটি করলে আমরা এরকম ঝালর পাব। আর ওই জিনিসটি তরঙ্গ কিনা তা যদি দেখে নিশ্চিত না হই তা হলে ওরকম 'দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্ট' করলে ঝালর তৈরি হলো কি হলোনা তা দেখে বুঝবো আদৌ এটি তরঙ্গ কিনা। কারণ শুধু তরঙ্গ হলেই ওই পরস্পর ভাঙ্গাগড়া ঘটবে, এবং ঝালর সৃষ্টি হবে। শুধু তাই নয় যদি তরঙ্গ হয় তা হলে ঝালরের ওই উঁচু ও শান্ত জায়গার দূরত্ব, দুই ফাটলের মধ্যে দূরত্ব, এবং অন্যান্য নানা পরিমাপ থেকে সেই তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ ও ফ্রিকোয়েন্সিও পেয়ে যাব। পানির তরঙ্গে এসব পরিমাপ এমনিতেই করা যায়; তরঙ্গের এক শীর্ষ থেকে অন্য শীর্ষের দূরত্ব মেপে তরঙ্গ-দৈর্ঘ মাপা যেমন সহজ, তেমনি এক সেকেন্ডে কয়টি তরঙ্গ পার হচ্ছে ঘড়ি ধরে তাও মাপা সহজ। কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে তরঙ্গ-দৈর্ঘ খুব ছোট এসব সরাসরি মাপা যায়না। ওই রকম তরঙ্গের জন্য দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের আয়োজন করে সেখানকার মাপজোক থেকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ ও ফ্রিকোয়েন্সি মাপতে হয়। আলোর ক্ষেত্রে এমনটিই করতে হয়েছে। আলো যে আদৌ একটি তরঙ্গ তাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এরকম দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্ট করার মাধ্যমে।

আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ যেহেতু খুব ছোট কাজেই তার ক্ষেত্রে ফাটল দু'টার ছিদ্র পথ খুব সরু হতে হয়, উভয়ের মধ্যে দূরত্বও অনেক কম হতে হয়। একটি অলোক উৎস থেকে আলো এসে এই দুই ফাটল পার হয়ে যখন সামনে যায় তখন দুই ফাটল থেকে বেরিয়ে দুই উৎসের মতই ছড়িয়ে পড়ে হুবহু একই আলো। সঠিক দূরত্বে রাখা পর্দায় এই আলো গিয়ে পড়ে। আলো যদি কণায় গড়া হতো তা হলে দুই ফাটল বরাবর সোজা গিয়ে পর্দায় ওই দুই ফাটল বরাবর দুটি আলোক রেখা সৃষ্টি করতো। কিন্তু তা না হয়ে আমরা পাশাপাশি উচ্চতম আলো, মাঝারি আলো, অন্ধকার, আবার আলো, আবার মাঝারি, আবার অন্ধকার এভাবেই দেখি পর্দায় একটি ঝালর সৃষ্টি করে– অনেকটা পানির তরঙ্গের ক্ষেত্রে যেভাবে ঝালর

সৃষ্টি হয়েছিলো। জিনিসটি যদি তরঙ্গ হয় তা হলে সবসময় এমনটিই হয়– দুই তরঙ্গের একটি অন্যটির ওপর উপরিপাতিত হয়ে কোথাও উচ্চতা অনেক বেড়ে যাওয়া, কোথাও কম বেড়ে যাওয়া, আবার কোথাও শূন্য হয়ে যাওয়ার ফলে।

চিরায়ত বিজ্ঞানে বিদ্যুৎ আর চুম্বকের তত্ত্বও রয়েছে। যেখানে দেখা গেছে যে বিদ্যুতের একই রকম চার্জ (ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক) পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত রকম চার্জ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। একই ভাবে চুম্বকের একই রকম মেরু (উত্তর অথবা দক্ষিণ) পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কী রকম বল এই আকর্ষণে বা বিকর্ষণে কাজ করবে তার যে নিয়ম সেটি অনেকটাই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের নিয়মের মতই। বৈদ্যুতিক বলের ক্ষেত্রে ভরের বদলে বৈদ্যুতিক চার্জের পরিমাণ এবং চৌম্বক বলের ক্ষেত্রে চৌম্বক মেরুর চুম্বকত্বের পরিমাণের ওপর সেটি নির্ভর করে, আর মাধ্যাকর্ষণ ধ্রুবকের বদলে যার যার ক্ষেত্রে অন্য ধ্রুবক। তাছাড়া পরে দেখা গেছে যে বিদ্যুৎ আর চৌম্বকত্ব অসম্পর্কিত কোন বিষয় নয়, এদের একটি থেকে অন্যটি সৃষ্টি করা যায়।

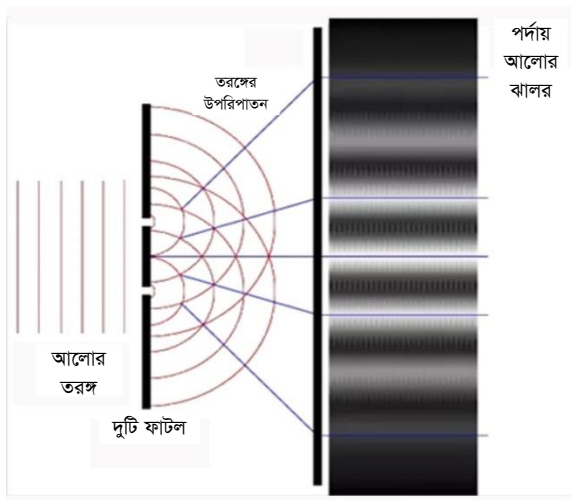

আলোর দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্ট

এভাবে সম্পর্কিত বিদ্যুৎ আর চৌম্বকত্ব নিয়ে বৃটিশ বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বটি চিরায়ত বিজ্ঞানের আরেকটি বড় অংশ। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ক্ষেত্রের ধারণাটিকেও তিনি সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এটি বলে বৈদ্যুতিক চার্জ বা চুম্বকের মেরু তার চারিদিকের বিস্তৃত স্থানে একটি প্রভাব-বলয় বা ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে রাখে যাকে যথাক্রমে বৈদুতিক ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্র বলা

হয়। প্রথমটির ক্ষেত্রে অন্য কোন চার্জ এই ক্ষেত্রের মধ্যে এসে পড়লে ক্ষেত্রের প্রভাবে চার্জটি একটি বল অনুভব করবে। ক্ষেত্রের উৎস চার্জ বা মেরু থেকে যত দূরে যাওয়া হবে ক্ষেত্রের প্রভাব তত কমে যাবে– যেটি হিসেবে করে বের করা যায়। আর একটি চার্জ বা চৌম্বক মেরু এই বল কত জোরে কোন্ দিকে অনুভব করবে তা নির্ভর করে ক্ষেত্রের কোন্ বিন্দুতে এটি আছে সেই বিন্দুতে ক্ষেত্রের তীব্রতা ও দিকের ওপর। ম্যাক্সওয়েল তাঁর বিখ্যাত চারটি সমীকরণে দেখালেন কীভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র পরিবর্তিত হলে সেই পরিবর্তনের হার অনুযায়ী একটি চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়; আর চৌম্বক ক্ষেত্র পরিবর্তিত হলে সেই পরিবর্তনের হার অনুযায়ী একটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। কাজেই এর যে কোনটি পরিবর্তিত হলে তার ফলশ্রুতিতে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক উভয় ক্ষেত্র পরিবর্তিত হবার কারণে একটি তরঙ্গেরই সৃষ্টি হয়– যাকে বলা হয় বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ– যেই তরঙ্গের সমীকরণটিও তিনি তাঁর ওই চারটি সমীকরণ থেকে পেয়ে গেলেন। সেই তরঙ্গ-সমীকরণে তরঙ্গের বেগটি যেখানে আসে তা নির্ধারিত হয় ওই বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ধর্মের দুটি মৌলিক ধ্রুবক থেকে। মজার ব্যাপার হলো ধ্রুবকগুলোর জানা মান ব্যবহার করে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের যেই বেগ ম্যাক্সওয়েল পেলেন সেটি হুবহু আলোর বেগের সমান– সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার!

হুবহু এরকম মিলে যাওয়াটি তো এমনি এমনি হতে পারেনা, ম্যাক্সওয়েল বুঝলেন আলো নিজেও একটি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ বলেই এমনটি হয়েছে; দৃশ্যমান আলো ছাড়াও অন্য সব রকম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের জন্যও তরঙ্গের বেগ এই একই হবে। দেখা গেলো দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ যথেষ্ট ছোট হলেও তার চেয়েও অনেক ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘের (বেশি ফ্রিকোয়েন্সির) বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ হলো ক্রমে ক্ষুদ্রতর আলট্রা-ভায়োলেট, এক্সরে এবং গামা রে। অন্য দিকে আলোর থেকেও বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘের (কম ফ্রিকোয়েন্সির) তরঙ্গ হলো ইনফ্রা-রেড (তাপ), মাইক্রোওয়েভ, রেডিয়ো তরঙ্গ। এসবের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে দেখানো যায় এরা সবই বিদ্যুৎ চৌম্বক-তরঙ্গ এবং সবই কোন না কোন ভাবে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বা চৌম্বক ক্ষেত্রে তালে তালে পরিবর্তনের ফলেই সৃষ্টি হয়– ঠিক যেমন ভাবে পানির মধ্যে হাত নড়াচড়া করে পানির তরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছিলো। হাত এখানে একটি স্পন্দনকারীর কাজ করেছে। তেমনি বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে স্পন্দনকারীর কাজ করতে পারে কোন চার্জের নড়াচড়া– যেমন ইলেকট্রনের। আমাদের পরিচিত তরঙ্গগুলোতে পানি, বাতাস বা অন্য কোন বস্তু মাধ্যমের ওঠানামাটিই তরঙ্গের রূপ নেয়, কিন্তু বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের ক্ষেত্রে কোন বস্তুর

ওঠানামা নয়, বরং ক্ষেত্রের ওঠানামাটিই তরঙ্গ। সেই নড়াচড়া কী হারে, কী শক্তিতে ঘট্ছে তার ওপর নির্ভর করবে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সিটি কী হবে অর্থাৎ এটি আলো হবে, না অন্য কোন রকম বিকিরণ। এগুলোতে কোন রকম মাধ্যম প্রয়োজন হয় না– শূন্যের মধ্য দিয়েও সেটি দিব্যি চলে যেতে পারে।

চিরায়ত বিজ্ঞানে সম্ভাবনার ব্যবহারঃ

সম্ভাবনা জিনিসটি চিরায়ত বিজ্ঞানের একটি ধারণা। এর সাহায্যে যা এখনো ঘটেনি তা ঘট্বার ব্যাপারে কিছুটা আন্দাজ অন্তত করা যায়। এই আন্দাজটি দু'ভাবে করা যায়। প্রথমটিকে বলা যায় সাম্যতার নীতিভিত্তিক সম্ভাবনা। যদি ঘটনাটি কয়েকটি বিকল্প ঘটনার মধ্যে একটি হয়, এবং ওই সব ক'টি বিকল্প ঘটার ক্ষেত্রে একটি সাম্যতার অবস্থা বিরাজ করে, তা হলে ওই বিশেষ ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা হবে ১ কে বিকল্পের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার ভগ্নাংশ। উদাহরণ স্বরূপ একটি মুদ্রা টস্ করলে 'হেড' ওপরে পড়ার এবং 'টেইল' ওপরে পড়ার এই দুটি বিকল্প ঘটনা ঘটতে পারে। মুদ্রাটি সঠিক নির্মিত হলে উভয়টির মধ্যে একটি সাম্যতার অবস্থা বিরাজ করে, যার মানে কোন একটি দিকে পড়ার ক্ষেত্রে এতে কোন গঠনগত পক্ষপাতিত্ব নেই। কাজেই হেড পড়ার সম্ভাবনা হবে ১ কে বিকল্পের সংখ্যা ২ দিয়ে ভাগ করার ভগ্নাংশ অর্থাৎ $\frac{১}{২}$। একইভাবে টেইল পড়ার সম্ভাবনাও $\frac{১}{২}$। এর মানে হলো যতবার টস্ করবো তার $\frac{১}{২}$ ভাগ বার হেড পড়বে এই আশা করতে পারি– যেমন ১০০ বার টস্ করলে ৫০ বার। মজার ব্যাপার হলো ১০০ বার দূরে থাক একবারও টস্ না করেই আমরা এটি বলে দিতে পারছি। সত্যি সত্যি টস্ করলে ফলাফল এই আন্দাজের খুব কাছাকাছি হবে। ১০০ বার কেন, ধরা যাক্ এক লক্ষ বার টস্ করলে হেড কতবার পাব তা আমাদের জানা দরকার। এক লক্ষ বার টস্ করা তো চাট্টিখানি কথা নয়– কোন কোন ক্ষেত্রে এমনি ধারার কাজ হয়তো সম্ভবও নয়। অথচ আমরা কিছু না করেই বলে দিতে পারি হেড পড়বে এক লক্ষের $\frac{১}{২}$, অর্থাৎ ৫০ হাজার বার। এভাবে সম্ভাবনা বড় সংখ্যায় কোন কিছু সম্পর্কে জানার অজ্ঞতা বা বড় সংখ্যায় কোন কিছু করার অপারগতা সত্ত্বেও আমাদের জন্য কিছু জ্ঞান সৃষ্টি করে। ব্যাপারটি যদি মুদ্রা না হয়ে লুডু খেলার দান ফেলার ছোট্ট চৌকা ডাইসটি হয়, তার ছয় তলের মধ্যে সাম্য বজায় থাকা সাপেক্ষে এতে ছক্কা পড়ার সম্ভাবনা হবে $\frac{১}{৬}$।

এভাবে অনুরূপ সব কিছুর ক্ষেত্রে সত্যি সত্যি না করেই সম্ভাবনার ভিত্তিতে আন্দাজ করা যায়।

আন্দাজ করার দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি বা পুনরাবৃত্তির হারের ওপর নির্ভর করে সম্ভাবনা। বিজ্ঞানের আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে সম্ভাবনা বল্‌তে একেই বোঝানো হয়। এটি নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে– বিভিন্ন বিকল্পের মধ্যে অতীতে যেটি যত বেশি বার ঘটেছে ভবিষ্যতে তার ঘটার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। যেমন ১০ বার ঘোড়দৌড়ে যে ঘোড়াটি ৭ বার জিতেছে তার আবার জেতার সম্ভাবনা হবে $\frac{৭}{১০}$ আর যেই ঘোড়া ১ বার জিতেছে তার জেতার সম্ভাবনা $\frac{১}{১০}$। স্পষ্টত অতীতের প্রবণতাই এই সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে। আবার এই সম্ভাবনার মান দুটি যদি আমাদের জানা থাকে তা হলে আমরা আশা করতে পারি যে আগামীতে ওই একই ঘোড়াগুলোর ১০ বার ঘোড়দৌড় হলে প্রথমটি ১০ বারের মধ্যে ৭ বার জিতবে এবং দ্বিতীয়টি ১ বার জিতবে। যদি ১০০ বার হয় তা হলে প্রথমটি ৭০ বার আর দ্বিতীয়টি ১০ বার জিতবে। এখানেও ১০০ বার ঘোড়দৌড় আয়োজন না করেই অথবা এসব ঘোড়দৌড় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেই আমরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারবো। এদিক থেকে উভয় রকম সম্ভাবনার ব্যবহারের কারণ একই– সত্যিকার কী ঘটেছে তার সম্পর্কে অজ্ঞতা সত্ত্বেও ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উপায় এটি। উভয় ক্ষেত্রে সম্ভাবনাটি আসে একটি ভগ্নাংশ হিসেবে অর্থাৎ দুটি স্বাভাবিক সম্পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হিসেবে। চিরায়ত বিজ্ঞানে সম্ভাবনা শুধু এই রূপেই আসতে পারে। কিন্তু পরে দেখবো কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাবনার মান এরকম ছিমছাম অনুপাতের বদলে অদ্ভুত জটিল গাণিতিক রূপ ধারণ করতে পারে– যাকে হুবহু এই চিরায়ত সম্ভাবনা বলে চেনা যাবেনা।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বের আবিষ্কারক হিসেবে ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের নাম আমরা একটু আগে দেখেছি। তিনি আর একটি বড় কাজ করেছিলেন তা হলো সম্ভাবনার ভিত্তিতে একটি গ্যাসের অণুগুলোর গতিবিধি নির্ণয়। ওসময় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল যে একটি বিশেষ আয়তনের পাত্রের ভেতর রাখা গ্যাসের অণুগুলো সব সময় ছুটাছুটি করছে; গ্যাসের উত্তাপ যত বেশি, ছুটাছুটিও তত বেশি। ম্যাক্সওয়েল চেষ্টা করছিলেন অণুগুলোর গতিবিধি সম্পর্কে যতখানি সম্ভব জেনে তার ভিত্তিতে গ্যাসের সার্বিক কিছু গুণের ভবিষ্যদ্বাণী করতে, যেই গুণগুলোকে মাপা যায়– যেমন গ্যাসের চাপ, ঘনত্ব ইত্যাদি। ফলে ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যাচাই করে ওই গতিবিধির তত্ত্ব সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া যাবে। নিউটনীয় চিন্তাতে যদি কাজ

করতে পারি তা হলে প্রত্যেকটি অণুর বর্তমান অবস্থান ও বেগ থেকে গতি সূত্র প্রয়োগ করে তার পরবর্তী সব গতিবিধি হিসেব করা যায়। নীতিগত ভাবে এটি সম্ভব; কিন্তু অসংখ্য গ্যাস অণুর কারণে বাস্তবে এটি অসম্ভব। কাজেই ম্যাক্সওয়েলকে অন্য পথ দেখতে হলো– যেখানে সম্ভাবনা ও গড় গতিবিধিই হবে উপায়।

এক একটি অণুর গতি সম্পর্কে কিছুই না জেনে সার্বিক ভাবে সব অণুর গতিবিধি আন্দাজ করতে গিয়ে ম্যাক্সওয়েলকে কতগুলো বিষয় ধরে নিতে হলো। এমন একটি ধরে নেয়া বিষয় হলো শুরুতে অণুগুলোর গতি ছিল একেবারে ইতস্তত– কোন শৃঙ্খলার ধার না ধেরে যেন যার যেমন খুশি তেমন খামখেয়ালি ভাবে চলা। এভাবে চলতে গিয়ে এরা মাঝে মাঝে একের সঙ্গে অন্যটি সংঘর্ষ করেছে। ধরে নেয়া অন্যান্য বিষয়গুলো হলো এই সংঘর্ষ স্থিতিস্থাপক, এক সংঘর্ষ থেকে পরের সংঘর্ষ পর্যন্ত যেতে প্রত্যেকটি অণু সরল রেখায় সমবেগে চলেছে; অণুগুলোর নিজের আয়তনের তুলনায় তাদের পারস্পরিক দুরত্ব অনেক বেশি, তাই এরা সাধারণত একের ওপর অন্যে কোন প্রভাব বিস্তার করেনা। অণুর প্রকৃতি সম্পর্কে যা জানা ছিল তাতে এই ধরে নেয়া বিষয়গুলো অসঙ্গত কিছু ছিলনা। তবে শুরুতে যে ইতস্তত চলার কথা বলা হয়েছে সেটি ম্যাক্সওয়েলের একটি নিজস্ব চিন্তা বা অন্তর্দৃষ্টি– যার ফলে তাঁর পুরো তত্ত্বটি সফল হতে পেরেছে। নিউটনীয় তত্ত্বের কথামত কিছুই ইতস্তত বা খামখেয়ালি হবার কথা নয়।

এই সবকে যদি ধরে নেয়া হয় তা হলে ওই সংঘর্ষ ও গতির ওপর নিউটনের নিয়মগুলো প্রয়োগ করেই বোঝা গেল যে গ্যাসের উত্তাপ এই সব অণুগুলোর বেগের বর্গের গড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। ওই উত্তাপ জানা থাকলে এভাবে গড়পড়তা বেগের ভিত্তিতে বেগের বন্টনের একটি ছবি খাড়া করে ফেলা যায়। তাতে অধিকাংশ অণু ওই গড় বেগে থাকে বটে কিন্তু অল্প পরিমাণ অণু এর থেকে কম বা এর থেকে বেশি বেগেও থাকে। যেগুলোর বেগ গড়বেগের চেয়ে যত বেশি ওদের সংখ্যা তত কম, আবার বেগ যত কম তাদের সংখ্যাও তত কম। বন্টনের ছবিটি দাঁড়ায় অনেকটা ঘন্টার আকৃতির একটি লেখচিত্র যার উচ্চতাগুলো অণুর সংখ্যা দিচ্ছে আর বাম থেকে ডানের দিকে বেগের পরিমাণটি বাড়ছে দেখাচ্ছে। এর থেকে একটি বিশেষ অণুর গতিবিধি পাওয়া যায়না ঠিকই, কিন্তু সব অণুর গড় পড়তা হিসেবে অনেক কিছুই জানা যায়। কোন একটি বিশেষ বেগের অণুর প্রশ্ন উঠলে এই বন্টনের ছবি এবং তার সমীকরণ থেকে জানা যায় ওই গ্যাসের সব অণুর মধ্যে কত সংখ্যক অণুর এই বেগ রয়েছে। অথচ পাত্রের মধ্যে গ্যাসের উত্তাপ ছাড়া এর জন্য আর কোন তথ্য ব্যবহার করা

হয়নি। শুধু উত্তাপের ওপর ভিত্তি করে এই সক্ষমতাটিও একটি বিশাল ব্যাপার। এই পুরো ব্যাপারটিই শুধু সম্ভাবনার কথা বল্‌ছে– এ ধরনের তত্ত্বকে বলা যায় সংখ্যাতাত্ত্বিক গতিবিদ্যা।

যখনই আমরা উত্তাপকে কাজে লাগাতে চাই তার শক্তির একটি অংশ থাকে যা কাজ না করেই ছড়িয়ে পড়ে নষ্ট হয়। একটি চুলা বা একটি ইঞ্জিনে জ্বালানী হিসেবে যত শক্তি আমরা সরবরাহ করি তার সব যে আমাদেরকে কাম্য তাপ বা গতি দেয় না। সে তো আমরা লক্ষ্যই করি। এর মূলে রয়েছে– ওই ব্যবস্থাটির মধ্যে তাপের আদান-প্রদানের সময় ক্রমেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া। এই বিশৃঙ্খলাকে এনট্রপি নামের একটি গাণিতিক রাশিতে প্রকাশ করা হয়। ওই বদ্ধ সিস্টেমটির ভেতরে নানা জিনিসের মধ্যে তাপের আদান প্রদান যতই চলতে থাকবে ওই এনট্রোপি ততই বাড়তে থাকবে শেষ পর্যন্ত সব কিছু তাপীয় ভারসাম্যে না আসা পর্যন্ত। এভাবে বিশৃঙ্খলা বাড়াটি প্রকৃতিরই নিয়ম। বিজ্ঞানী বোল্‌ৎসম্যান ওই এনট্রপি বা বিশৃঙ্খলার একটি সুন্দর ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি দেখালেন যে ওই বদ্ধ সিস্টেমে অণুগুলোকে যত রকম ভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব তার সংখ্যা যত বড় হবে এনট্রপিও তত বেশি হবে। ওই বিন্যাসের সম্ভাব্য সংখ্যার সঙ্গে এনট্রপির সম্পর্ক দেখিয়ে তিনি একটি সমীকরণ আবিষ্কার করলেন। এভাবে বদ্ধ পাত্রে গ্যাসের অণুগুলোর এন্‌ট্রপি বের করার জন্য তিনি একটি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। যদিও শক্তি একেবারে শূন্য থেকে অনেক বেশি পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে সব পরিমাণ নিতে পারে, তিনি আপাতত কৌশল হিসেবে সব চেয়ে কম পরিমাণ শক্তির একটি একক কল্পনা করে নিয়ে বললেন– এটিই ক্ষুদ্রতম শক্তি, এর শক্তির পরিমাণটুকুকে তিনি বললেনϵ। ওই গ্যাসের মোট শক্তিকে তিনি অনেকগুলো ছোট ছোট কাল্পনিক পাত্রে বিভক্ত করে রাখা আছে বলেও কল্পনা করলেন। এর মধ্যে প্রথম পাত্রটিকে তিনি বল্‌লেন এটি সেই ক্ষুদ্রতম শক্তি ϵ এর পাত্র। এর পরের পাত্রটিকে তিনি বল্‌লেন এটি তার দ্বিগুণ শক্তির অর্থাৎ 2ϵ এর পাত্র। এমনি ভাবে 3ϵ, 4ϵ ইত্যাদির পাত্র কল্পনা করা গেলেন তিনি। এবার গ্যাসের অণুগুলোকে ওই বিভিন্ন পাত্রে বন্টন করে দেয়ার চেষ্টা করলেন যাতে নানা পাত্রে রাখার পর অণুগুলোর মোট শক্তির জায়গা ওই কিছু সংখ্যক পাত্রের মধ্যে হয়ে যায়। এই কৌশলে এনট্রপির হিসেব করা গেলো। এর সবই চিরায়ত বিজ্ঞানের নিরিখেই করা হয়েছে বটে কিন্তু ম্যাক্সওয়েলের ওই সংখ্যাতাত্ত্বিক বন্টনের নিয়ম এবং তাতে বোলৎসম্যানের এনট্রপির হিসেব করার কৌশলটি কোয়ান্টাম তত্ত্ব সৃষ্টির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ পটভূমি কাজ করেছে হিসেবে।

ম্যাক্সওয়েল ও বোলৎসম্যানের সংখ্যাতাত্ত্বিক গতিবিদ্যা থেকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম আবিষ্কৃত হয়েছিলো থাকে বলা যায় 'সমান শক্তির নীতি'। যে কোন বদ্ধ সিস্টেমের মধ্যে কতটি 'স্বাধীন নড়াচড়ার মাত্রা' আছে এটি সেদিকে লক্ষ্য করেছে। যেমন ওতে যদি শুধু একটি কণিকা থাকে তা হলে সামনে-পেছনে, পাশাপাশি, ও ওপর-নিচ এই তিনটি স্বাধীন নড়াচড়ার মাত্রা তার থাকবে। ওটি যদি একটি দোলকের মত ঝুলানো থাকে তখন কিন্তু তার স্বাধীন নড়াচড়ার মাত্রা কমে একটি হয়ে যাবে– শুধু দোলকের দোলনের নড়াচড়া। ব্যবস্থাটির ভেতর যদি n সংখ্যক কণিকা থাকে– তাহলে মাত্রা হবে 3n। জটিলতর জিনিসের ক্ষেত্রে এই মাত্রা আরো বাড়বে। সমান শক্তির নীতি অনুযায়ী তাপীয় ভারসাম্যের অবস্থায় কোন সিস্টেমের মধ্যে থাকা প্রত্যেকটি স্বাধীন নড়াচড়ার মাত্রার একটি সুনির্দিষ্ট শক্তি থাকে যার পরিমাণ প্রত্যেক মাত্রার জন্য সমান, আর সিস্টেমের উত্তাপের ওপরেই শুধু নির্ভর করবে। এই পরিমাণটিকে মাত্রার সংখ্যা দিয়ে গুণ করেই পুরো সিস্টেমটির মোট শক্তি পাওয়া যায়– তাই বলা যায় পুরো ব্যবস্থার মোট শক্তি তার সব স্বাধীন নড়াচড়ার মাত্রার মধ্যে সমান ভাবে ভাগ করা থাকে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব সৃষ্টির পেছনে চিরায়ত বিজ্ঞানের এই নীতিটিরও একটি ভূমিকা আমরা দেখবো।

চিরায়ত বিজ্ঞানের তিনটি সংকট

চিরায়ত বিজ্ঞানকে ছেড়ে কেন বিজ্ঞানে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আনতে হলো সেই কারণ শুরুতে দেখা দিয়েছে প্রচলিত সেই বিজ্ঞান তিনটি বিশেষ সংকটের মুখে পড়ে কাজ করছিলো না বলে। কতগুলো বাস্তব ঘটনার কোন ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বগুলো থেকে কিছুতেই মিল্‌ছিলোনা বলেই এই এক একটি সংকটের সৃষ্টি হয়েছিলো। এগুলোর ব্যাখ্যা করার জন্য চিরায়ত বিজ্ঞানের বাইরে গিয়ে একেবারে নতুন কিছু ধারণা আনতে হয়েছে। এর প্রত্যেকটিই একটি দিকই নির্দেশ করেছে– তা হলো কোয়ান্টাম তত্ত্বের দিক। এর পরে পরেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব আরো সম্পূর্ণতা লাভ করেছে, পদার্থবিদ্যার সার্বিক কাঠামোটির দায়িত্ব নিয়ে বিজ্ঞানের চেহারাকে একেবারে পাল্‌টিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সব কিছুর সূচনা হয়েছিলো ওই সংকটগুলোর সমাধান করতে গিয়েই।

কালো-বস্তু-বিকিরণের সংকট

ওভেনের ভেতর অসীম শক্তিঃ

প্রথম সংকটটি দেখা গেলো প্রচলিত বিজ্ঞানের নিয়মে হিসেব করলে যে কোন উত্তাপে থাকা যে কোন ওভেন থেকে অসীম পরিমাণ শক্তি নির্গত হয়ে আশপাশে সবকিছুকে পুড়ে ছারখার করে দেবার কথা। স্পষ্টত সেটি হয়না, কেন হয়না তার উত্তর ওই বিজ্ঞানে নেই। আসলে ওভেনকে আমরা একটি পরিচিত উদাহরণ হিসেবে নিচ্ছি বটে, কিন্তু ব্যাপারটি হলো তন্দুরের মত যে কোন উত্তপ্ত বদ্ধ জায়গা থেকে ছিদ্র পথে বেরিয়ে আসা বিকিরণ নিয়ে। এরকম কিছুকে 'কালো বস্তু' হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যে কোন কালো বস্তুকে কালো দেখায় তা সব রকম আলোকে শুষে নেয় বলে। উত্তপ্ত বদ্ধ জায়গায় যত রঙের আলোই তৈরি হয় সবই তার দেয়াল শুষে নেয় বলে এও এক রকম কালো বস্তু। আসলে আলো বল্‌তে এখানে শুধু দেখা যাওয়া আলো নয়– সব ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গকে বোঝানো হচ্ছে। ওভেনের দেয়াল থেকে নানা ফ্রিকোয়েন্সির ওরকম তরঙ্গ তৈরি হয়ে ভেতরে থাকে। ছোট একটি ছিদ্র করলে তার মধ্যে দিয়ে এর কিছু বিকিরণ বেরিয়ে আসে। সাধারণত যে উত্তাপে ওভেনকে রাখি তা ইনফ্রো-রেড (তাপ) তরঙ্গ বেশি উৎপাদন করে বলে ওই ছিদ্রের সামনে দাঁড়ালে গরম অনুভূত হয়। তবে ওভেনের উত্তাপ বাড়ালে আরো বেশি ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ তৈরি হয়ে দৃশ্যমান আলোও বেরিয়ে আসবে। ওই পর্যায়ের উত্তাপের মধ্যে

অপেক্ষাকৃত কম উত্তাপে এই আলো হবে কালচে লাল রঙের, আরো উত্তাপে আরো বেশি ফ্রিকোয়েন্সির উজ্জ্বল লাল, তারপর আরো বেশিতে একে একে হলুদ, কমলা ও সব মিশে সাদা। এসব অনেকের কাছেই পরিচিত ব্যাপার। আমাদের গ্রামের কামারও তো তাঁর চুলা যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়েছে কিনা তা চুলার ভেতরটায় এসব রঙ দেখেই বুঝতে পারেন। সূক্ষ্ম পরিমাপে নির্দিষ্ট উত্তাপে রাখা ওভেন থেকে ছিদ্র পথে বেরিয়ে আসা এক একটি বিকিরণের ফ্রিকোয়েন্সি এবং ঠিক ওই ফ্রিকোয়েন্সির বিকিরণের তীব্রতা মাপা যায়। ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে তীব্রতার একটি লেখচিত্র আঁকলে দেখা যায় সেটি ঘন্টার আকারের একটি চিত্র হচ্ছে অনেকটা ম্যাক্সওয়েলের বন্টন চিত্রের মত। বিভিন্ন উত্তাপের প্রত্যেকটির জন্য এই ছবি মোটামুটি একই রকম হলেও, উত্তাপ যত বেশি ঘন্টা-ছবিটি তত উঁচু হয় এবং এর শীর্ষবিন্দুটি তত উঁচু হওয়া ছাড়াও ক্রমে খানিকটা ডানে সরেও যায় অর্থাৎ বেশি ফ্রিকোয়েন্সির দিকে। অধিকতর উত্তাপ প্রধান বিকিরণকে যে লাল থেকে কমলার রঙের দিকে সরায় তা তো আমরা দেখেছিই, আরো বেশি উত্তাপে হলুদ, সাদা ইত্যাদিতে। ওই ঘন্টা-ছবির বেশি ফ্রিকোয়েন্সির অংশ অদৃশ্য আলো আলট্রা-ভায়োলেটের দিকে গড়ায়। এটি তো বাস্তবে যা হয় তার ছবি। এখন প্রশ্ন হলো প্রচলিত চিরায়ত বিজ্ঞানের তত্ত্ব দিয়ে তাত্ত্বিক ভাবে এই বাস্তব ছবিটিই পাওয়া যায় কিনা।

অনেকটা গ্যাসের অণুর গতি সম্পর্কে ম্যাক্সওয়েলের অনুমানকে অনুসরণ করে তাত্ত্বিক ভাবে কালো-বস্তু-বিকিরণের তীব্রতা নানা ফ্রিকোয়েন্সিতে কেমন দাঁড়ায় তা হিসেব করে বের করা হয়েছে। আবিষ্কর্তা দু'জন বিজ্ঞানীর নামে একে বলা হয় র‍্যালে-জীন্সের নিয়ম। তাতে হিসেব করা তথ্যের লেখচিত্র এঁকে যে ছবি দাঁড়ায় তা কম ফ্রিকোয়েন্সির দিকে হুবহু বাস্তব ছবিটির সঙ্গে মিলে যায়– অর্থাৎ কালো বস্তু-বিকিরণের কম ফ্রিকোয়েন্সির অংশের জন্য এ নিয়ম সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী দেয়। কিন্তু বেশি ফ্রিকোয়েন্সির দিকে লেখচিত্রের রেখা যেতে থাকে প্রায় অসীম তীব্রতার দিকে। স্পষ্টত চিরায়ত তত্ত্ব এখানে বাস্তবের সঙ্গে মিল্‌ছেনা, এক্ষেত্রে এটি ব্যর্থ। ওখানটায় বিকিরণের ফ্রিকোয়েন্সি আলট্রা- ভায়োলেট অংশে বলে চিরায়ত বিজ্ঞানের এই দুর্যোগকে বলা হলো 'আল্ট্রা-ভায়োলেট বিপর্যয়'। আর একজন বিজ্ঞানী ভীন চিরায়ত বিজ্ঞানের যুক্তির সঙ্গে বাস্তব তথ্য মিলিয়ে একটি ফরমুলা দিয়েছেন যার থেকে হিসেব করে বাস্তব চিত্রটি পাওয়ার চেষ্টায়। এই ফরমুলার হিসেবগুলো বেশি ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে বাস্তব চিত্রের সঙ্গে বেশ কিছুদূর পর্যন্ত মিলে যায়, কিন্তু এটি আবার কম ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে একেবারেই বাস্তব

চিত্রের সঙ্গে মেলেনা। দেখা গেলো যে কোন ভাবেই চিরায়ত হিসেব বাস্তব তথ্যের সঙ্গে আগাগোড়া মেলেনা।

বেশি ফ্রিকোয়েন্সির বিকিরণে ওভেনের ভেতরের মোট তরঙ্গ-তীব্রতা অর্থাৎ মোট শক্তি যে তাত্ত্বিক হিসেবে অসীম হয়ে পড়তে পারে তা আমরা আর একটি সহজ-বর্ণনায় দেখতে পারি। ধরে নিই যে ওভেনটি একটি আয়তাকার বাক্সের মতো, তা হলে এর একটি দেয়াল থেকে যে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ শুরু হয় তা তার বিপরীত দেয়ালে গিয়ে শেষ হয় (ওখানে শোষিত হয় অথবা ওখান থেকে প্রতিফলিত হয়)। একে আমরা তুলনা করতে পারি দুই প্রান্তে আটকানো সেতারের একটি তারের সঙ্গে যাতে টোকা দিয়ে কম্পনের তরঙ্গ সৃষ্টি করা হয়েছে। দেখা যায় বিকিরণ তরঙ্গগুলো যত রকমের তৈরি হয় তাতে কোনটিতে এই উপমার পুরো তারটি একটি মাত্র ঢেউ তুলে কাঁপতে পারে; কিন্তু অন্য তারে দুই ভাগে ভাগ হয়ে কাঁপে। দ্বিতীয়টির ফ্রিকোয়েন্সি প্রথমটির দ্বিগুণ। এভাবে আরো অন্য তারে তিন, চার, পাঁচ এমনি ক্রমবর্দ্ধমান ভাগে ভাগ হয়েও কাঁপে-প্রত্যেক ক্ষেত্রে এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ আগেরটির থেকে ছোট হয় অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে। দেয়াল দুটির দূরত্বকে ১,২,৩ ইত্যাদি ভাগ করা বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ অসংখ্য নানা ফ্রিকোয়েন্সিতে দেখা দেয়। দেয়ালে এগুলোর নানা শোষণ ও পুন:বিকিরণের মাধ্যমে অসীম সংখ্যক পৃথক ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ এভাবে ওভেনে দেখা দেয়।

গত অধ্যায়ে বোল্‌ৎসম্যানের সমান শক্তির নীতি আলোচনায় দেখেছি একটি বিশেষ উত্তাপে থাকা সিস্টেমের মধ্যে স্বাধীনভাবে নড়াচড়ার প্রত্যেকটি মাত্রায় একটি সমান সুনির্দিষ্ট শক্তি থাকে। এখন ওভেনের প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্সির কম্পনকে আমরা স্বাধীনভাবে নড়াচড়ার একটি পৃথক মাত্রা হিসেবে বিবেচনা করতে পারি, যার প্রত্যেকটিতে ওই সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি থাকবে– যে শক্তির পরিমাণ শুধুমাত্র ওই উত্তাপের ওপরেই নির্ভর করবে। যেহেতু তাতে ফ্রিকোয়েন্সির সংখ্যা অসীম, সব ফ্রিকোয়েন্সির মিলিত শক্তি তাই অসীম শক্তিতে পরিণত হতে বাধ্য। চিরায়ত সংখ্যাতাত্ত্বিক গতিবিদ্যা সঠিক হলে ওভেনের শক্তি অসীম হওয়ার মত অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী আমাদেরকে মেনে নিতে হয়, যা বাস্তব নয়। র‍্যালে-জীন্‌সের তত্ত্ব এবং ভীনের ফরমুলার ব্যর্থতা চিরায়ত বিজ্ঞানের এই সংকটটিকেই আরো সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছিলো।

বিপর্যয় থেকে মুক্তি পেতে শক্তির কোয়ান্টাম:

আলট্রা-ভায়োলেট বিপর্যয়টি নিয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তিত হয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে এসে; এর সমাধানে সচেষ্টদের মধ্যে একজন ছিলেন জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক। ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব অনুযায়ী বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের সৃষ্টি হয় ওই ক্ষেত্রগুলোকে কাঁপানো স্পন্দনকারীর কারণে। প্ল্যাঙ্ক তাই ওভেনের দেয়ালে এরকম অনেক স্পন্দনকারী কল্পনা করে নিলেন যেগুলোর প্রত্যেকটি এক এক ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ সৃষ্টি করছে আবার সেরকম তরঙ্গ শোষণও করছে। প্ল্যাঙ্ক চাইলেন বিপুল সংখ্যক স্পন্দনকারীর সামগ্রিক আচরণ জানার জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক বিজ্ঞানের পথে এগুতে- যেমনটি ম্যাক্সওয়েল ও বোলৎসম্যান করেছিলেন গ্যাসের বিপুল সংখ্যক অণুর সামগ্রিক আচরণ জানার জন্য। এজন্য প্ল্যাঙ্ককে দেখতে হলো ওভেনে থাকা মোট শক্তি ওই স্পন্দনকারীগুলোর মধ্যে কত ভাবে বন্টিত থাকতে পারে। সেখান থেকে তিনি বোলৎসম্যানের সমীকরণ অনুযায়ী ওভেনের ব্যবস্থাটিতে এনট্রপির (বিশৃঙ্খলার) হিসেব করতে পারবেন– যা সামগ্রিক আচরণের গাণিতিক রূপটি পেতে জরুরি। বোলৎসম্যান নিজে অবশ্য এটি ব্যবহার করেছিলেন গ্যাসের মোট শক্তি কতভাবে তার অণুগুলোর মধ্যে বন্টিত থাকতে পারে সেটি বিবেচনার মাধ্যমে।

বিষয়টি ভিন্ন হলেও কাজের সুবিধার জন্য প্ল্যাঙ্কও বোলৎসম্যানের মত কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিলেন– মোট শক্তিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ করে বিবেচনার কৌশল। বোলৎসম্যান মোট শক্তির ক্ষুদ্রতম একটি ভাগ ϵ কল্পনা করেছিলেন– অণুগুলোর এক একটির ϵ,অথবা 2ϵ, অথবা 3ϵ এভাবে শক্তি থাকতে পারতো। প্ল্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কল্পনা করতে হলো ওভেনের স্পন্দনকারীগুলোর থেকে এক একটির শক্তি নির্গত হবে ক্ষুদ্র পরিমাণ শক্তির এক একটি প্যাকেটে প্যাকেটে। বোলৎসম্যানের মত প্ল্যাঙ্ককে দেখতে হলো নানা সাইজের এই শক্তি প্যাকেটগুলো যাবতীয় স্পন্দনকারীর মধ্যে কতভাবে বন্টন করা যায়। সেখান থেকে তিনি প্যাকেটগুলোর এবং পুরো সিস্টেমের এনট্রপি নির্ণয় করতে পারলেন বোলৎসম্যানের সমীকরণ অনুযায়ী। এটি করতে গিয়ে তাঁর বিশেষ ক্ষেত্রে কৌশল হিসেবেই তাঁকে ধরে নিতে হলো যে প্রত্যেক প্যাকেটের শক্তিকে হতে হবে ওই প্যাকেটের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সির সমানুপাতিক। যেহেতু বিভিন্ন স্পন্দনকারীর বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি তাই যার যার প্যাকেটে শক্তির পরিমাণ হবে তার ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে সমানুপাতিক– যেমন ফ্রিকোয়েন্সি দ্বিগুণ হলে তার প্যাকেটে শক্তির পরিমাণও দ্বিগুণ হবে। এরকম সমানুপাতিক যে কোন দুই

জিনিসকে সমান হিসেবে দেখাতে হয় সমানুপাতের একটি ধ্রুবকের মাধ্যমে। তাই প্ল্যাঙ্ক একটি স্পন্দনকারীর প্যাকেটের শক্তির পরিমাণ E কে লিখলেন E = h f এই ভাবে, অর্থাৎ

প্যাকেটের শক্তি = h ধ্রুবক x তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি

h এই ক্ষেত্রে সমানুপাতের ধ্রুবক যার মান অবশ্য তাঁকে পরে নির্ণয় করতে হয়েছে। f হলো ওই স্পন্দনকারীর ফ্রিকোয়েন্সি।

শক্তি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নির্গত হচ্ছেনা, বরং এরকম প্যাকেটে প্যাকেটে নির্গত হচ্ছে, এই একটি মাত্র সিদ্ধান্ত পুরো পরিস্থিতি বদলে দিলো। যদিও কৌশল হিসেবে চিরায়ত বিজ্ঞানের অনুসরণেই প্ল্যাঙ্ক এটি নিয়েছেন, এভাবে শক্তির প্যাকেটে প্যাকেটে আসা চিরায়ত বিজ্ঞানের বিরোধী। এই প্যাকেটের অন্তর্গত শক্তিকে বলা হলো কোয়ান্টাম, কোন কিছুকে ভাগ ভাগ করে দিলে এক এক ভাগকে বুঝাবার একটি প্রতিশব্দ হলো কোয়ান্টাম। এতে ধরে নেয়া হলো যে কোন অবস্থাতেই এই প্যাকেট বা কোয়ান্টামকে ভেঙ্গে এর ভাংতি শক্তি নেয়া যাবেনা। আমাদের সেই ওভেনের নানা তরঙ্গে যার ফ্রিকোয়েন্সি যত বেশি তার কোয়ান্টামের শক্তি তত বেশি। বোলৎসম্যানের সমান শক্তির নীতি অনুযায়ী এক এক স্বাধীন নড়াচড়ার মাত্রার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি বরাদ্দ করা রয়েছে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রত্যেক বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকা তরঙ্গের জন্য একই সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি। কম ফ্রিকোয়েন্সির ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম এত ক্ষুদ্র যে উপযুক্ত সংখ্যায় কোয়ান্টাম সেই সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তির চাহিদা মেটাতে পারে। কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সি যখন এমন একটি বড় পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে তার অপেক্ষাকৃত বড় কোয়ান্টামের একটি কম পড়লে সেই সুনির্দিষ্ট শক্তির থেকে কম হয়, আর একটি বেশি থাকলে সেই সুনির্দিষ্ট শক্তির থেকে বেশি হয়ে যায়, তখন সেই চাহিদা মেটাবার উপায় আর থাকেনা– কারণ কোয়ান্টামকে যে ভাংতি করা যাবেনা! অথচ একেবারে ওই সুনির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি হওয়া চাই কমও হতে পারবেনা, বেশিও হতে পারবেনা। এর ফল হলো ওই ফ্রিকোয়েন্সির বা তার বেশি ফ্রিকোয়েন্সির তরঙ্গ আর ওভেনে থাকতেই পারবেনা। ফলে অসীম সংখ্যক ফ্রিকোয়েন্সির সুযোগ আর রইলোনা, ওভেনের শক্তিও অসীম হবার সুযোগ রইলোনা।

ইতোমধ্যে প্ল্যাঙ্ক তাঁর সেই প্যাকেটের শক্তির এনট্রপির বিশেষ রূপ এবং চিরায়ত বিজ্ঞানের ইতোমধ্যে থাকা নিয়মের সঙ্গে মিলিয়ে এক একটি উত্তাপে রাখা ওভেনের জন্য ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে বিকিরণ-তীব্রতার গাণিতিক সম্পর্কের একটি

নিখুঁত ফরমুলা আবিষ্কার করেন– যেটি একেবারে কম ফ্রিকোয়েন্সি থেকে অনেক বেশি ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত আগাগোড়া সবটিতে বাস্তব চিত্রের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এর মধ্যে আসা ধ্রুবকগুলোর মান বদলিয়ে বদলিয়ে যেই মান নিলে আগাগোড়া সব ফ্রিকোয়েন্সির জন্য বাস্তব চিত্রের সঙ্গে মেলার দিক থেকে উপযুক্ত হয় সেটি নিয়ে এই ফরমুলাকে তিনি বাস্তব তথ্যের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মেলাতে পেরেছিলেন। স্মরণ করতে পারি যে চিরায়ত তত্ত্ব অনুযায়ী র‍্যালে-জীন্‌স কম ফ্রিকোয়েন্সিতে বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে পারলেও বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে পারেননি। অন্যদিকে ভীন বেশি ফ্রিকোয়েন্সিতে তা মেলাতে পারলেও কম ফ্রিকোয়েন্সিতে পারেননি। কিন্তু প্ল্যাঙ্ক সব ফ্রিকোয়েন্সিতে তা পেরেছেন– চিরায়ত বিজ্ঞানের বাইরে গিয়ে শক্তির কোয়ান্টামের ধারণা এনে। তাঁর ফরমুলায় প্রাপ্ত ফল যেন সব উত্তাপের জন্যই বাস্তবের সঙ্গে মিলে যায় সে জন্য প্ল্যাঙ্ক h এর নানা মান ব্যবহার করে করে দেখেছেন– এবং যেই মানের জন্য সব ক্ষেত্রেই ফল বাস্তবের সঙ্গে মিলে গেছে তার নিরিখেই h এর মান সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করতে পেরেছেন। এই মান অত্যন্ত ক্ষুদ্র– সাধারণ ব্যবহার্য এককের বিলিয়ন ভাগের, বিলিয়ন ভাগের, বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ। h এর এই অতি ক্ষুদ্র মানই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে কার্যকর সব ফ্রিকোয়েন্সির জন্যই শক্তির প্যাকেট বা কোয়ান্টামের শক্তির পরিমাণ অতি ক্ষুদ্র। অথচ এই অতি ক্ষুদ্র কোয়ান্টামই বিজ্ঞানের অনেক কিছুরই কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক আচরণের একটি সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে যা আমরা এই বইয়ে বার বার দেখবো। h এই ধ্রুবকটিকে পরে 'প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক' নামটি দেয়া হয়েছে।

কোয়ান্টামের ধারণার প্রবর্তন করে কালো-বস্তু-বিকিরণের ফলে সৃষ্ট সংকটের এই সমাধানটি প্ল্যাঙ্ক করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম বছর ১৯০০ সালে। ধারণাটি যথেষ্ট অভিনব হলেও প্ল্যাঙ্ক নিজে মনে করেননি যে এর ফলে এতদিনের প্রতিষ্ঠিত চিরায়ত বিজ্ঞানের অবসান হবে; নিরবিচ্ছিন্ন শক্তিকে ভাগ ভাগ করার কোয়ান্টামের ধারণা ছাড়া তাঁর তত্ত্বের বাকি সব কিছু তিনি চিরায়ত বিজ্ঞানের অনুসরণেই করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এরপর তিন দশকের মধ্যে, আরো কিছু সংকটের মধ্য দিয়ে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে চিরায়ত বিজ্ঞানের অবসানে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পূর্ণাঙ্গ কোয়ান্টাম তত্ত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যাবতীয় রহস্যের ব্যাখ্যা দিচ্ছে।

ফটো-ইলেকট্রন সংকট

আলোর শক্তি বাড়ে তীব্রতায় নয়, ফ্রিকোয়েন্সিতেঃ

ম্যাক্সওয়েলের তত্ত্ব অনুযায়ী বেশ বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ রেডিও-তরঙ্গ যে সত্যি সত্যি সৃষ্টি করা যায় এবং তারবিহীন ভাবে দূরে গিয়ে বৈদ্যুতিক কারেন্ট সৃষ্টি করতে পারে সেটি প্রথম প্রমাণ করেছিলেন হাইনরিখ হার্ৎস (যার নামকে আজো আমরা ফ্রিকোয়েন্সির এককের মধ্যে দেখি)। এই হার্ৎস কিন্তু আরো একটি জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন– তা হলো ধাতব পাতের গায়ে আলো ফেলে তার থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টি। তিনি দেখিয়েছেন যে কোন ধাতুর পাতের ওপর যথাযথ আলো ফেল্‌লে তা ওই পাত থেকে শূন্যের মধ্য দিয়ে ক্যাথোড রে নামে পরিচিত এক রকম রশ্মির সৃষ্টি করে। ইতোমধ্যে বোঝা গিয়েছিলো যে ক্যাথোড রে'র ঋণাত্মক চার্জ রয়েছে– কারণ তা ধনাত্মক আর একটি ধাতব পাত দিয়ে আকৃষ্ট হয় এবং দুই পাত যোগ করে বর্তনী সম্পূর্ণ করলে একটি বৈদ্যুতিক কারেন্ট পাওয়া যায়। আলো ফেলা হয় যে পাতটির ওপর তাকে বলা যায় চার্জের নি:সরণকারী আর চার্জকে আকৃষ্ট করে যে পাত তাকে বলা যায় সংগ্রহকারী। পরে দেখা গেছে যে এই ক্যাথোড রে হলো এটমের একটি কণিকা ইলেকট্রনেরই প্রবাহ। ধাতব পাতের উপর আলো ফেল্‌লে তার গায়ের কিছু ইলেকট্রন আলগা হয়েই এই কারেন্টটি সৃষ্টি করে। আলোর (ফটো) কারণে সৃষ্টি হচ্ছে বলে এই ইলেকট্রনগুলোকে বলা হলো ফটো-ইলেকট্রন।

আরো ভালভাবে ব্যাপারটিকে পরীক্ষা করে বোঝা গেছে যে আলোর শক্তি ধাতুর ইলেকট্রনে স্থানান্তরিত হয়ে কম বন্ধনে থাকা সেই ইলেকট্রনের নড়াচড়া বাড়ায়। এগুলোর মধ্য থেকে পাতের পিঠে উঠে আসা কিছু ইলেকট্রনকে আলগা হয়ে শূন্যে চলে আসা সম্ভব করে ওই শক্তি। তারপরও যেটুকু শক্তি ওই উঠে আসা ইলেকট্রনের কাছে অবশিষ্ট থাকে সেটিই তাকে সেই অনুযায়ী বেগে ছুটে যেতে দেয় বিদ্যুৎ প্রবাহ হিসেবে।

এই ফটো-ইলেকট্রনের সৃষ্টি ও ক্যাথোড রে হিসেবে তার কারেন্টের ওপর পরে বেশ সূক্ষ্ম ভাবে কিছু এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে। সংগ্রহকারী পাতে যদি ধনাত্মক ভোল্টেজ দেয়া হয় তাতে কারেন্ট সৃষ্টি হতে আমরা দেখেছি। নি:সরণকারী পাতের ওপর যদি একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির (নির্দিষ্ট রঙের) আলো ফেলা হয় এবং সেই আলোর তীব্রতা ক্রমাগত বাড়ানো হয়, তা হলে আলো যত তীব্র হয় কারেন্টও তত বাড়ে। বোঝা যায় যে বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন এখন আলগা হয়ে সংগ্রহকারী পাতের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে বলেই কারেন্টটি বাড়ছে। পাত থেকে আলগা হয়ে কত জোরে অর্থাৎ কত শক্তি নিয়ে ইলেকট্রন ছুটে যাচ্ছে সেটির

তুলনা যদি করতে চাই তা হলে সংগ্রহকারী পাতে ধনাত্মক ভোল্টেজ না দিয়ে ঋণাত্মক ভোল্টেজ দিতে হবে। কারেন্টটি তখন কমে যাবে। এই ঋণাত্মক ভোল্টেজ একটু একটু করে বাড়াতে থাকলে কারেন্ট ক্রমেই আরো কমতে থাকে এবং ঠিক একটি ভোল্টেজে এসে একেবারে শূন্য হয়ে যায়। বোঝা গেল যে ঋণাত্মক ভোল্টেজ ফটো ইলেকট্রনকে এগিয়ে আসতে বাধা দিচ্ছে বলেই কারেন্ট কমছে, আর ওই বিশেষ ভোল্টেজটিতে এসে ইলেকট্রনের শক্তির ঠিক সমান বাধা দিচ্ছে বলে ঠিক ওই পর্যায়ে ওটি থেমে যাচ্ছে– তাই কারেন্ট শূন্য হয়ে যাচ্ছে। এই বিশেষ ভোল্টেজটিকে বলি V_0। ইলেকট্রনের শক্তি যত বেশি থাকবে V_0 তত বড় হবে– কাজেই V_0ই হলো ইলেকট্রনের শক্তির পরিমাণ।

আগের মত নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির আলো যত বেশি তীব্র বা কম তীব্র ভাবেই নি:সরণকারী পাতে ফেলি না কেন তাতে দেখা যায় যে V_0 এর মাপে কোন পরিবর্তন আসেনা। অর্থাৎ ওপরের দু'রকমের এক্সপেরিমেন্ট থেকে বোঝা গেল আলোর তীব্রতা ইলেকট্রনের শক্তির ওপর কোন প্রভাব রাখেনা, শুধু ইলেক্ট্রনের সংখ্যার ওপর রাখে। এখন আলোর ফ্রিকোয়েন্সি (রঙ) বদলিয়ে বদলিয়ে ওপরের একই দুটা এক্সপেরিমেন্ট প্রত্যেক ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির আলোর জন্য করা হলো। তীব্রতা বাড়ালে সব ক্ষেত্রেই কারেন্ট বাড়ে অর্থাৎ ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু V_0 এ কোন পরিবর্তন হয়না। কিন্তু আলোর ফ্রিকোয়েন্সির যখন বাড়ে তখন কিন্তু V_0 বড় হতে থাকে, অর্থাৎ বেশি ফ্রিকোয়েন্সির আলো পড়লে যে ইলেকট্রন নি:সরণ হয় তা ছুটে যায় অপেক্ষাকৃত বেশি শক্তি নিয়ে। লাল আলোতে যত V_0 কমলা আলোতে তার চেয়ে বেশি, হলুদে তার চেয়েও বেশি, নীলে আরো। অথচ আলোর তীব্রতার সঙ্গে V_0 এর বাড়া-কমার কোন সম্পর্ক দেখা যায়না। এর মানে যেই আলো পড়ার কারণে ফটো-ইলেকট্রন ছুটে যাচ্ছে তার শক্তি আলোর তীব্রতার ওপর নয়, বরং তার ফ্রিকোয়েন্সির ওপর নির্ভর করছে।

এই ফলাফলটিকে কিছুতেই চিরায়ত বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা গেলোনা বলে এটি তাতে আর একটি সংকট সৃষ্টি করলো। আলো সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত তখনকার তত্ত্ব (চিরায়ত) মতে আলো একটি নির্ভেজাল তরঙ্গ– বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ। একই তত্ত্ব অনুযায়ী সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সাগর তীরের ছোট ছোট পাথরের নুড়ির ওপর এসে পড়লে তার শক্তি নুড়িগুলোতে স্থানান্তর হয় এবং তার ফলে নুড়িগুলো এ শক্তিতে লাফিয়ে ওঠে। আলোর তরঙ্গও একই ভাবে ফটো-ইলেকট্রন সৃষ্টি করে। সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন বেশি উঁচু ঢেউ নুড়িকে বেশি শক্তি দেয়, আলোর ক্ষেত্রেও তাই হতে বাধ্য– তরঙ্গের উচ্চতা যত বেশি ইলেকট্রনের শক্তি তাতে বেশি হবে এমনটিই আশা করা যায়। তরঙ্গের উচ্চতাই

যখন তার তীব্রতা নির্ধারণ করে, কাজেই আলোর তীব্রতা বাড়লেই ইলেকট্রনের শক্তি বাড়া উচিত; কিন্তু বাস্তবে কোন এক্সপেরিমেন্টেই তা হতে দেখা যায়নি। বরং আলোর ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লেই ইলেকট্রনের শক্তি বেড়েছে যার কোন ব্যাখ্যা চিরায়ত তত্ত্বে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি ফ্রিকোয়েন্সিকে কমাতে কমাতে একটি বিশেষ সীমার নিচে নিয়ে আসলে ফটো-ইলেকট্রনের নি:সরণ একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়, সে আলোর তীব্রতা যতই বাড়ানো হোক্ না কেন। স্পষ্টত এই ফ্রিকোয়েন্সিতে উৎক্ষিপ্ত হবার মত শক্তি আলো ইলেকট্রনের কাছে হস্তান্তর করতে পারছেনা। এরও কোন ব্যাখ্যা চিরায়ত বিজ্ঞানে নেই। চিরায়ত বিজ্ঞানের এই সংকটও স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিল বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে।

কোয়ান্টামকে কণিকা মনে করাতেই সমাধান:

ফটো-ইলেকট্রনের আচরণ যে চিরায়ত তত্ত্বকে অমান্য করছে এটি জানার তিন বছরের মধ্যে এর সমাধান করতে পেরেছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে তিনি এটি করেছিলেন এ সম্পর্কিত চিরায়ত বিজ্ঞানকে আরো স্পষ্টভাবে বিদায় জানিয়ে। মজার ব্যাপার হলো তাঁর বিজ্ঞানী-জীবনের একেবারে শুরুতে ওই একই বছরে আইনস্টাইন এটি সহ তিন তিনটি যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রকাশ করেছিলেন যার মধ্যে তাঁর আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বও রয়েছে। পরে এই ফটো-ইলেকট্রন সমস্যার সমাধানের জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কার পান। আইনস্টাইন দেখালেন এ সমস্যার সমাধান একমাত্র হতে পারে যদি আলোর তরঙ্গ এসে ধাতুর ইলেকট্রনকে উৎখাত করছে এমন চিন্তা না করে ধরে নেয়া যায় আলোর কণিকা এসে নিজের সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘর্ষ ঘটিয়ে ধাতুর ইলেকট্রনকে উৎখাত করছে। আর ইতোমধ্যে প্ল্যাঙ্ক শক্তির যে কোয়ান্টামের কথা বলেছেন তাকেই আলোর কণিকা হিসেবে বিবেচনা করলে তার শক্তিতো ফ্রিকোয়েন্সির ওপরেই নির্ভর করার কথা।

পুরো ঘটনাটিকে আইনস্টাইন দেখলেন দুটি কণিকার সংঘর্ষ হিসেবে– এর একটি হলো ধাতুর পিঠে থাকা ইলেকট্রন, অন্যটি আলোর কণিকা। এ যেন মার্বেল খেলার সময় একটি মার্বেল ছুঁড়ে তা দিয়ে ঠুকিয়ে মাটির ওপরে থাকা অন্য একটি মার্বেলকে ওপরে তুলে ফেলা। এক্ষেত্রে কণিকা হিসেবে মনে করার কারণে আলোর কোয়ান্টামের একটি কণিকা-জাতীয় নাম দেয়া হলো ফোটন (আলোর প্রতিশব্দ ফটোর কথা মনে রেখে)। অবশ্য এটি যে প্ল্যাঙ্কের সেই কোয়ান্টাম যার শক্তি তার তরঙ্গ-ধর্মের ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে সমানুপাতী $E = hf$ অনুযায়ী, সেই কথাটিও মনে রাখতে হলো। কাজেই বেশি ফ্রিকোয়েন্সির আলোর ফোটনের শক্তি

বেশি, তাই সেটি ধাতুর পাতের ওপরের ইলেকট্রনকে আরো বেশি শক্তিতে (বেগে) উৎখাত করতে পারে। এভাবে আইনস্টাইন ফটো-ইলেকট্রনের নতুন তত্ত্ব দিলেন– প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টামের ধারণাকে অনুসরণ করে। কিন্তু তাঁর তত্ত্বে কোয়ান্টাম জিনিসটি শুধু শক্তির এক একটি ভাগ বা প্যাকেট হয়ে রইলোনা– একে দেখতে হলো রীতিমত একটি কণিকা হিসেবে।

পরবর্তী অত্যন্ত সূক্ষ্ম সব পরীক্ষায় আইনস্টাইনের তত্ত্ব সব দিক থেকে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। নানা ধরনের ধাতুর ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে ফটো-ইলেকট্রনের বেগ আলোর তীব্রতার ওপর নির্ভর না করে $E=hf$ অনুসরণ করে ফ্রিকোয়েন্সির ওপরেই নির্ভর করে। ফোটনের শক্তির একটি অংশ ব্যয় হয় ইলেকট্রনকে ধাতু থেকে আলগা করতে, অন্য অংশ তার বেগ সৃষ্টি করতে। আলোর ফ্রিকোয়েন্সি অনুযায়ী ফোটনের যে শক্তি হবার কথা তার থেকে এই উভয় অংশের সুন্দর হদিশ মেনে। যেই ধাতুই নেয়া হোক না কেন আলোর ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে উল্লিখিত Vo এর গ্রাফ আঁকলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুন্দর সরল রেখা পাওয়া যায়। আর আলোর তীব্রতা বাড়ালে ফোটনের সংখ্যা বাড়ে তার ফলে শুধু ফটো-ইলেকট্রন কারেন্ট বৃদ্ধি পায়, যাতে বোঝা যায় যে ফোটনের সংখ্যা বেশি হওয়াতে তাদের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রনের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোন কোন বিজ্ঞানী খুবই মনোযোগ দিয়ে খুবই সূক্ষ্মভাবে এই এক্সপেরিমেন্টগুলো করছিলেন এর কোন ব্যতিক্রম বের করতে পারেন কিনা দেখতে। কারণ তরঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত আলো আবার এরকম কণিকা হওয়ার ধারণাটি চিরায়ত বিজ্ঞানের একেবারে আঁতে ঘা দিচ্ছিলো– তা তাঁরা মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু কোন ব্যতিক্রম তাঁরা খুঁজে পাননি, আলোকে এ ক্ষেত্রে কণিকা হিসেবে মানতেই হয়েছে। কিন্তু দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্ট যে একেবারে স্পষ্ট ভাবে আলোকে তরঙ্গ প্রমাণিত করেছে– তার কী হবে? বোঝা গেল আলোর কণিকা-ধর্ম এবং তরঙ্গ-ধর্ম উভয়েই রয়েছে– ফটো-ইলেকট্রন এক্সপেরিমেন্টে তার কণিকা-ধর্ম প্রকাশ পাচ্ছে, আর দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টে তার তরঙ্গ-ধর্ম। অবশ্য একই সঙ্গে একই এক্সপেরিমেন্টে উভয় ধর্ম থাকতে পারবেনা। আলোর মত অন্য সব বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গেরও এই কণিকা ধর্ম রয়েছে। পরে দেখা গেছে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গের বাইরেও কিছু তরঙ্গেরও। আলোর এই তরঙ্গ-কণিকা দ্বৈততা চিরায়ত বিজ্ঞানের একেবারে মর্মমূলে আঘাত করলো। চিরায়ত বিজ্ঞানের আওতায় এমন কথা ভাবাই যায় না। আসলে আমাদের বোধশক্তিতেও এমন কথা ভাবা কঠিন। একটি জিনিস হয় কণিকা হবে, নইলে তরঙ্গ হবে– এমন করেই তো আমরা বুঝি। কিন্তু প্রকৃতি

আমাদেরকে এমন দ্বৈতভাবে ভাবতে বাধ্য করছিলো। এভাবে প্রকৃতিই আমাদেরকে ক্রমে চিরায়ত জগত থেকে কোয়ান্টাম জগতের দিকে নিয়ে গিয়েছে।

বর্ণালী-লাইন ও এটম-মডেলের সংকট

বর্ণালীতে উজ্জ্বল লাইন ও কালো লাইনঃ

বহু আগে ১৭৫২ সালে স্কটিশ বিজ্ঞানী টমাস মেলভিল লক্ষ্য করেছিলেন যে বাতির শিখার মধ্যে কোন কোন গ্যাস উত্তপ্ত করলে এক একটি গ্যাসের ক্ষেত্রে এক এক রকমের উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। বর্ণহীন আগুনের শিখার মধ্যে লবন ছিটা দিয়ে আমরাও খুব সহজে এটি লক্ষ্য করতে পারি– লবনে যে সোডিয়াম আছে সেই সোডিয়াম বাষ্প শিখাকে উজ্জ্বল হলুদ রঙ দিয়ে থাকে। রাস্তায় যে সোডিয়াম বাতি দেখি তার ভেতর সোডিয়াম বাষ্পই তাকে একই ভাবে হলুদ আলোর বাতি করে তোলে। নিয়োন বাতির রঙ যে লাল তা এর ভেতর নিয়োন গ্যাস আছে বলেই। অন্যান্য রঙের বাতির ক্ষেত্রেও এক একটি গ্যাস দায়ী। মেলভিলের সেই প্রথম আবিষ্কারের পর সূক্ষ্ম পরীক্ষায় ও নিয়ে আরো কিছু ব্যাপার ধরা পড়েছে।

উত্তপ্ত গ্যাসের ওই রঙীন আলোর বর্ণালীকে স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রে পরীক্ষা করা হয়েছে। সাদা আলো প্রিজমের ভেতর দিয়ে নিয়ে গেলে আমরা বর্ণালী দেখি– সাদা আলোর ভেতর যে বিভিন্ন রঙ তা তাদের ফ্রিকোয়েন্সি বেশি থেকে কমের দিকে বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল অংশ রূপে বিশ্লিষ্ট হয়ে একটানা একটি বর্ণালী গঠন করে। সংক্ষেপে আমরা একে বলি বেনীআসহকলা। স্পেকট্রোস্কোপ (বর্ণালী বীক্ষণ) যন্ত্রে এটি আরো ভাল ভাবে পরীক্ষা করা যায়। এতে মাঝখানে রাখা একটি প্রিজমের মধ্য দিয়ে সরু উৎস থেকে আসা আলোকে নিয়ে যাওয়া হয়। এর ফলে নানা রঙের আলো প্রিজমের থেকে নানা দিকে যে ভাবে বিক্ষিপ্ত হয় তাকে একটি টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা হয় এবং বিক্ষেপণের কোণ মেপে বর্ণালীতে তার স্থান নির্ধারণ করা হয়। সাদা আলোর বর্ণালী একটি নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী– এতে একটি রঙ কিছুটা জায়গা পর অন্য রঙের সংলগ্ন হয়, আগাগোড়া নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। স্পেকট্রোস্কোপের মাপ থেকে বুঝি বর্ণালীতে কোথায় কোন্ রঙের (কোন্ ফ্রিকোয়েন্সির) নির্ধারিত স্থান। সাদা আলোর ক্ষেত্রে এমন হলেও রঙীন আলোর ক্ষেত্রে কিন্তু বর্ণালী এরকম নিরবিচ্ছিন্ন নয়।

উত্তপ্ত গ্যাসের রঙীন আলোকে ওই যন্ত্র দিয়ে দেখলে এক একটি গ্যাসের ক্ষেত্রে শুধু কিছু সুনির্দিষ্ট উজ্জ্বল লাইন দেখা যায়– সে লাইন যেখানে দেখা যায় সেই স্থানের হিসেবে তার রঙ। যেমন সোডিয়াম বাষ্প থেকে আসা বর্ণালীতে থাকে শুধু দুটি খুব কাছাকাছি উজ্জ্বল হলুদ লাইন। উত্তপ্ত হাইড্রোজেন থেকে পাওয়া যায় লাল, সবুজ, নীল, ও বেগুনি রঙের প্রত্যেকটির একটি করে উজ্জ্বল লাইন, সবগুলো যথাস্থানে। এমনি করে প্রত্যেকটি উত্তপ্ত গ্যাসের জন্য বিভিন্ন উজ্জ্বল লাইনে তার একটি নিজস্ব বর্ণালী প্যাটার্ন থাকে– যেটি একেবারেই সুনির্দিষ্ট, কোন একটি গ্যাসের লাইনের প্যাটার্নের সঙ্গে অন্য গ্যাসেরটির কখনো মিলে যায় না। আসলে যে কোন মৌলিক পদার্থকে উত্তপ্ত করে বাষ্পীভূত করলে তার এরকম নিজস্ব উজ্জ্বল লাইনের প্যাটার্ন পাওয়া যায়– এ যেন প্রত্যেক মৌলের নিজের স্বাক্ষর বা আঙ্গুলের ছাপ, এটি দেখেই তাকে সনাক্ত করা যায়।

আসলে মৌল সনাক্ত করার এটি একটি চমৎকার উপায়– তাকে উত্তপ্ত করে তার থেকে আসা আলোর বর্ণালীতে উজ্জ্বল লাইনের প্যাটার্ন দেখা। যেমন লবনের মত দানাদার কোন কিছুকে লবন ছাড়া অন্য কিছু মনে হতে পারে, কিন্তু তাকে আগুনের শিখার ওপর ছিটিয়ে দিলে যদি তার আলো স্পেকট্রোস্কোপে পরীক্ষা করে ওই দুটি হলুদ লাইন দেখা যায় তাহলে নিশ্চিত জানবো যে ওটি আমাদের সাধারণ লবন সোডিয়াম ক্লোরাইড, অন্য কিছু নয়।

এতক্ষণ উত্তপ্ত গ্যাসের কারণে আসা উজ্জ্বল লাইনের কথা বলা হলো। কিন্তু এ নিয়ে আরো এক ধরণের পরীক্ষা করা হয়েছে। কোন উৎস থেকে সৃষ্ট সাদা আলোকে ঠান্ডা একটি গ্যাসের ভেতর দিয়ে বেশ খানিক দূর নিয়ে যাওয়ার পর সেই আলো স্পেকট্রোস্কোপে দেখলে সাদা আলোর ক্ষেত্রে যা পাওয়া উচিত সেই বেনীআসহকলা পুরো নিরবিচ্ছিন্ন বর্ণালী ঠিকই পাওয়া গেলো বটে, কিন্তু তার ওপর বিভিন্ন জায়গায় কিছু কিছু কালো লাইনও দেখা গেলো। মজার ব্যাপার হলো ওই গ্যাসটার উত্তপ্ত অবস্থায় এর থেকে যে উজ্জ্বল লাইনগুলো পাওয়া যেতো এই কালো লাইনগুলো তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

যেমন উত্তপ্ত হাইড্রোজেন গ্যাসের আলোতে আগে যে লাল, সবুজ, নীল, ও বেগুনি উজ্জ্বল লাইন যেখানে যেখানে পাওয়া গিয়েছেন এখন ঠাণ্ডা হাইড্রোজেন গ্যাসের ভেতর দিয়ে আসা সাদা আলোর বর্ণালীতে ঠিক সেখানে সেখানে কালো লাইন দেখা গেলো। এতে কতগুলো জিনিস পরিস্কার হয়ে গেলো। উজ্জ্বল লাইনগুলো আসছিলো উত্তপ্ত গ্যাসের থেকে নির্গত আলোর বৈশিষ্টকে নিয়ে, তাই এই লাইনগুলোকে বলা গেলো নি:সরণ লাইন। অন্যদিকে সাদা আলোটি আসছে

অন্য কোন উৎস থেকে, যেমন বাতির ধাতব ফিলামেন্ট অতি উজ্জ্বল হয়ে– তাই তার মধ্যে বেনীআসহকলা পুরো বর্ণালী পাওয়া যায়। কিন্তু আসার পথে ঠাণ্ডা গ্যাসটি তার থেকে বিশেষ বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির আলো শোষণ করে নিচ্ছে। কাজেই সাদা আলোর বর্ণালীর ঠিক ওই জায়গায় ওই ফ্রিকোয়েন্সির আলোর অভাব ঘটায় ওখানে কালো লাইন সৃষ্টি হচ্ছে। এই কালো লাইনগুলোকে তাই বলা যায় শোষণ লাইন। নি:সরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই শোষণ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক রয়েছে বলেই একটি গ্যাসের জন্য যেখানে যেখানে নি:সরণ লাইন ছিল, তার জন্য ঠিক সেখানে সেখানেই শোষণ লাইন দেখা দেয়। এভাবেই প্রত্যেক মৌলের জন্য তার নি:সরণ লাইনের প্যাটার্ন (উজ্জ্বল লাইন) তার শোষণ লাইনের প্যাটার্নের (কালো লাইন) সঙ্গে সুন্দর মিলে যায়।

কালো লাইনগুলোর মাধ্যমে সূর্যের থেকে এত দূরে থেকেও আমরা সহজেই জানতে পারি সূর্যের মধ্যে কোন্ কোন্ মৌলিক পদার্থ আছে শুধু তার আলোর বর্ণালী পরীক্ষা করে। সূর্যের আলোটি আসে তার অত্যন্ত উত্তপ্ত অভ্যন্তরের বিকিরণ থেকে, যার রঙ সাদা হওয়াতে সূর্যের আলোর বর্ণালী পুরো সাত রঙে গড়া। কিন্তু ওই অভ্যন্তর থেকে আসার সময় সূর্যের বাইরের দিকে থাকা অপেক্ষাকৃত অনেক কম উত্তপ্ত বিভিন্ন মৌলের গ্যাসের ভেতর দিয়ে আসার সময় প্রত্যেকটি মৌলের প্যাটার্ন অনুযায়ী কিছু কিছু ফ্রিকোয়েন্সির আলো শোষিত হয়। কাজেই স্পেকট্রোস্কোপে সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করলে ওই গ্যাসগুলোর শোষণ লাইনের (কালো লাইন) প্যাটার্ন তাতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ এতে বর্ণালীর হলুদের অংশে খুব কাছাকাছি থাকা দুটি কালো লাইন দেখা যায়। তখন ল্যাবোরেটরীতে সৃষ্ট সোডিয়াম বাতির বর্ণালীতে সোডিয়ামের দুটি উজ্জ্বল হলুদ লাইন যেখানে পাওয়া যায় ফ্রিকোয়েন্সি মিলিয়ে তার সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় সূর্যের বর্ণালীর ওই দুটি কালো লাইন ল্যাবোরেটরির এই দুই উজ্জ্বল লাইনের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এভাবে বোঝা গেছে সূর্যের বাইরের দিকের সোডিয়াম বাস্পে আলোর এই অংশ শোষিত হওয়াতেই কালো লাইন দুটি সৃষ্টি হয়েছে– অর্থাৎ সূর্যে সোডিয়াম আছে। এভাবে ল্যাবোটেরির অন্য মৌলের উজ্জ্বল লাইনের সঙ্গে মিলিয়ে সূর্যের বর্ণালীর বাকি কালো লাইনের প্যাটার্নগুলোকে এবং সূর্যের মধ্যে তাদের মৌলগুলোকে সনাক্ত করা গেছে। এরকম একটি পরীক্ষায় এমন একটি প্যাটার্ন ওতে দেখা গেছে যার সঙ্গে ল্যাবোরেটরির কোন প্যাটার্নই মিল্‌ছিলোনা। বোঝা গেল এটি সূর্যে এমন কোন গ্যাসের কারণে ঘটছে যেটি পৃথিবীতে তখনো আবিষ্কৃত হয়নি। পরে অবশ্য সেটি পৃথিবীতেও পাওয়া গেছে। প্রথমে সূর্যে আবিষ্কৃত হয়েছে বলে এর নাম দেয়া হয়েছে হিলিয়াম– যেটি গ্রীক

ভাষায় সূর্যেরই নামে। শুধু সূর্যের মৌল নয় এভাবে সুদুর তারার আলোর বর্ণালী দেখে সেখানেও বিভিন্ন মৌলের অস্থিত্ব প্রমাণ করা গেছে।

আমাদের জন্য এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি হলো একটি মৌল বিশেষ প্যাটার্নের নানা ফ্রিকোয়েন্সির আলো নি:সরণই বা করে কেন, আর ঠিক সেই নানা ফ্রিকোয়েন্সির আলো শোষণই বা করে কেন। এক মৌলের থেকে অন্য মৌলের পার্থক্য হলো তার এটমে। মৌলের এসব আচরণের মানে হলো তার এটমের সেরকম আচরণ। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হবে এটমের গঠনে এবং তাতে আলো সৃষ্টি বা শোষণের প্রক্রিয়ায়। সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টাটি আমরা একটু পরে দেখবো– কারণ সেখানেই রয়ে গেছে চিরায়ত বিজ্ঞানের অন্য একটি সংকট। কিন্তু ইতোমধ্যে অন্তত অপেক্ষাকৃত সরল হাইড্রোজেন ওই গ্যাসের জন্য লাইনের প্যাটার্নটির গাণিতিক ভবিষ্যদ্বাণী করার একটি উপায় উদ্ভাবনের কথা দেখা যাক, যেটি করেছিলেন সুইজারল্যান্ডের একজন স্কুল শিক্ষক বামার, ১৮৮৫ সালে।

বামার এটি করেছিলেন অনেকটা গাণিতিক ধাঁধাঁ সমাধানের মত করে একটি ফরমুলা আবিষ্কারের মাধ্যমে। এই ফরমুলা থেকে হিসেব করে করে বর্ণালীতে দৃশ্যমান আলোর পর্যায়ে থাকা হাইড্রোজেনের চারটি লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি আগাম বলে দেয়া সম্ভব হয়েছে; পরে দৃশ্যমান অংশের বাইরে অন্য কিছু লাইনেরও। বর্ণালীর চার বিভিন্ন জায়গায় ইতস্তত থাকা চারটি লাইন হুবহু একটি ফরমুলা থেকে বলে দেয়া– এ চারটিখানি কথা নয়। নেহাৎ ধাঁধাঁর সমাধানের মত করে এটি আসতে পারে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে এটমে সত্যিকার আলো সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মিল না থাকলে একে খুব আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক বলতে হবে। অবশ্য সেই মিল থাকলেও তা তখন জানার উপায়ে ছিলনা।

ফরমুলাটি হলো এরকম: $f = R\ (\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2})$

এর মধ্যে f হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি, R হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সির এককে একটি ধ্রুবক সংখ্যা যা বামার নির্ণয় করেছিলেন, n_f এবং n_i হলো $1,2,3,4$ ইত্যাদির মধ্য থেকে দুটি ছোট পূর্ণ সংখ্যা– n_f কে বলা হয় 'শেষ n' এবং n_i কে বলা হয় 'শুরুর n'। দৃশ্যমান চারটি লাইনের জন্য বামার n_f এর মান নিলেন 2 এবং এক একবার n_i এর মান নিলেন $3,4,5,6$। n_i এর এরকম এক একটি মানের জন্য ফরমুলা থেকে হিসেব করে হাইড্রোজেনের এক একটি লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি একেবারে নিখুঁত ভাবে পাওয়া যায়। n_f এবং n_i এর ভিন্ন মান নিয়ে পরে দৃশ্যমান বর্ণালীর বাইরে আলট্রা-ভায়োলেট ও ইনফ্রা-রেড অঞ্চলে থাকা অন্য

লাইনগুলোও এই ফরমুলা থেকেই হুবহু আগাম বলে দেয়া সম্ভব হয়েছে। পরে দেখবো এটমের সঠিক বর্ণনা ও আলো সৃষ্টির সঠিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে এই ফরমুলার মিল থাকার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। এই মিল অবশ্য বামারের কাছে বা তাঁর পরেও বহুদিন অন্য কারো কাছে জানা ছিলনা; সেটি আবিষ্কার হয়েছে পরে।

এটমের ভেতরটা বোঝার চেষ্টাঃ

এক সময় এটমকে মার্বেলের মত নিরেট জিনিস মনে করা হতো, যেন তার অভ্যন্তর বলতে কিছু নেই, অভ্যন্তরের গঠন বলতে কিছু নেই। কিন্তু এটি যে সে রকম নয় সেটি প্রমাণ করলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৃটিশ বিজ্ঞানী জে জে থমসন। সেই সঙ্গে তিনি এটমের একটি মডেলও খাড়া করলেন– অর্থাৎ এর ভেতরে কোন্ জিনিস কীভাবে আছে তার একটি কাল্পনিক ছবি। তিনি দেখিয়েছিলেন কী ভাবে একটি উত্তপ্ত ধাতব পাত থেকে শূন্যের মধ্যে ক্যাথোড রে নির্গত হয়। ক্যাথোড রে জিনিসটির সাক্ষাত আমরা ফটো-ইলেকট্রন প্রসঙ্গে ইতোমধ্যে পেয়েছি। স্পষ্টত এ রশ্মি ওই ধাতুর এটম থেকে বেরুচ্ছে এবং রশ্মির অন্তর্গত জিনিসগুলো এটমের অংশ এবং এটমের থেকে ছোট। এ রশ্মিকে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রে রেখে তার বেঁকে যাওয়ার ভঙ্গি ও পরিমাণ মেপে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এ রশ্মি ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জের কণিকায় গঠিত– পরে যার নাম দেয়া হয়েছে ইলেকট্রন। নানা বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রে রশ্মির বেঁকে যাওয়ার পরিমাণের ওপর গতিবিদ্যার হিসেব কষে এই ইলেকট্রনের চার্জ ও ভরের অনুপাত জানা সম্ভব হলো, অর্থাৎ $\frac{\text{চার্জ}}{\text{ভর}}$। পরে আমেরিকান বিজ্ঞানী মিলিক্যান অন্য রকম পরীক্ষায় ইলেকট্রনের চার্জও নির্ণয় করেছেন। এটিই ছিলো যে কোন ঋণাত্মক চার্জের মধ্যে ক্ষুদ্রতম চার্জ। এই দুই পরিমাপ একত্র করে ইলেকট্রনের ভরও পাওয়া গেল যা কিনা সব চেয়ে হালকা এটম হাইড্রোজেন এটমের থেকে দুই হাজার গুণ কম! বোঝা গেল এটমের খুবই অল্প ভরযুক্ত অংশ হলো একটি বা একাধিক এই ঋণাত্মক ইলেকট্রন কণিকা।

অথচ সামগ্রিক ভাবে এটমের কোন চার্জ নেই। কাজেই ইলেকট্রনের গঠিত এটমের ঋণাত্মক অংশের সমান পরিমাণ ধনাত্মক চার্জ কোনভাবে এর মধ্যে থাকতে হবে। ধনাত্মক অংশকে কণিকা হিসেবে বের হতে দেখা যায়নি, এটমের বাকি সিংহভাগ ভর এখান থেকেই আসার কথা। কাজেই থমসন ধরে নিলেন এই ধনাত্মক অংশ পুরো এটম জুড়ে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে রয়েছে। আর ঋণাত্মক

ইলেকট্রনগুলো এর মধ্যে এমন ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যেন সামগ্রিক ভাবে এটমের বৈদ্যুতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয়। এটমের আয়তন বিবেচনায় এক একটি মৌলের এটমে ইলেকট্রন সংখ্যা কত হতে পারে তাও তিনি অনুমান করলেন। সব মিলে থমসন পুরো এটমের একটি গঠন, খাড়া করে ফেল্‌লেন– 'থমসনের এটম মডেল'। এর একটি ডাকনামও দেয়া হলো– 'কিসমিস দেয়া পুডিং মডেল'। পরিচিত এ জিনিসটিকে উপমা হিসেবে নিয়েই নামটি এলো, যাতে মূল পুডিংটিকে ধনাত্মক অংশের উপমায় আর ওতে ছড়ানো থাকা ইলেকট্রনগুলোকে কিসমিসের উপমায় নেয়া হলো।

থমসন তাঁর এই এটম মডেল ধরে নিয়ে এটমের নানা আচরণকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলেন, কিছু ক্ষেত্রে সফলও হলেন। তাঁর একটি চেষ্টা ছিল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জের যে বিন্যাস ওখানে আছে তাতে পুরো এটমটির কম্পনের স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সিগুলো নির্ণয় করা এবং দেখানো যে সেই সব ফ্রিকোয়েন্সিতেই এই এটম আলো নি:সরণ করে বর্ণালীর উজ্জ্বল লাইন সৃষ্টি করতে পারে। একটি সিস্টেমে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক চার্জ যদি থাকে তাহলে তাদের আকর্ষণ-বিকর্ষণের কারণে সিস্টেমটি তালে তালে কাঁপতে পারে অনেকটা একটি স্প্রিং এর মত। বৈদ্যুতিক চার্জ কাঁপলে স্পন্দনকারীর মত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে– যেমন আলোর তরঙ্গ। একটি স্প্রিং কী কী ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপবে তা তার গঠন অনুযায়ী নির্দিষ্ট যাকে স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সি বলা হয়। এটমের ক্ষেত্রেও তেমন হবে। একই ভাবে ওই ফ্রিকোয়েন্সিগুলোতেই আলো শোষেণ করে কালো লাইনগুলোর সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এর কোন সত্যিকার প্রক্রিয়া গড়ে তোলার আগেই এটমের এই পুরো ছবিটাকেই বাতিল করতে হয়েছে।

থমসনের মডেল বাতিল হলো ১৯০৮ সালে তাঁর নিজের প্রাক্তন ছাত্র রাদারফোর্ডের হাতে। রাদারফোর্ড আসলে থমসনের মডেলটির সঠিক কিনা তা ভাল করে পরীক্ষা করার জন্য একটি এক্সপেরিমেন্টের আয়োজন করেছিলেন। এতে খুব পাতলা সোনার পাতের দিকে তেজস্ক্রিয় এটম থেকে নির্গত একটি রশ্মি ছুঁড়ে দেয়ার ব্যবস্থা হলো। কোন কোন এটম নিজ থেকে ভেঙ্গে গিয়ে তার থেকে আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি নামে তিন রকমের রশ্মি বের হয় এ কথা জানা ছিল। জানা ছিল যে এর মধ্যে আলফা রশ্মি তুলনামূলক ভাবে বেশি ভারি ও ধনাত্মক চার্জে গড়া কণিকাতে তৈরি, যাকে বলা হয় আলফা কণিকা। রাদারফোর্ড এই আলফা কণিকাগুলো ক্ষুদ্র বুলেটের মত সোনার পাতের দিকে ছুঁড়ে নিয়ে দেখতে চেয়েছেন ওখানে এটমের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এগুলো

কীভাবে এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়। এ জন্য এই এক্সপেরিমেন্টকে রাদারফোর্ডের 'সোনার পাত এক্সপেরিমেন্ট' বলা হয়। এটমগুলোর গঠন যদি কিসমিস দেয়া পুডিং মডেল অনুযায়ী হয় তাহলে সেখানে ধনাত্মক চার্জ সারা এটমে এতো পাতলা হয়ে ছড়িয়ে থাকবে যে ধনাত্মক আলফা কণা তার দ্বারা বেশি বিকর্ষিত হয়ে এদিক-ওদিক বড় একটি যাবেনা, গেলেও খুব ছোট কোণ করে যাবে। এটি তাই যায় কিনা দেখার জন্য সোনার পাতের চারিদিকে আলফা কণিকা উদ্ঘাটক যন্ত্র বসানো হলো। কিন্তু যা আশা করা হয়েছিলো ফলাফল মোটেই সে রকম হলোনা। উদ্ঘাটক যন্ত্রে যেমনটি ধরা পড়লো তাতে বোঝা গেল কিছু কিছু আলফা কণিকা আশানুরূপ অল্প এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হয়েছে, এমনকি অনেকগুলো মোটেই না বেঁকে সোজা চলে গিয়েছে। কিন্তু বাকিগুলোর বিক্ষেপন খুবই বেশি– দারুণ ভাবে বেঁকে গিয়েছে, আরো বড় কথা হলো কোন কোনটা সোজা পেছনের দিকে উল্টো ফেরৎ চলে এসেছে! এটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার; রাদারফোর্ডের ভাষায় এ যেন টিশ্যু পেশারের দিকে কামানের গোলা ছুঁড়ে দিলে টিশ্যু পেপারে আঘাত করা গোলা সোজা নিক্ষেপকারীর দিকে সজোরে ফিরে আবার মত! এটম যদি থমসনের কিসমিস দেয়া পুডিং মডেলের মত হতো তা হলে এমনটি কখনোই হতে পারতো না।

এই এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল অনুযায়ী রাদারফোর্ড এটমের নতুন মডেল খাড়া করলেন। কয়েকটি ধনাত্মক আলফা কণাকে ওভাবে বেশি বাঁকিয়ে দিতে হলে, এমনকি সোজা ফিরিয়ে দিতে হলে এটমের মধ্যে একটি জায়গায় খুবই ঘনীভূত হয়ে সব ধনাত্মক চার্জ থাকতে হবে যা আলফা কণিকাকে দারুণ ভাবে বিকর্ষিত করতে পারে। একে বলা হলো এটমের নিউক্লিয়াস। এরকম ক্ষেত্রে এটমের বাকি সিংহ ভাগ শুধুই শূন্য স্থান– এ জন্যই এতগুলো আলফা কণিকা সোজা সামনে চলে গেছে বা অতি অল্প বিক্ষিপ্ত হয়েছে। ঋণাত্মক ইলেকট্রনগুলো এর মধ্যে স্থির কোথাও থাকলে তা ওই ঘনীভূত ধনাত্মক নিউক্লিয়াসে আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে মিশে যাবে। তাই সেগুলোকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য নিউক্লিয়াসের চারিদিকে নানা কক্ষপথে ঘুরতে হবে– অনেকটা যেভাবে সৌরজগতে সূর্যের চারিদিকে গ্রহগুলো ঘোরে। এটমের এই নতুন মডেলকে তাই বলা হলো রাদারফোর্ডের 'সৌরজগত মডেল'। এই মডেলটি নানা দিক থেকে খুবই সঠিক ও কার্যকর হবার আশ্বাস দিলো বটে, তবে চিরায়ত বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বের দিক থেকে এতে একটি বিরাট বিপত্তি লক্ষ্য করা গেলো। এই তত্ত্ব অনুযায়ী এরকম একটি এটম ক্ষণমাত্রও স্থায়ী হবার কথা নয়।

এর কারণ সৌরজগত মডেল নাম দেয়া হলেও এটমের এই মডেলের সঙ্গে সৌর জগতের একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। সৌর জগতে গ্রহগুলোর বৈদ্যুতিক চার্জ নেই, কিন্তু এটমের ইলেকট্রনের তা আছে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব অনুযায়ী কোন চার্জের বেগ বা দিক পরিবর্তিত হলে সেটি একটি স্পন্দনকারীর মত কাজ করে বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ সৃষ্টি করবে এবং তার মাধ্যমে শক্তি বিকিরণ করবে। এটমে ঘূর্ণনশীল এই ঋণাত্মক চার্জের ইলেকট্রন ঠিক তাই করবে – ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করে শক্তি হারাবে এবং ফলে এর কক্ষপথ ছোট হতে হতে এটি নিউক্লিয়াসের সঙ্গে এসে মিলিত হবে, সবই মুহূর্তের মধ্যে। এভাবে চুপসে গিয়ে এটমটির অস্থিত্ব আর থাকবেনা। সৌরজগতে গ্রহের চার্জ নেই বলে এজগত চুপসে যায়না। কিন্তু এটমের ক্ষেত্রে এই মডেল চল্‌বেনা যদি এটি চিরায়ত বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলে। দেখা গেল কোন ভাবেই এই এটম মডেলটিকেও টিকিয়ে রাখা যাচ্ছেনা। এটিই এটম মডেলের সংকট।

এটমের একটি বিশ্বাসযোগ্য গঠন যদি না পাওয়া যায় তা হলে এর থেকে বর্ণালীর উজ্জ্বল ও কালো লাইনের ব্যাখ্যা পাওয়ার আশাও থাকেনা। এটম মডেলের সংকট এভাবে বর্ণালী লাইনের ব্যাখ্যার সংকটে পরিণত হলো।

কোয়ান্টাম ধারণায় নতুন এটম মডেলঃ

এটম মডেলের এই সংকটের এক ধরণের সমাধান করতে পারলেন ডেনমার্কের বিজ্ঞানী নীল বোর ১৯১২ সালে তাঁর পরিবর্তিত এটম মডেল দেয়ার মাধ্যমে। তিনি রাদারফোর্ডের সৌরজগত মডেলের মূল কাঠামোটি অক্ষুণ্ন রাখলেন বটে, কিন্তু তার মধ্যে প্ল্যাঙ্ক এবং আইনস্টাইনের শক্তি-কোয়ান্টামের ধারণাটি চমৎকার ভাবে ব্যবহার করলেন। এই কোয়ান্টাম ধারণা না এনে আর কোন ভাবে রাদারফোর্ডের এটমকে স্থায়ী প্রতিপন্ন করা যাচ্ছিলনা। তিনি দেখালেন এটমে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘোরে বটে, কিন্তু তা যে কোন কক্ষপথে ঘুরতে পারেনা, পারে শুধু নির্দিষ্ট কিছু স্থায়ী কক্ষপথে, কারণ এর শুধু নির্দিষ্ট কিছু শক্তিতে থাকার 'অনুমোদন' আছে, অন্য শক্তিতে থাকার অনুমোদন নেই। এই অনুমোদন দিচ্ছে সেই শক্তি কোয়ান্টাম– যার কোন ভাংতি হয়না। অনুমোদিত ওই স্থায়ী কক্ষপথগুলোর মাঝে অন্য কোন জায়গায় থাকতে গেলে কোয়ান্টামের সেই নিয়ম লঙ্ঘন করা হবে। শক্তি হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নিউক্লিয়াসের ওপর পড়ে যেতে হলে ইলেকট্রনকে ওরকম নানা অননুমোদিত কক্ষের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, কাজেই তা সম্ভব নয়। এটম চুপসে যাবার কোন ভয় নেই।

চিরায়ত বিজ্ঞানে আমরা দেখেছি বক্র রেখায় চল্‌লে যে কোন বস্তুর একটি কৌণিক ভরবেগ থাকে। বৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে হলে ইলেকট্রনেরও এরকম কৌণিক ভরবেগ থাকতে হয় যা তার ভর, বেগ, আর বৃত্তের ব্যাসার্ধের গুণফলের সমান। নীল বোর এখন এই কৌণিক ভরবেগকে এটমের ক্ষেত্রে চিরায়ত চিন্তা থেকে কোয়ান্টাম চিন্তার মধ্যে নিয়ে এলেন; দেখালেন যে যে কোন কৌণিক ভরবেগে (অর্থাৎ যে কোন ব্যাসার্ধের কক্ষপথে) ইলেকট্রন থাকতে পারবেনা, পারবে শুধু $\frac{h}{2\pi}$, $2\frac{h}{2\pi}$, $3\frac{h}{2\pi}$, $4\frac{h}{2\pi}$ এভাবে, অন্য ভাবে নয়। বার বার লিখতে হয় বলে $\frac{h}{2\pi}$ কে সংক্ষপে $\hbar$ হিসেবে লেখা হয়, আর একে বলা হয় এইচ-বার (রেখা সহ এইচ)। কাজেই ওপরের কৌণিক ভরবেগ বিশেষ বিশেষ মান শুধু নিতে পারে $\hbar$, $2\hbar$, $3\hbar$ এই ভাবে – একে বলা হলো কৌণিক ভরবেগের কোয়ান্টায়ন। এভাবে গোটা গোটা বা থোকে থোকে থাকাকে বোঝাতে সব কিছুর ক্ষেত্রেই কোয়ান্টায়ন কথাটি ব্যবহার করা হলো। কোয়ান্টাম তত্ত্বে নীল বোরের কৌণিক ভরবেগের কোয়ান্টায়নের নীতিটি তাই লেখা যায়:

কৌণিক ভরবেগ= $n\hbar$ যেখানে $n=1, 2, 3,$ ইত্যাদি। n এর এক একটি মান $1, 2, 3$ ইত্যাদিকে বলা হলো এক একটি কোয়ান্টাম নম্বর। এটমের নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে যত বড় ইলেকট্রনের কক্ষপথ এই নম্বর তত বড়।

তাঁর এই নতুন এটম মডেল ব্যবহার করে নীল বোর এবার বর্ণালীর সেই উজ্জ্বল আর কালো লাইনগুলোর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করলেন। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী এটমে একটি ইলেকট্রন ওই অনুমোদিত কক্ষপথের বাইরে না গিয়েও কোন এক ভাবে এক অনুমোদিত কক্ষপথ থেকে অন্য অনুমোদিত কক্ষপথে চলে যেতে পারে। একে বলা হলো 'কোয়ান্টাম লাফ'। অবশ্য কেমন করে মাঝখান দিয়ে না গিয়ে এই স্থানান্তর সম্ভব হয় তার কোন জবাব বোরের ব্যাখ্যায় ছিলনা, ঠিক কোন্ মুহূর্তে এরকম কোয়ান্টাম লাফ ঘটবে তাও নয়। উচ্চতর (বৃহত্তর) কক্ষপথে থাকা ইলেকট্রনের শক্তি বেশি, নিম্নতর (ক্ষুদ্রতর) কক্ষপথে থাকলে তা কম। কাজেই বৃহত্তর থেকে ক্ষুদ্রতর একটি কক্ষপথে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হলে যেই শক্তিটি সে হারিয়ে ফেলবে সেটি কোন ভাবে বিকীর্ণ হয়ে যেতে হবে। বোর বল্‌লেন ওই বিকীর্ণ শক্তিটুকুই বর্ণালীর সেই উজ্জ্বল আলোর লাইনের উৎস। এরকম এক একটি স্থানান্তর এক একটি লাইনের সৃষ্টি করে। উত্তপ্ত গ্যাসে উত্তাপের শক্তি নিয়ে ইলেকট্রন উচ্চতর কক্ষে যায় বটে কিন্তু পরে আবার নিম্নতর কক্ষপথে ফিরে আসে– তখনই ঘটে সেই আলোর নি:সরণ যা একটি উজ্জ্বল

লাইন সৃষ্টি করে। উভয় কক্ষপথের শক্তি-পার্থক্যটুকুর জন্য যে ফ্রিকোয়েন্সি হবার কথা উজ্জল লাইনটির আলোর ফ্রিকোয়েন্সি তাই হয়। আবার ঠাণ্ডা গ্যাসে সাদা আলো আস্‌লে তার শক্তি গ্যাসের এটমে ইলেকট্রনকে উচ্চতর কক্ষপথে নিয়ে যায় বলে শুরুর ও শেষের দুই কক্ষপথের শক্তির পার্থক্যটুকুর হিসেবে যেই ফ্রিকোয়েন্সি হওয়ার কথা ঠিক সেই ফ্রিকোয়েন্সির আলো সাদা আলো থেকে চলে যায় (শোষিত হয়), কাজেই ওই সাদা আলোর বর্ণালীতে একটি কালো লাইনের সৃষ্টি হয়। এ কারণেই একই রকম এটমের জন্য ওই উজ্জল লাইন আর কালো লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি মিলে যায়।

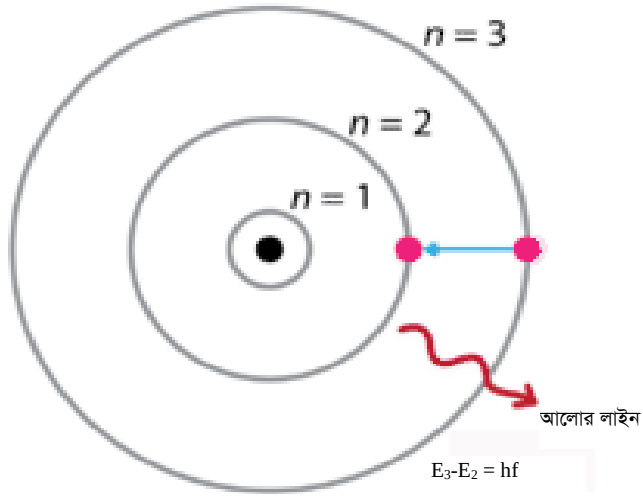

বোরের এটম মডেল: বিভিন্ন কোয়ান্টাম নম্বরের কক্ষপথ। কোয়ান্টাম লাফে আলো সৃষ্টি।

আলো নি:সরণের ক্ষেত্রে উচ্চতর কক্ষপথটিকে যদি i চিহ্ন (শুরু বোঝাতে) এবং নিম্নতরটিকে f চিহ্ন (শেষ বোঝাতে) সূচিত করি তাহলে উভয়ের শক্তি পার্থক্যটিকে নি:সরিত আলোর ফ্রিকোয়েন্সির হিসেবে লিখতে পারি প্ল্যাঙ্কের $E= h f$ এর অনুসরণে। তা হবে:

$$E_i - E_f = h f$$

কাজেই নি:সরিত আলোর ফ্রিকোয়েন্সি এভাবে দুই কক্ষপথের শক্তি অবস্থা থেকেই পাওয়া যাবে। এটি ভেবে বের করার সময় নীল বোর নিশ্চয়ই হাইড্রোজেন গ্যাসের নি:সরণ লাইনগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি আগাম হিসেব করার সেই বামারের ফরমুলার কথা মনে রেখেছিলেন:

$$f = R\ (\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n^2{}_i})$$

যেখানে n_f এবং n_i 1, 2, 3, ইত্যাদি গোটা সংখ্যা ।

কৌণিক ভরবেগ= mvr=nħ এবং E_i-E_f=h f এই কোয়ান্টাম সম্পর্কগুলোর সঙ্গে চিরায়ত বিজ্ঞানের সব নিয়ম প্রয়োগ করে বোর যেই সমীকরণটি পেলেন সেটি হুবহু বামার ফরমুলারই অনুরূপ:

$$f = R\ (\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n^2{}_i})$$

যেখানে n_f এবং n_i 1,2,3 ইত্যাদি গোটা সংখ্যা।

বামার ফরমুলা যেমন হাইড্রোজেন গ্যাসের বর্ণালী লাইনগুলোর ফ্রিকোয়েন্সি আগাম হিসেব করে বলে দিতে পারে, বোরের সমীকরণটিও তা করতে পারে।

কিন্তু উভয়ের মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য রয়েছে। বামার ফরমুলা গণিতের ধাঁধা সমাধানের মত বাস্তব লাইনগুলোর তথ্য জেনে নানা ভাবে করে করে দেখার মাধ্যমে বের করা হয়েছে। R ধ্রুবকটির মানও একই ভাবে বাস্তব লাইনগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে তার থেকেই অনুমান করে করে নির্ণয় করা হয়েছে, বিভিন্ন লাইনের জন্য n_f ও n_i এর মানও সেভাবে। এটি কোন তত্ত্ব বা এটমের কোন মডেল থেকে আসেনি। অন্যদিকে বোরের সমীকরণটি এসেছে বোরের এটম মডেল থেকে এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও চিরায়ত তত্ত্বের একটি মিশ্রণে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তিতে। এই তত্ত্বগুলো ব্যবহার করে বোর ধ্রুবক R এরও পূর্ণ তাত্ত্বিক পরিচয় দিতে পেয়েছেন– ইলেকট্রনের ভর, ইলেকট্রনের চার্জ, h এর মান, এবং বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্ব থেকে নেয়া একটি বিশ্ব-ধ্রুবকের নিরিখে R কে বিজ্ঞানের নানা প্রতিষ্ঠিত তথ্য থেকে তাত্ত্বিকভাবে নির্ণয় করে। এভাবে এগুলোর মানের ভিত্তিতে হিসেব করে পাওয়া R এর মান হুবহু সেই বামারের ফরমুলায় R এর সমানই পাওয়া গেছে। বোরের সমীকরণে n_f এবং n_i শুধু দুটি গোটা সংখ্যাই নয় (বামারের ফরমুলায় যা ছিল), বরং এটমের কোয়ান্টাম নম্বর যা ইলেকট্রনের এক একটি কক্ষপথ সূচিত করে, সেখানে তার কৌণিক ভরবেগ নির্ধারণ করে। ইলেকট্রনের শক্তিও নির্ভর করে এই কোয়ান্টাম নম্বর n এর ব্যস্ত বর্গ $\frac{1}{n^2}$ এর নিরিখে। বামারের ফরমুলায় পাওয়া ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে এবং সত্যিকার বর্ণালী থেকে মাপা লাইনের ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে তাঁর এটম মডেল থেকে তাত্ত্বিক ভাবে

নির্ণিত ফ্রিকোয়েন্সি হুবহু মিলে যাওয়াটি বোরের এটম মডেল ও তাঁর তত্ত্বের একটি বিরাট সাফল্য।

একই ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটমে বিশেষ বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সির আলোর শোষণ ও সাদা আলোর বর্ণালীতে এর ফলে কালো লাইনের সৃষ্টিকেও ব্যাখ্যা করা গেলো। সাদা আলো থেকে এটম শুধু সেই ফ্রিকোয়েন্সি গুলোই শোষণ করার যা অনুমোদিত দুটি কক্ষপথের (n_i এবং n_f সৃষ্টি) শক্তির পার্থক্যের সঙ্গে মিলে যায়। শুধু সেগুলোই নিম্নতর কক্ষপথ থেকে কোয়ান্টাম লাফে উচ্চতর কক্ষপথে যেতে পারবে ও ফলে ওই ফ্রিকোয়েন্সি শোষণ করে নিতে পারবে। অন্য কোন ফ্রিকোয়েন্সির জন্য ওই পার্থক্য সম্পন্ন অনুমোদিত কক্ষপথ থাকেনা বলে সেগুলো শোষিতও হয়না। সেগুলোর জন্য বর্ণালীতে কোন কালো লাইন দেখা যায়না।

এভাবে নীল বোর বর্ণালীর উজ্জ্বল ও কালো লাইনের যে সংকট, এবং এটম মডেলের যে সংকট তার এক রকম সমাধান দিতে পারলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁকে প্ল্যাঙ্ক ও আইনস্টাইনের কোয়ান্টাম তত্ত্বের পথেই হাঁটতে হলো, শুধু চিরায়ত বিজ্ঞানের ওপর ভরসা করা গেলোনা। বোরের এই সমাধানের একটি দুর্বলতা কিন্তু থেকে গেলো। সেটি হলো কোয়ান্টায়নের নীতিটি গ্রহণ করলেও তাঁকে কিন্তু এর বাকি হিসেবগুলো করতে হলো চিরায়ত বিজ্ঞানের নীতিতে– কাজেই ব্যাপারটি এক রকম দোআঁশলা হয়ে গেলো। তবে চিরায়ত ধারণাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে নির্ভেজাল কোয়ান্টাম তত্ত্ব আসার পথে সেটি ছিল একটি বড় পদক্ষেপ। এই অধ্যায়ে আমরা দেখলাম কী ভাবে এক একটি সংকট বিজ্ঞানকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছে।

বস্তু তরঙ্গ

কণিকার তরঙ্গ-রূপ

বস্তু তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ:

আগে আমরা আলোকে কণিকা হিসেবে পাওয়ার আশ্চর্যজনক ঘটনাটি দেখেছি। দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্ট সহ নানা ভাবেই দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত সত্যটি ছিলো আলো একটি তরঙ্গ। অথচ আইনস্টাইন ফটো-ইলেকট্রনের আচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেই আলোকে ফোটন কণিকায় গড়া বলে প্রমাণ করলেন। এ কাজে তিনি প্ল্যাঙ্কের শক্তি-কোয়ান্টামের ধারণাকেই আরো সুস্পষ্টভাবে কণিকার রূপ দিয়েছেন। যেহেতু এক ধরণের এক্সপেরিমেন্টে আলো তরঙ্গের মত আচরণ করে, অন্য ধরণের পরীক্ষায় তা কণিকার মত– তাই আলোর এই তরঙ্গ-কণিকা দ্বৈততা মেনে নিতে হয়েছে। চিরায়ত বিজ্ঞানে কোন জিনিসের কণিকা ও তরঙ্গ এই উভয় রূপ থাকা অসম্ভব হলেও কোয়ান্টাম তত্ত্বে তা মেনে নিতে হলো। বিজ্ঞানীরা সাধারণত প্রকৃতির ঘটনাগুলোর মধ্যে এক রকম প্রতিসাম্য আশা করেন – যেমন কোন ঘটনা যদি বাম দিকে ঘটে, তবে ডান দিকেও একই ভাবে ঘটবে আগেরটির আয়নার প্রতিফলনের মত, এমনটি আশা করেন। সে জন্য আইনষ্টাইন তরঙ্গকে বস্তুকণিকার মতো বলে সাব্যস্ত করার ফলে কোন কোন বিজ্ঞানীর মনে যে চিন্তা ঝিলিক দিয়ে গেলো তা হলো বস্তু কণিকাও তো তরঙ্গের মতো হতে পারে! ফোটন কণিকা যদি তরঙ্গ হতে পারে, তাহলে বস্তু কণিকা তা হবেনা কেন?

১৯২৩ সালে তরুণ ফরাসী বিজ্ঞানী লুই দ্যব্রগলি সেটি শুধু ভাবলেননা তাঁর পিএইচডি থিসিসে তার ওপর রীতিমত একটি তত্ত্ব দিয়ে দিলেন। তিনি ধরে নিলেন যে বস্তু কণিকাকে তরঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা যায়, আর তাই যদি হয় তা হলে সেই তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ কী হবে তাও তিনি হিসেব করে বের করার চেষ্টা করলেন। তাঁর চেষ্টাটি ছিল কণিকার যে সব ধর্ম থাকে– সেই ভর, বেগ, শক্তি ইত্যাদির মধ্য থেকে যেই তরঙ্গ-দৈর্ঘের জন্য একটি সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া। হাতের কাছের কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বকে ব্যবহার করে তিনি সত্যিই এই সম্পর্কটি খুঁজে পেলেন। এই তত্ত্বগুলোর মধ্যে ছিল আইনস্টাইনের বিখ্যাত শক্তি ও ভরের সমতার নিয়ম $E= mc^2$, প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টামের নিয়ম $E= hf$, এবং যে কোন তরঙ্গের বেগের সঙ্গে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ ও ফ্রিকোয়েন্সির সম্পর্ক।

এর মধ্যে প্রথমটি $E= mc^2$ এ E হলো শক্তি, m ভর এবং c আলোর বেগ। এর মাধ্যমে আইনস্টাইন দেখিয়েছিলেন যে শক্তি আর ভর একই জিনিস– ভরের পরিমাণ থেকে শক্তির পরিমাণ এই সমীকরণ দিয়ে হিসেব করে বের করা যায়। এটি তাঁর আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের অংশ।

আমরা আগেই দেখেছি প্ল্যাঙ্ক যখন শক্তিকে ক্ষুদ্র প্যাকেট বা কোয়ান্টামে ভাগ করেছিলেন তাতে শক্তির পরিমাণটি (E) ওই শক্তি তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সির (f) সঙ্গে সম্পর্কিত করেছিলেন $E= hf$, এই সমীকরণে, যেখানে h হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র ধ্রুবক, প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। যে কোন তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ, ফ্রিকোয়েন্সি এবং বেগ– এসবের সম্পর্কটি দেখা যাক। তরঙ্গ-দৈর্ঘের মানে তরঙ্গের এক শীর্ষ বিন্দু থেকে পরের শীর্ষবিন্দুর দূরত্ব, আর ফ্রিকোয়েন্সি মানে হলো এক সেকেণ্ডে কয়টি তরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট স্থান পার হচ্ছে সেই সংখ্যাটি। বেগ মানে এক সেকেণ্ডে তরঙ্গ কতটুকু স্থান এগিয়ে গেল তার দৈর্ঘ– প্রতিটি তরঙ্গের দৈর্ঘকে সেকেন্ডে কয়টি তরঙ্গ গেলো তা দিয়ে গুণ করলেই এই মোট দৈর্ঘ বা বেগ পাওয়া যায়। কাজেই তরঙ্গের বেগ= তরঙ্গ-দৈর্ঘ × ফ্রিকোয়েন্সি।

যে কোন বেগকে আমরা সাধারণত v অক্ষরটি দিয়ে প্রকাশ করি যা ইংরেজি ভেলোসিটি কথাটি আদ্যাক্ষর। আলোর বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য আলোর বেগকে c বলা হয়। তরঙ্গ-দৈর্ঘকে হয়তো ইংরেজি লেংথ শব্দটির আদ্যাক্ষর দিয়ে ℓ বলতে পারতাম, কিন্তু রেওয়াজ হলো একে বরং গ্রীক অক্ষর λ (ল্যাম্বডা) দিয়ে প্রকাশ করা, আমরাও তাই করবো। কাজেই ওপরের সম্পর্কটি দাঁড়ার $v= \lambda f$। আলোর ক্ষেত্রে তা $c = \lambda f$। দ্যব্রগলি ওই তিনটি সমীকরণকে একত্র করে নিচের মত করে অংক দাঁড় করালেন। এটি তিনি আলোর কণিকা ফোটনের জন্যই করলেন।

$E = mc^2 = hf$

কাজেই hf কে লেখা যায় এভাবে: $hf= (mc). c$

এখানে mc ফোটনের ভরবেগ।

ফোটনের জন্য $c = \lambda f$, কাজেই $hf = (mc). \lambda f$

এখান থেকে লেখা যায় $\lambda = \frac{h}{(mc)}$

ওই তিন সমীকরণ থেকে দ্যব্রগলি এভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন যে ফোটনের তরঙ্গ-দৈর্ঘকে প্রকাশ করা যায়:

$$\text{তরঙ্গ-দৈর্ঘ} = \frac{h}{\text{ভরবেগ}}$$

ভরবেগ থাকে কণিকার, তরঙ্গ-দৈর্ঘ থাকে তরঙ্গের। দ্যব্রগলি ওপরের সমীকরণে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। হিসেবটি আলোর কণিকা ফোটনের জন্য করা হলেও দ্যব্রগলি কণিকা মাত্রকেই এর সঙ্গে তুলনীয় বলে ধরে নিয়ে সব কণিকারই তরঙ্গ ধর্ম আছে এবং সেই তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ হিসেবে উপরের এই সম্পর্কটিকেই সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরে নিলেন। আলোর কণিকার জন্য যা প্রযোজ্য বস্তু কণিকার জন্যও তা প্রযোজ্য এমনটি ধরে নেয়া ছিল দ্যব্রগলির একটি সাহসী সিদ্ধান্ত। অধিকাংশ বিজ্ঞানী এভাবে বস্তুকে তরঙ্গ হিসেবে দেখানোটিকে আকাশ-কুসুম কল্পনা মনে করে উড়িয়ে দিলেও দ্যব্রগলি কিন্তু চ্যালেঞ্জ দিয়ে রাখলেন যে ইলেকট্রনের মত একটি বস্তু-কণিকাকে নিয়ে যদি দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের মত এক্সপেরিমেন্ট করা হয়, তা হলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে এটিও একটি তরঙ্গ। এমন বস্তু তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ পাওয়ার জন্য তাঁর যে সমীকরণ তাতে ইলেকট্রনের ভরবেগ আলোর ভরবেগের তুলনায় অনেক বেশি হওয়াতে (ভরের কারণে), এবং h এর মানের তুলনায়ও অনেক বেশি হওয়াতে তরঙ্গ-দৈর্ঘ হবে খুবই ক্ষুদ্র, আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘের চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র। তাই ইলেকট্রনের জন্য দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টে ফাটলগুলো হতে হবে অনেক বেশি সরু, সেগুলোর মাঝখানের দূরত্বকেও হতে হবে সে রকম ক্ষুদ্র। কাজেই এক্সপেরিমেন্টটি আলোর দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের মত এতটা সহজ হবেনা।

বস্তু তরঙ্গের অস্থিত্ব প্রমাণিত হলোঃ

দ্যব্রগলি বস্তু তরঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী করার কয়েক বছরের মধ্যেই এক্সপেরিমেন্টে এ তরঙ্গের অস্থিত্ব খুঁজে পাওয়া গেল। এক্সপেরিমেন্টা মূল নীতির দিক থেকে ওই দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের মতই। তার জন্য সরু ফাটল খুঁজে পাওয়া গেল একেবারে প্রকৃতির মধ্যেই। লবনের দানা বা মিছরির মত বিভিন্ন কঠিন পদার্থের যে কৃস্টাল রয়েছে তার অণুগুলো সারি সারি সুশৃঙ্খল ভাবে থাকে– অণুর গড়া এক একটি তল সম দূরত্বে পর পর রয়েছে অনেকটা এমন ভাবেই। তলগুলোর মাঝখানে ওই অণু-সাইজেরই যে সামান্য ফাঁক আছে তাকেই ফাটল হিসেবে গ্রহণ করা যায়। দৃশ্যমান আলো যে রকম দুই বা ততোধিক ফাটলের ভেতর দিয়ে গিয়ে পর্দায় পরপর আলো-আঁধারের ঝালর সৃষ্টি করে তার তরঙ্গ-ধর্মের কারণে, ক্ষুদ্র ইলেকট্রন কণা কৃষ্টালের নানা তলের ফাঁকের মধ্য দিয়ে গিয়ে ওরকম ঝালর তৈরি করে কিনা দেখা যেতে পারে।

এরকম একটি এক্সপেরিমেন্ট খাড়া করে ফেল্‌লেন আমেরিকার দু'জন বিজ্ঞানী ডেভিসন ও জার্মার। তাঁরা কৃস্টালের ওপর ইলেকট্রন কণার রশ্মি ফেল্‌লেন –

উদ্দেশ্য হলো দ্যব্রগলির সেই আকাশ-কুসুম কল্পনার মধ্যে আদৌ কোন সত্যতা আছে কিনা তা দেখানো। এজন্য নিকেল ধাতুর যে কৃস্টাল তাঁরা বেছে নিলেন তার অণু-তলগুলোর মধ্যে ফাঁকের ('ফাটলের' প্রশস্থতা) পরিমাণ এবং এরকম দুটি ফাঁকের মধ্যে দূরত্ব আগে থেকেই জানা ছিল। বিস্তারিত আয়োজনে এই এক্সপেরিমেন্টটি আলোর দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্ট থেকে কিছুটা ভিন্ন হলেও নীতিগত ভাবে উভয়ে একই, এবং তাই আমরা ইলেকট্রন নিয়ে এই এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা আলোর সেই দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের মত করেই সব সময় দিতে থাকবো।

ইলেকট্রনের উৎস থেকে ইলেকট্রন রশ্মি দুটি ফাটলের মধ্য দিয়ে পার হয়ে ফাটলের অপর দিকে ইলেকট্রনের দুটি পৃথক উৎসের মত কাজ করে। ইলেকট্রন যদি এখানে কণিকার মতই আচরণ করে তাহলে দুই উৎস থেকে দুটি রশ্মি সোজা সামনে যাবে এবং ওখানে একটি একটি ইলেকট্রন-সংবেদী পর্দা খাড়া করলে তাতে আঘাত করে ফাটল বরাবর দুটি আলোকিত অংশ সৃষ্টি করবে উভয়েই ফাটল দুটির সমান্তরাল। এর কারণ ইলেকট্রন যেখানেই সংবেদী-পর্দায় আঘাত করে যেখানেই ছোট্ট একটি আলোর আলোর ফোটা সৃষ্টি হয়। এসব ফোটার সম্মিলিত রূপ হবে ওই আলোকিত অংশ দুটি। কিন্তু ডেভিসন ও জার্মার আসলে ওই সংবেদী পর্দায় যা দেখতে পেলেন তা সেরকম নয়। সেখানে ফুটে উঠলো আলোর দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টে যে রকম ঝালর দেখা যায় সে রকম ঝালর– ফাটলের সমান্তরাল একটি উচ্চতম আলোকিত অংশ, তারপাশে মাঝারি রকমের আলোকিত অংশ, তার পাশে সম্পূর্ণ অন্ধকার অংশ, আবার ওরকমই বার বার। এই আলোকিত অংশ সৃষ্টি হয়েছে ইলেকট্রনের কারণে যেখানে বেশি ইলেকট্রন গিয়ে পড়েছে সেখানেই বেশি আলোর চওড়া রেখাটি, আর যেখানে কম সেখানে মাঝারি আলোর যেখানে ইলেকট্রন মোটেই পৌঁছেনি সেখানে অন্ধকার চওড়া রেখা। এর অর্থ হলো পর্দার এক জায়গায় অনেক ইলেকট্রন গিয়ে পৌছেছে তার ঠিক পাশে কম সংখ্যক ইলেকট্রন পৌঁছেছে, তার পাশে কোন ইলেকট্রনই পৌছেনি, এভাবে পরপর আবার। ইলেকট্রন কণিকার মত আচরণ করলে তো তা এমন ভাবে ঝালর সৃষ্টি করে নানা জায়গায় নানা রকমে গিয়ে পৌঁছতোনা। যা ঘটেছে তা একমাত্র তরঙ্গ হলেই ঘটতে পারে। মানতেই হলো যে ইলেকট্রন রশ্মি এখানে তরঙ্গের মতই কাজ করেছে– ফাটলে এসে দুটি নতুন উৎস হয়ে প্রত্যেকটি থেকে দুটি ইলেকট্রন রশ্মি দুটি তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়েছে, এবং একের ওপর অন্য চড়াও হয়েছে– যাকে বলা হয় উপরিপাতন। এর মধ্যে একের শীর্ষ যেখানে অন্যের শীর্ষের ওপর গিয়ে পড়েছে সেখানে তরঙ্গ

উচ্চতম, যেখানে একটির শীর্ষ অন্যটির থেকে পেছনে সেখানে মাঝারি, যেখানে একটির শীর্ষ অন্যটির তলের সঙ্গে মিশেছে সেখানে কাটাকুটি হয়ে শূন্য। এই সব কিছুই পানির তরঙ্গ বা আলোর তরঙ্গের মত– যা আমরা দেখেছি। একমাত্র ওরকম অবস্থা হলেই পর্দায় ঝালর সৃষ্টি হবে। আর ইলেকট্রন তরঙ্গ হলেই শুধু এমনটি হতে পারে– দুই ফাটলের তরঙ্গের মধ্যে ভাঙ্গাগড়ার ফলে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত একটি কণিকা ইলেকট্রন আবার তরঙ্গ হয় কী ভাবে?

এক ভাবে এটি ব্যাখ্যা করা যেতো যদি এই তরঙ্গকে অসংখ্য ইলেকট্রনের এক যোগে তরঙ্গাকার রূপ নেয়ার কথা ভাবি। সমুদ্রের বা পুকুরের পানির তরঙ্গের পানিও তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির অণুতে গড়া। অণুগুলো কণিকা, ওরা একযোগে পানির তরঙ্গ তৈরি করে বলে কেউ তো বল্‌লো যে অণুগুলোও তরঙ্গ। কিন্তু ইলেকট্রন রশ্মির ক্ষেত্রে এমনটি ভাবা সম্ভব হচ্ছেনা, কারণ এক্সপেরিমেন্ট তাতে সায় দেয়না। ডেভিসন ও জার্মারের এক্সপেরিমেন্টের মত এক্সপেরিমেন্টে মূল ইলেকট্রন রশ্মিকে একেবারে দুর্বল করে তার ফলাফল দেখা হয়েছে। একে এত দুর্বল করা হয়েছে যেন উৎস থেকে একটি একটি করে ইলেকট্রন পর পর ফাটল দু'টা হয়ে পর্দার দিকে গেছে এমনটাই মনে করা যায়। তখনো দেখা গেছে একটি একটি করে আসা সেই ইলেকট্রনের এসে এসে জমাটা এক জায়গায় হয়নি বরং কোথাও বেশি জমে সংবেদী পর্দার উচ্চ আলোর স্থান সৃষ্টি করেছে, তার পাশে মাঝারি আলোর স্থান, তার পাশে অন্ধকার স্থান– হালকা ভাবে হলেও অবিকল সেই আগের ঝালর। বেশ বোঝা যাচেছ যে সেই একটি একটি ইলেকট্রনের কোনটা এই স্থানে গেছে, কোনটা ওই স্থানে– বেশি গেছে উচ্চতম আলোর স্থানে, অন্ধকার স্থানে কোনটাই যায়নি। এতে বোঝা গেল একটি ইলেকট্রনেরই তরঙ্গ-ধর্ম রয়েছে। তবে সেই একটি ইলেকট্রন কণিকা হয়েও কী ভাবে এই তরঙ্গ-ধর্মের পরিচয় দিয়ে দুই ফাটলের মধ্য দিয়েই এক সঙ্গে গেলো, কী ভাবে তা নিজের ওপর নিজেই চড়াও হয়ে তরঙ্গ ভাঙ্গা-গড়ার কাজ করলো এবং কোনটা পর্দার এক স্থানে গেলো, কোনটা পর্দার অন্য স্থানে– সেসব অদ্ভুত আচরণ নিয়ে অদ্ভুত প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর মিল্‌লোনা। এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আরো অনেক এগুতে হয়েছে, যা আমরা পরে দেখবো। আপাতত বোঝা গেল আলোর মত ইলেকট্রনও একই সঙ্গে কণিকা এবং তরঙ্গ – এরও তরঙ্গ-কণিকা দ্বৈততা রয়েছে। এর তরঙ্গকে বস্তু তরঙ্গই বলতে হলো।

দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্ট শুধু তরঙ্গের অস্থিত্ব প্রমাণ করেনা, দুই ফাটলের ফাঁক, ফাটল থেকে পর্দার দূরত্ব, ঝালরের নানা অংশের দূরত্ব ইত্যাদি থেকে তরঙ্গের ভাঙ্গাগড়ার নিয়ম অনুযায়ী এই তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ ও ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় করা

যায়। ইলেকট্রন নিয়ে একই এক্সপেরিমেন্টে এভাবে ইলেকট্রনেরও তরঙ্গ-দৈর্ঘ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। আবার ইলেকট্রনের ভর এবং এখানে তার বেগ থেকে দ্যব্রগলির সমীকরণ $\lambda = \frac{h}{mv}$ ব্যবহার করে এই তরঙ্গ-দৈর্ঘ হিসেবে করেও বের করা হয়েছে। দারুণ ব্যাপার হলো এক্সপেরিমেন্টে মাপা তরঙ্গ-দৈর্ঘ, হিসেব করা তরঙ্গ-দৈর্ঘের সঙ্গে চমৎকার মিলে গেলো। বোঝা গেল অন্তত ইলেকট্রনের ব্যাপারে দ্যব্রগলির সেই 'আকাশ-কুসুম' কল্পনা দারুণ ভাবে সফল। পরে একই ধরণের অন্যান্য এক্সপেরিমেন্টে দেখা গেছে আরো অন্যান্য ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রেও তাঁর তত্ত্ব খুব সফল – ইলেকট্রনের মত এতটা ক্ষুদ্র না হলেও। এই সবগুলোতেই দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টে পর্দায় ঝালর সৃষ্টি হয়েছে। অনেকটা ভিন্ন রকম কণিকা হয়েও আলোর, অর্থাৎ আলোর কণিকা ফোটনের যে তরঙ্গ-ধর্ম আছে তা তো আমরা বহু আগে থেকেই জানি। আলোর দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টেকেও ফোটন কণিকার জন্য এই এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে নেয়া যায় অন্য সব কণিকার মত। অন্যান্য কণিকা যেমন প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি, এমনকি এরকম কণিকার সহযোগে পুরো এটম, কয়েকটি এটমে গড়া অণু এই সবেরও তরঙ্গ ধর্ম এভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এক্সপেরিমেন্টে থেকে এবং হিসেব করে প্রত্যেকটির তরঙ্গ-দৈর্ঘও জানা গেছে। বোঝাই যাচ্ছে বেশি ভরের কারণে এগুলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ ইলেকট্রনের থেকেও আরো ক্ষুদ্র– প্রোটন বা নিউট্রনের মত কণিকায় ইলেকট্রনের থেকে বহুগুণ ছোট, এটম বা অণুর ক্ষেত্রেতো আরো অনেক গুণে ছোট। কিন্তু সবগুলোরই তরঙ্গ-ধর্ম প্রমাণিত।

কিন্তু ধরা যাক্ আমরা ওই জাতীয় ক্ষুদ্র বস্তুর কথা বাদ দিয়ে আমাদের ধরা ছোঁয়ার আকারের বড় জিনিসের কথা চিন্তা করি – যেমন ধরা যাক একটি গোট্টাগাট্টা ক্রিকেট বলের কথা। এখনো কি আমরা তার বস্তু তরঙ্গের প্রমাণ দেখ্তে পাবো? আদৌ কি ক্রিকেট বলও তরঙ্গ? দ্যব্রগলির কথা মতো যদি তার বড় সাইজের সঙ্গে তাল রেখে ক্রিকেট বলের উপযুক্ত করে দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টে করতে পারতাম তা হলে ঝালর দেখে আমাদেরকে বল্তে হতো ক্রিকেট বলও তরঙ্গ। নীতিগত ভাবে তারও তরঙ্গই হওয়ার কথা। তবে অনেক বড় ফাটলের ব্যবস্থা রেখে ওই এক্সপেরিমেন্টের আয়োজন যদিও বা করি 'ক্রিকেট বলের ঝালর' কিন্তু আমরা দেখতে পাবনা। এর কারণ তার তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ এত অসম্ভব রকমের ক্ষুদ্র হবে যে সে তরঙ্গের ভাঙ্গাগড়ার ফলাফলকে আমাদের কোন এক্সপেরিমেন্টে ধরা যাবেনা। এটি কী রকম ক্ষুদ্র তা $\lambda = \frac{h}{mv}$ সমীকরণটিতে অতি ক্ষুদ্র h কে ক্রিকেট বলের অনেক অনেক বড় ভরবেগ দিয়ে

ভাগ করে দেখলেই বোঝা যাবে, ফাস্ট বোলারের হাতেও ভরবেগের মধ্যে বেগটি (v) মামুলি হওয়া সত্ত্বেও। কাজেই তাত্ত্বিক দিক থেকে সব বস্তুরই বস্তু তরঙ্গ থাকলেও কার্যত শুধু ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রেই তার প্রভাবগুলো দেখা যায় কোয়ান্টাম তত্ত্বও এই ক্ষুদ্র জিনিসগুলোর ক্ষেত্রেই সরাসরি কার্যকর হয়।

এটমের ভেতরে বস্তু তরঙ্গ

দ্যব্রগলি বস্তু তরঙ্গ আবিষ্কারের মাধ্যমে সবাইকে চম্‌কে দিয়ে ভাবনার মধ্যে ফেলে যেমন দিয়েছিলেন তেমনি একটি বড় প্রশ্নের সমাধানও করেছিলেন। আমরা দেখেছি নীল বোর তাঁর এটম মডেলে দেখিয়েছেন যে এটমের মধ্যে ইলেকট্রন শুধু কিছু অনুমোদিত স্থায়ী কক্ষপথেই নিউক্লিয়াসের চারিদিকে ঘুরতে পারে। কেন সেগুলোই শুধু অনুমোদিত, অন্যত্র কেন ইলেকট্রন থাকতে পারেনা তার পেছনে কোন যুক্তি তিনি দেখাতে পারেন নি। তাছাড়া ওই কক্ষপথ-গুলোর কোয়ান্টায়নে আমাদের পরিচিত h কে ব্যবহার না করে h এর সঙ্গে সম্পর্কিত ভিন্ন একটি ধ্রুবক $\frac{h}{2\pi}$ (যাকে আমরা ħ বলেছি) কেন ব্যবহার করতে হলো তারও কোন স্বাভাবিক কারণ দেখা যায়নি। এখন দ্যব্রগলি দেখালেন যে ওই স্থায়ী কক্ষপথগুলো স্থায়ী হবার কারণ হলো শুধু ওগুলোতেই ইলেকট্রনের যে বস্তু তরঙ্গ তার গোটা গোটা কয়েকটি তরঙ্গ-দৈর্ঘ হুবহু ফিট্ করে যেতে পারে। অন্যত্র কক্ষপথ কিছুটা বেশি বড় বা কিছুটা বেশি ছোট হওয়ার কারণে তাতে গোটা কয়েকটি তরঙ্গ-দৈর্ঘের পর আরো কিছু ভগ্নাংশ তরঙ্গ-দৈর্ঘের মত দৈর্ঘ থেকে যাবে। কাজেই ওই কক্ষপথগুলো অনুমোদিত হবেনা। $\frac{h}{2\pi}$ ধ্রুবকটিও এর থেকে স্বাভাবিক ভাবে আসছে কারণ যে কয়টি তরঙ্গ-দৈর্ঘ ওই স্থায়ী কক্ষপথের দৈর্ঘের মধ্যে হুবহু ফিট্ করবে তার সংখ্যাটির সঙ্গে $\frac{h}{2\pi}$ গুণ করলেই কক্ষপথের পারিধির (দৈর্ঘের) সমান হয়।

ব্যাপারটি বুঝতে হলে আমাদেরকে দুই রকমের তরঙ্গকে আলাদা ভাবে চিন্‌তে হবে– চলন্ত তরঙ্গ এবং স্থির তরঙ্গ। তরঙ্গ যখন বাধাহীন ভাবে সামনের দিকে যেতে পারে তখন তাকে চলন্ত তরঙ্গ বলা হয়, বেশির ভাগ তরঙ্গকে আমরা এভাবেই দেখি– পুকুরের পানির তরঙ্গ, শব্দের তরঙ্গ, আলোর তরঙ্গ যখন এগোতে থাকে তখন সবই চলন্ত তরঙ্গ। তবে কোন তরঙ্গের দুই প্রান্ত যদি আটকে দেবার ব্যবস্থা করা হয় তখন শেষ প্রান্তে পৌঁছার পর ওখান থেকে প্রতিফলিত হয়ে তা উল্‌টো ফিরে আসে এবং আগেরটির ওপর চড়াও হয়ে স্থির

তরঙ্গ সৃষ্টি করে। তখন দুই প্রান্তের মাঝখানের জায়গাটিতে গোটা গোটা কয়েকটি পূর্ণ তরঙ্গ স্থির হয়ে থাকে– মূল তরঙ্গের তরঙ্গ-দৈর্ঘ ও প্রান্ত দুটির মধ্যে ব্যবধানের দৈর্ঘের ওপর নির্ভর করে তাদের সংখ্যা 1,2,3, ইত্যাদি সম্পূর্ণ সংখ্যাই শুধু হতে পারে, কিন্তু কোন ভগ্নাংশ হতে পারেনা। একটি তারকে টানটান করে দুই প্রান্তে আট্‌কে দিলে একে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপিয়ে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘের তরঙ্গ তাতে তুল্‌লে এরকম স্থির তরঙ্গ তাতে দেখা যায়; যে কোন তরঙ্গেই এমনি হয়। একটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ λ এর জন্য দুই প্রান্তের ব্যবধানের দৈর্ঘ হবে দুই প্রান্তের মাঝখানে দৈর্ঘ=$n\lambda$ যেখানে $n = 1,2,3$ ইত্যাদি। এটমের মধ্যে ইলেকট্রনের একটি কক্ষপথের দৈর্ঘকে (পরিধিকে) এই দুই প্রান্তের মাঝখানের দৈর্ঘ মনে করলে ওতে স্থির তরঙ্গের দুই প্রান্ত একই বিন্দুতে মিলে যাবে। কোন বৃত্তের ব্যাসার্দ্ধ r হলে তার পরিধি অর্থাৎ পূর্ণ বেড়ের দৈর্ঘটি $2\pi r$ হয়, একথা আমরা স্কুলের জ্যামিতি থেকে জানি। কাজেই এটমে ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ r হলে, তার ইলেকট্রনের দ্যব্রগলি নির্ণিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ λ হলে

$$2\pi r = n\lambda$$

কিন্তু দ্যব্রগলির সমীকরণ অনুযায়ী $\lambda=\frac{h}{mv}$। কাজেই ওপরের সম্পর্কটিকে এভাবে লেখা যায় $2\pi r = n\frac{h}{mv}$। যেখান থেকে $mvr = n\frac{h}{2\pi}$ mvr কিন্তু কোন জিনিসের কৌনিক ভরবেগেরই প্রকাশ। কাজেই এটমের মধ্যে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে স্থায়ী একটি কক্ষপথে ঘোরার সময় এর কৌণিক ভরবেগ হবে কৌণিক ভরবেগ= $n\frac{h}{2\pi}$ যেখানে $n= 1,2,3$ ইত্যাদি। নীল বোর তাঁর এটম মডেলে এটি আগেই দেখিয়েছেন, কৌণিক ভরবেগের কোয়ান্টায়ন হিসেবে। কিন্তু তখন একে তিনি শুধু ধরে নিয়েছিলেন মাত্র। এখন দ্যব্রগলির বস্তু তরঙ্গের আবিষ্কার ও এর সমীকরণ থেকে এটি স্বাভাবিক ভাবেই পাওয়া গেল, নেহাৎ ধরে নিতে হলোনা। নীল বোরের কৌণিক ভরবেগের কোয়ান্টায়নে $\frac{h}{2\pi}$ কেন ব্যবহার করতে হয়েছিলো সেটিও স্বাভাবিক ভাবেই এলো। দ্যব্রগলি বস্তু তরঙ্গের আলোকে বোরের ইলেকট্রন কক্ষপথগুলোকে এখন আরো বেশি স্বাভাবিক মনে হলো যেখানে ইলেকট্রন তরঙ্গ স্থির তরঙ্গের আকারে থাকে। আমরা $\frac{h}{2\pi}$ কে সংক্ষেপে $\hbar$ বলেছি সে কথাটিও মনে রাখতে হবে।

এটম মডেলে আরো সংযোগ

আমরা দেখেছি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের দশক গুলোতে এটম মডেল বা এটমের গঠনকে বার বার নতুন ভাবে খাড়া করতে হয়েছে, তার আচরণগুলো আবিষ্কারের পরিপ্রেক্ষিতে। এর মধ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমন্বয় ঘটিয়ে নীল বোর একটি গ্রহণযোগ্য এটম মডেলের সূত্রপাত করেছিলেন– যার মূল কথা ছিল এটমের মধ্যে অনুমোদিত কিছু স্থায়ী কক্ষপথেই ইলেকট্রন থাকতে পারে। সেই এটম মডেলটির বড় সাফল্য ছিল এর থেকে এটমের আচরণের ভিত্তিতেই এর থেকে নি:সরিত আলোর উজ্জ্বল বর্ণালী-লাইনগুলো হিসেব করে নির্ণয় করা গেছে এবং এর দ্বারা শোষিত আলোর কারণে কালো বর্ণালী লাইনগুলোকেও একই ভাবে। কিন্তু শিগ্‌গির আরো সূক্ষ্ম পরিমাপে একই মূল লাইনের সঙ্গে আরো কিছু পার্শ্ব লাইন খুঁজে পাওয়া গেল নানা মৌলের বর্ণালীতে। বোরের মূল এটম মডেলে এদের ব্যাখ্যা করা যায়না।

অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী সমারফিল্ড এর একটি ব্যাখ্যা দিলেন এটম মডেলে ইলেকট্রনের কক্ষপথগুলোকে শুধু বৃত্তাকার না ভেবে উপবৃত্তাকার ধরে নেবার মাধ্যমে। আসলে বোরের কোয়ান্টাম নম্বর n কে একই রেখে তাতে কয়েকটি বিভিন্ন আকৃতির উপবৃত্তাকার কক্ষপথ 'অনুমোদিত' ভাবে থাকতে পারে। এভাবে সেই ক'টি ভিন্ন আকৃতির উপবৃত্ত অনুমোদিত হবে যেগুলোরও কোয়ান্টায়ন ঘটবে k নামক একটি নতুন কোয়ান্টাম নম্বরের দ্বারা। বোরের মূল কোয়ান্টাম নম্বর n কে বলা বলো প্রধান কোয়ান্টাম নম্বর এবং এই k কে বলা হলো উপ-কোয়ান্টাম নম্বর। $k\hbar$ সেই উপবৃত্তগুলোর আকৃতি সূচিত করে, যেভাবে $n\hbar$ কক্ষপথগুলোর কৌণিকভরবেগ এবং সেই সুবাদে নিউক্লিয়াস থেকে কক্ষপথগুলোর দূরত্বকে ঠিক করে দেয়। k এর এক একটি পূর্ণ সংখ্যা মান দিয়ে সূচিত একটি উপবৃত্তাকার কক্ষপথ থেকে নিম্ন কক্ষপথে স্থানান্তরের যে ফ্রিকোয়েন্সি তার সঙ্গে অন্য একটি পূর্ণ সংখ্যা মানের উপবৃত্তাকার কক্ষপথের থেকে নিম্ন কক্ষপথে ইলেকট্রন স্থানান্তরের ফ্রিকোয়েন্সির যেটুকু পার্থক্য থাকে তার ফলেই কিছুটা ভিন্ন ফ্রিকেয়েন্সির পার্শ্ব লাইনগুলো সৃষ্টি হয়।

আরো পরে দেখা গেলো কোন মৌলের গ্যাসকে জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে ওই সূক্ষ্ম লাইনগুলোও আবার তার থেকে খুব সামান্য বেশি ফ্রিকোয়েন্সি ও খুব সামান্য কম ফ্রিকোয়েন্সির দুটি আরো সূক্ষ্মতর লাইন সৃষ্টি করে। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সমারফিল্ড বল্‌লেন ওই সমতল উপবৃত্তাকার কক্ষপথগুলো ডান-বাম, সামনে-পেছন, ওপর-নিচ এই তিন মাত্রার স্থানের মধ্যে কোন দিকে অভিমুখ

করে আছে তার ওপরেই ওগুলো নির্ভর করে। অর্থাৎ কক্ষপথের সমতলের ওপর একটি লম্ব আঁকলে সেটি প্রযুক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে কত কোণ করে থাকে তার নিরিখে। এই দিকগুলোরও কোয়ান্টায়ন হয় এবং সেটি হয় m নামক আরেকটি কোয়ান্টাম নম্বরের মাধ্যম। একে বলা হলো ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর। $m\hbar$ এর বিশেষ বিশেষ মানগুলোই ঠিক করে দেয় উপবৃত্তাকার কক্ষপথগুলো কোন্ অভিমুখে থাকবে। এদের মধ্যে যেই সামান্য শক্তি-পার্থক্য থাকে তাই ঠিক করে দেয় ওই নতুন আবিষ্কৃত বর্ণালী লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি। এভাবে বোরের এটম মডেল এখন প্রধান কোয়ান্টাম নম্বর n ছাড়াও k এবং m এই দুটি নতুন কোয়ান্টাম নম্বর এনে বোর-সমারফিল্ড মডেলে পরিণত হলো।

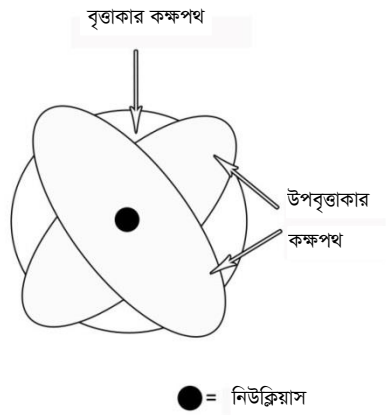

বোর-সমারফিল্ড এটম মডেল

কিন্তু আরো পরে ১৯২৪-২৫ সালে দেখা গেলো আরো জোরালো চৌম্বক ক্ষেত্রে মৌলের গ্যাসকে রাখলে আরো কিছু অতিরিক্ত বর্ণালী লাইন দেখা যায়। ১৯২৫ সালে ভোল্‌ফগ্যাং পাউলি আবিষ্কার করেছিলেন যে ইলেকট্রনের একটি ক্ষুদ্র চৌম্বক ক্ষেত্র আছে যার উৎপত্তি ইলেকট্রনের নিজের অক্ষের ওপর লাটিমের মত ঘোরার একটি ঘূর্ণন গতির মধ্যে। যে কোন বৈদ্যুতিক চার্জের এরকম ঘূর্ণন গতি তাতে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। ইলেকট্রন নিজের অক্ষের ওপর এভাবে ঘুরছে এবং তা ঘড়ির কাঁটার দিকে অথবা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে এই দুভাবে ঘুরতে পারে– এরকম কথা ওই ব্যাপারটির একটি চিরায়ত বৈজ্ঞানিক বর্ণনা। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অবশ্য একে সত্যি সত্যি এভাবে ঘুরছে বলে মনে করেনা– বরং মনে করে যে ইলেকট্রনের আর একটি কোয়ান্টায়িত গতি আছে যাকে স্পিন (ঘূর্ণন) বলা হয় এবং যাও কোয়ান্টায়িত হয়ে একটি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক এই

দুটি অবস্থা নিতে পারে। এক্ষেত্রে কোয়ান্টাম নম্বরটিকে বলা হলো m_s স্পিন ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বর সেই হিসাবে এই স্পিনের কারণে যেই দুটি অবস্থা সৃষ্টি হবে তাকে $m_s\hbar$ এর মানই তা ঠিক করে দেয়। অন্যান্য বিবেচনা থেকে গেছে বাকি সব কোয়ান্টাম নম্বর সম্পূর্ণ সংখ্যা হলেও এই স্পিন ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নম্বরটির $+\frac{1}{2}$ এবং $-\frac{1}{2}$ এই দুই মানই শুধু নিতে পারে। এদিক থেকে এটি ব্যতিক্রমী।

বোর-সমারফিল্ড মডেলের সঙ্গে এই নতুন কোয়ান্টাম নম্বর যোগ করে পাউলি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই নীতি অনুযায়ী n, k এবং m কোয়ান্টাম নম্বর দিয়ে নির্ধারিত এটমের বিভিন্ন কক্ষপথের প্রত্যেকটিতে শুধু একটি $+\frac{1}{2}\hbar$ এবং $-\frac{1}{2}\hbar$ স্পিন যুক্ত দুটি ইলেকট্রন থাকতে পারে– এর বেশি নয়, এর অতিরিক্ত ইলেকট্রন সেখানে আসার চেষ্টা করলে সেটি বর্জিত হবে। একে পাউলির বর্জন নীতি বলা হলো। এই বর্জন নীতি এটমের ইলেকট্রনগুলোর মধ্যে একটি বিন্যাস এনে দিলো। যে কোন বদ্ধ সিস্টেমের মত এটমও সব চেয়ে নিম্নতম শক্তিতে থাকতে চায়। তাই ইলেকট্রনগুলো সবগুলো নিম্নতম শক্তি অবস্থায় থাকবে এটি আশা করা যায়– অর্থাৎ সর্বনিম্ন শক্তির কক্ষপথে। কিন্তু কোন এটমে যদি দুইয়ের অধিক ইলেকট্রন থাকে সেগুলো বর্জন নীতি অনুযায়ী ওই নিম্নতম শক্তি কক্ষ পথে সব ক'টি থাকতে পারবেনা, দুইয়ের অতিরিক্তগুলোকে উচ্চতর কক্ষপথে যেতে হবে, এবং সেখানেও একই n, k, m ধারী কক্ষপথে দুটির বেশি থাকতে পারবেনা। এভাবে বোর-সমারফিল্ড এটম মডেলে ইলেকট্রনগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে নানা কক্ষপথে থরে থরে সাজানো থাকার ব্যবস্থা হলো। এই বিন্যাস শুধু বর্ণালী লাইনের নিখুঁত ফ্রিকোয়েন্সি হিসেব করে দিতে সাহায্য করলোনা, বিজ্ঞানের আরো নানা কাজে লাগলো।

উদাহরণস্বরূপ নীল বোর তাঁর এটম মডেলটির ওপর কাজ শুরুই করেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান কেমিস্ট মেন্ডেলীভের দেয়া কেমিস্ট্রির বহুল পরিচিত পর্যায় সারণীর ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টায়। মেন্ডেলীভ সব চেয়ে হালকা থেকে সব চেয়ে ভারী মৌলকে সাজাতে গিয়ে দেখলেন তিনি যদি ভরের দিক থেকে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মৌল পর্যন্ত বাম থেকে ডানে এগিয়ে পরেরটি আবার প্রথম মৌলটির নিচে নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে আবার এগিয়ে যান; ওই নির্দিষ্ট সংখ্যায় এগিয়ে আবার ফিরে আসেন এবং পর্যায়ক্রমে তা করতেই থাকেন তাহলে একটি মজার জিনিস লক্ষ্য করা যায়। একের নিচে অন্য মৌলের যে

গ্রুপগুলো এর ফলে সৃষ্টি হয় তার প্রত্যেকটির রাসায়নিক গুণ একই রকম হয়। পাউলির বর্জন নীতির ফলে ইলেকট্রনের যে বিন্যাস তা এই ব্যাপারটিকে সুন্দর ব্যাখ্যা করতে পারলো। এতে নিউক্লিয়াস থেকে সবচেয়ে দূরের অর্থাৎ সব চেয়ে বহিস্থ এবং সব চেয়ে বড় n এর মানের কক্ষপথগুলোতে যে ক'টি ইলেকটন বর্জন নীতি অনুযায়ী থাকতে পারে তা না থাকলে ওটি শক্তি মাত্রার দিক থেকে অসম্পূর্ণ থাকে। এভাবে বহিস্থ কক্ষপথ সম্পূর্ণ থাকা বা না থাকার ওপরেই, এবং কতখানি অসম্পূর্ণ তার ওপরেই এটমের রাসায়নিক গুণ নির্ভর করে। পর্যায় সারণীর পর্যায়গুলোও এই ইলেকট্রন সংখ্যা দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে– তাতে একই গ্রুপের এটমগুলো হয় সবারই বহিস্থ কক্ষপথগুলো সম্পূর্ণ অথবা একই ভাবে অসম্পূর্ণ। এজন্যই তাদের রাসায়নিক গুণগুলো সবারই একই রকম। একই বিন্যাস এটমের সঙ্গে অন্য এটমের রাসায়নিক বন্ধন সৃষ্টির ব্যাপারটিও ব্যাখ্যা করতে পারে। কোন এটমের বহিস্থ কক্ষপথ অসম্পূর্ণ থাকলে সেই এটমটি অন্য এটমের বহিস্থ কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন নিয়ে অথবা তার সঙ্গে ভাগাভাগি করে কক্ষপথকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করে। আর যদি বহিস্থ কক্ষপথে থেকে অতিরিক্ত ইলেকট্রন দান করে ওই কক্ষপথ খালি করে ফেলতে পারি তা হলে সেই উল্‌টো কাজটিই করে। এসব করতে গিয়েই রাসায়নিক বন্ধনের সৃষ্টি হয়।

এভাবেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের সহায়তা নিয়ে যে বোর-সমারফিল্ড এটম মডেল দাঁড়িয়েছিলো তার বাস্তব সাফল্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব শুরুতে এভাবেই দেখা দিয়েছে এবং একে তাই প্রাথমিক কোয়ান্টাম তত্ত্ব বলা হয়। কিন্তু এই এটম মডেলটি চিরায়ত ও কোয়ান্টাম তত্ত্বকে যেখানে যেভাবে দরকার মিশিয়ে ব্যবহারেরই ফল। যেমন বোর ও সমারফিল্ড অনুমোদিত কক্ষপথগুলো নেহাৎ বাস্তবের সঙ্গে মেলাতে ধরে নিয়েছেন ও দ্যব্রগলি তাকে ইলেকট্রনের স্থির তরঙ্গের সঙ্গে মিলিয়েছেন, যাতে সে তরঙ্গ কক্ষপথের সঙ্গে পূর্ণ ফিট্ করে যায় এতে কোয়ান্টাম ও চিরায়ত উভয় ধরনের বিজ্ঞানই রয়েছে।

প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অনন্যতা এতে কম রক্ষিত হয়েছে। বরং বলা হয়েছে যে চিরায়ত তত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব উভয়কে একে অপরের সম্পূরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তা ছাড়া মাঝখানের অননুমোদিত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে না গিয়ে এক কক্ষপথ থেকে ইলেকট্রন অন্য কক্ষপথে কী ভাবে লাফ দিয়ে যেতে পারে সেই রহস্যটিও এতে থেকে যায়। এ যেন একটি জিনিসকে এ মুহূর্তে এই কক্ষপথে দেখলাম পরমুহূর্তে অন্য কক্ষপথে – কী ভাবে সেখানে গেল তার হদিশ

নেই, সেটি ম্যাজিকের মত হয়ে রইলো। এই মডেলে আলো নিঃসরণের জন্য এরকম 'কোয়ান্টাম লাফ' প্রয়োজন। কিন্তু সেই কোয়ান্টাম লাফটি ঠিক কখন ঘট্‌বে এবং নিঃসরিত আলোর ফোটনটি কোন্ দিকে যাবে তার ভবিষ্যদ্বাণী করার কোন তত্ত্ব এর মধ্যে নেই– পুরো জিনিসটিই রইলো দৈবাৎ ব্যাপারের মত হয়ে। অনেক প্রশ্নের উত্তর সেখানে মেলেনা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে এটম মডেল সহ সবকিছুকে নিখাদ একটি সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যে আনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। এরকম একটি তত্ত্বের দিকে যাত্রা শুরুর সুযোগ করে দিয়েছিলো দ্যব্রগলির বস্তু তরঙ্গের আবিষ্কার। এখন আমরা সেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি দেখবো যাকে চিরায়ত গতিবিদ্যার বিপরীতে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যাও (কোয়ান্টাম মেকানিক্স) বলা হয়ে থাকে।

বস্তু তরঙ্গেই অবস্থার খবর

এ তরঙ্গের সঙ্গে কণিকাটির সম্পর্ক

পাইলট তরঙ্গঃ

দ্যব্রগলি বস্তু কণিকা ইলেকট্রনকে যেভাবে তরঙ্গ রূপে দেখালেন সেটি কিসের তরঙ্গ? পুকুরের তরঙ্গে পানি ওঠানামা করে, দড়ির তরঙ্গে দড়ি ওঠানামা করে (অথবা ডানে বামে আন্দোলিত হয়), এমন কি বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র আর চৌম্বক ক্ষেত্র ওঠানামা করে; বস্তু তরঙ্গে কী ওঠানামা করে? দ্যব্রগলি যা বুঝলেন তা হলো এই ক্ষেত্রে অন্য তরঙ্গগুলোর মত সত্যি সত্যি কোন জিনিস ওঠানামা করছেনা; তাছাড়া ইলেকট্রনটিই যে কোন ভাবে গুড়ো গুড়ো হয়ে ছড়িয়ে তরঙ্গের মত ওঠানামা করছে তাতো মোটেই নয়। তাহলে কিসের ওঠানামা এমন প্রশ্নের সহজ কোন উত্তর নেই। অথচ এটি ঠিক যে এটি অন্য তরঙ্গগুলোর মতই দুই-ফাটলে গিয়ে বিভক্ত হচ্ছে, দুই ভাগের একটি অন্যটির ওপর পড়ে ভাঙ্গাগড়া করছে; এসব না করলে পর্দায় ঝালর সৃষ্টি হচ্ছে কীভাবে? ইলেকট্রন নিজেই নিজের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির এক রকমের কম্পন-গুণ আভ্যন্তরীন ভাবে ধারণ করছে তার তরঙ্গটিই ওই ইলেকট্রন-তরঙ্গ– এমন কথা দ্যব্রগলির কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। আইনস্টাইন অবশ্য ওভাবে ফোটনের ভেতরেই আলোর নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির কম্পন-গুণ আরোপ করেছিলেন ফটো ইলেকট্রনের ব্যাখ্যায়, যেটি আমরা দেখেছি। ফোটনের তরঙ্গ-আচরণে যেটি সম্ভব ইলেকট্রনের তরঙ্গ-আচরণে সেটি সম্ভব হবেনা কেন? অথচ ইলেকট্রনের তরঙ্গ-আচরণটি দ্যব্রগলি নিজেই দেখিয়ে দিয়েছেন। এই উভয় সংকটে পড়ে দ্যব্রগলি বল্লেন ইলেকট্রনের আভ্যন্তরীন কম্পন-গুণ থাকতে পারে, তবে তিনি যেই তরঙ্গের কথা বল্ছেন সেটি ওই কম্পন তরঙ্গ নয় এটি বরং ইলেকট্রনের একটি চালিকা-তরঙ্গ, বাইরে থেকে তার 'পাইলট' হিসেবে কাজ করছে; অবশ্য ওই আভ্যন্তরীন কাঁপুনির সঙ্গে একই তালে তালে থেকে এই তরঙ্গ চল্ছে; একে বলা হলো ইলেকট্রনের পাইলট তরঙ্গ।

দ্যব্রগলি এই যে পাইলট তরঙ্গের কল্পনা করলেন দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টে এর ভূমিকার কথা বিবেচনা করলে ধারণাটি বেশ যুৎসই মনে হবে। মনে করা যায় কণিকা হিসেবে ইলেকট্রন একই সঙ্গে দুই ফাটলের মধ্য দিয়ে যেতে না পারলেও তার পাইলট তরঙ্গ সেটি ঠিকই পারে। এই তরঙ্গই দুই ফাটলের অপর

পারে গিয়ে দুটি নতুন তরঙ্গের মতো হয়ে পরস্পরের উপরিপাতিত হয় এবং ভাঙ্গাগড়া করে। পর্দার ঝালরটি তাই ইলেকট্রন নিজের গতিবিধির ওপর নির্ভর করছেনা বরং পাইলট তরঙ্গ দুটার উপরিপাতনে ভাঙ্গাগড়ার দ্বারাই সৃষ্টি হচ্ছে। ইলেকট্রন নিজের মত নিজে রইলো। তাহলে কি ইলেকট্রন যেমন সত্য, তার পাইলট তরঙ্গও তেমনই সত্য। তরঙ্গটিকে ইলেকট্রনের আভ্যন্তরীন মনে না করে তার বাইরে পাইলট তরঙ্গ মনে করায় যে সুবিধাটি পাওয়া গেলো তা হলো কণিকা ইলেকট্রন কণিকা-রূপে তার অস্থিত্ব সব সময় বজায় রাখতে পারলো – দুই ফাটলের মধ্য দিয়ে এক সঙ্গে যাওয়া, ভাঙ্গাগড়া করা ইত্যাদি তরঙ্গ-রূপী কাজগুলো নিজের পাইলট তরঙ্গের হাতে ছেড়ে দিয়ে। অবশ্য দ্যব্রগলির এই চিন্তা পরবর্তী কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা হুবহু অনুসরণ করেননি।

এটমের মধ্যে থাকা কালে ইলেকট্রনের ওই পাইলট তরঙ্গ যে দ্যব্রগলির কাছে স্থির তরঙ্গ সেটি আমরা আগেই দেখেছি। এটমের কেন্দ্রে যে ধনাত্মক নিউক্লিয়াস রয়েছে তার বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রই এটমের মধ্যে ইলেকট্রন তরঙ্গকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে বাখে– যেন তার দুই প্রান্ত আটকানো আছে। এ কারণেই ওখানে স্থির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এরকম অন্য যে কোন পরিস্থিতিতে ইলেকট্রন যদি গণ্ডির মধ্যে থাকে তা হলে সেখানেও তার স্থির তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। চলন্ত তরঙ্গের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির একাধিক তরঙ্গ পরস্পরের ওপর চড়াও হয়ে সামগ্রিক তরঙ্গটিকে এমন রূপ দিতে পারে যে তাতে এক একটি জায়গায় তরঙ্গের উচ্চতা ফুলে ওঠে আবার ফোলা উচ্চতম জায়গার দুপাশে ক্রমে কমে মিইয়ে যায়। ফোলা জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় তা প্রায় শূন্য থাকে। এই ফোলা জায়গাকে তরঙ্গের এক একটি প্যাকেট বলা যায়– অথবা একটি পাল্‌স বা স্পন্দন। এই প্রক্রিয়ায় তরঙ্গের প্যাকেটটি নিজেও ভিন্ন বেগে ধীরে এগোতে পারে যাকে বলা যায় গুচ্ছ বেগ যা তরঙ্গের নিজের বেগের থেকে আলাদা। দ্যব্রগলি ধরে নিলেন ইলেকট্রনের তরঙ্গের মধ্যে এই তরঙ্গ প্যাকেটটিই ইলেকট্রনকে সূচিত করছে, আর তার গুচ্ছ বেগ ইলেকট্রনেরই বেগ। ইলেকট্রনের বস্তু তরঙ্গের সঙ্গে ইলেকট্রনের সম্পর্ক কী, তরঙ্গটি কিসের তরঙ্গ, এসব প্রশ্নের উত্তরে দ্যব্রগলির উত্তরটা ছিল এরকমই।

তরঙ্গই সবকিছুঃ

কিন্তু সমসাময়িক অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী শ্রোয়েডিঙ্গার ওই একই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ব্যাপারটিকে এত সহজে ছাড়লেননা। তিনি দ্যব্রগলির তরঙ্গ প্যাকেটের ধারণাটি নিলেন বটে কিন্তু একে আরো অনেকদূর বিস্তৃত করলেন। দ্যব্রগলি

তরঙ্গ-প্যাকেটটি ইলকট্রনের শুধু প্রতিনিধিত্ব করছে বলে মনে করলেও শ্রেয়েডিঙ্গার বল্‌লেন এই তরঙ্গ-প্যাকেটটিই ইলেকট্রন। ইলেকট্রনের জন্য কণিকা বলে অন্য কিছুর থাকার কোন প্রয়োজনীয়তাই তিনি অনুভব করলেননা, অন্য কোন কণিকার জন্যও নয়। তরঙ্গ প্যাকেটের মধ্যে তরঙ্গের উচ্চতার ওই যে ওঠানামা, তার মধ্যে অনেক অর্থ আরোপ করলেন তিনি। তিনি বল্‌লেন ওই উচ্চতাই আসলে কণিকাটির 'অবস্থার' সব তথ্য ধারণ করছে। একটি সিস্টেমের অবস্থা বলতে বোঝায় ওর মধ্যে থাকা নানা কণিকার অবস্থান, ভরবেগ এবং সিস্টেমের উত্তাপ, শক্তি ইত্যাদির প্রকাশকে। শ্রোয়েডিঙ্গারের মতে এই অবস্থাকে জানার জন্য আমাদের উচিত হবে সিস্টেমটির সেই সামগ্রিক তরঙ্গ প্যাকেটের তরঙ্গ-উচ্চতায় ওঠানামাগুলো জানা।

আমরা যদি চিরায়ত বিজ্ঞানের পরিচিত তরঙ্গগুলোর কথাও বলি তরঙ্গের উচ্চতা সেখানেও অনেক জরুরি কথা বলে দেয়– যেমন সমুদ্রে পানির তরঙ্গে শক্তি, কিংবা বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গে বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা ইত্যাদি। এসব গুণের পরিবর্তন বা পরিবর্তন হার আমরা জানতে পারি স্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গ-উচ্চতা কী ভাবে তাতে পরিবর্তিত হয় কিংবা সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গেই বা ওই উচ্চতা কী ভাবে পরিবর্তিত হয় তা দেখে। তরঙ্গ–উচ্চতার গাণিতিক প্রকাশের মধ্যে স্থান বা সময়ের সঙ্গে ওই তরঙ্গ-উচ্চতার সম্পর্কটি স্পষ্ট করা হয়, যেখান থেকে স্থানে বা সময়ে তার পরিবর্তন নির্ণয় করা যায়। ওই গাণিতিক প্রকাশটিকে বলা হয় তরঙ্গ-ফাংশান।

ফাংশান (অপেক্ষক) জিনিসটি গণিতের বিষয়। যেমন b রাশিটি যদি কোন গাণিতিক ভাবে a রাশিটির ওপর নির্ভর করে তা হলে বলা হবে b রাশি a রাশির একটি ফাংশান; অর্থাৎ a এর মান বদলালে b এর মানও সেই ভাবে বদলাবে যেন a রাশিটি b রাশির অপেক্ষায় থাকে। এ নির্ভরতা যে কোন রকম হতে পারে– যেমন খুব সরল কিছু নির্ভরতা হতে পারে $b = a^2$, অথবা $b = a+3$ ইত্যাদি যে কোন কিছু। b যে a এর একটি ফাংশান তা বোঝার জন্য b কে b (a) এভাবে লেখা যায়– যাতে বোঝানো হয় যে b রাশিটি ব্র্যাকটের ভেতর যা আছে সেই রাশিটির ওপর কোন একটি বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, যেমন হতে পারে $b(a) = a^2$। গ্রাফের ওপর বাম থেকে ডানে যাবার দিকটায় a কে দেখিয়ে a এর বিভিন্ন মানের জন্য নিচ থেকে ওপরের দিকটায় এক একটি b কে বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করে সব বিন্দু যোগ করলে ফাংশানটির একটি লেখচিত্র পেয়ে যাব। b যদি একাধিক অন্য রাশির ওপর নির্ভর করে, যেমন a ও c উপরের

ওপর নির্ভর করে তাহলে তাকে লিখতে হবে b(a,c) এভাবে, যেমন হতে পারে $b(a,c) = a^2+4c$। সম্পর্কগুলো এত সহজ না হয়ে a ও c এর জটিলতর গাণিতিক প্রকাশ হতে পারে- উচ্চতর এ্যালজেব্রার বা ত্রিকোণমিতির বা এমনি কিছুর। সবক্ষেত্রেই b তাদের ওপর নির্ভর করবে।

তরঙ্গ ফাংশানে আমরা সাধারণত তরঙ্গ-উচ্চতাকে স্থানের নানা স্থানাঙ্কের (স্থানের নানা বিন্দুর সূচক) ফাংশান হিসেবে দেখতে পারি। সেক্ষেত্রে স্থানের নানা বিন্দুতে গেলে তরঙ্গ-ফাংশানের (অর্থাৎ তরঙ্গ উচ্চতার) কী হয় তা দেখা যাবে। এক ধরনের বিবেচনায় সেই স্থানাঙ্কগুলো হতে পারে x, y, এবং z। স্থানের বাম-ডান, সামনে-পেছনে, উঁচু-নিচু এই তিনমাত্রার জন্য তিনটি – বাম থেকে ডানের বিন্দুতে গেলে x বাড়ে, পেছন থেকে সামনের বিন্দুতে গেলে y বাড়ে, আর নিচু থেকে উঁচুর বিন্দুতে গেলে z বাড়ে। তরঙ্গ-ফাংশানকে আবার সময়ের ফাংশান হিসেবেও দেখা যায়– সেক্ষেত্রে t দ্বারা সূচিত সময় যত বাড়ে তখন তরঙ্গ-ফাংশানের কী হয় তা বোঝা যায়। সাধারণত তরঙ্গ-ফাংশানকে বা তরঙ্গ উচ্চতাকে বোঝাতে গ্রীক অক্ষর ψ(সাই) কে ব্যবহার করা হয়। শ্রোয়োডিঙ্গার বিশেষ করে বস্তু-তরঙ্গের উচ্চতা সূচক তাঁর তরঙ্গ-ফাংশানকে ψ দিয়েই বোঝালেন। স্থানের ওপর তা নির্ভরতা দেখিয়ে যে তরঙ্গ ফাংশান তাকে লেখা যাবে ψ (x, y, z)। তিন মাত্রার গ্রাফে এই তরঙ্গ ফাংশানের লেখচিত্র এঁকে এর উঠানামাকে দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্য গ্রাফটি রেখা হবেনা, হবে ঘন আয়তনের সলিড ফিগারে। সময়ের ওপর তার নির্ভরতা দেখিয়ে তরঙ্গ-ফাংশানটিকে লেখা যাবে ψ (t)। স্থান ও সময় উভয়ের ওপর নির্ভরতা থাকলে তা হবে ψ (x, y, z,t)।

এবার শ্রোয়েডিঙ্গারের বস্তু-তরঙ্গ-প্যাকেটের তরঙ্গ-ফাংশনের কথায় আসা যাক। আগেই দেখেছি তরঙ্গ-প্যাকেট দুই বা ততোধিক বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘের তরঙ্গের উপরিপাতনের সৃষ্টি। শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর তরঙ্গ-পাকেটের সৃষ্টি ব্যাখ্যা করতে বিখ্যাত গণিতবিদ ফুরিয়ারের একটি থিওরেমের সাহায্য নিলেন। এই থিওরেম বলে যে কোন গাণিতিক ফাংশানকে অসীম সংখ্যক বিভিন্ন নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘের ও উচ্চতার নিয়মিত তরঙ্গাকার ফাংশানের যোগফল হিসেবে দেখানো যায়, সেক্ষেত্রে এরকম নানা তরঙ্গের প্রত্যেকটির উচ্চতার যোগের মাধ্যমে মূল ফাংশানটি সৃষ্টি করে। মূল ফাংশানটি যতই অনিয়মিত হোক না কেন, তার লেখচিত্র যতই পরিচিত তরঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্যবিহীন হোক না কেন, ওই অসীম সংখ্যক ফাংশানগুলোর প্রত্যেকটি কিন্তু একেবারেই ছন্দিত ওঠানামার তরঙ্গের,

সে ভাবেই লেখচিত্র দেবে। এদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় এক একটি হার্মোনিক (ছন্দিত), এবং এদের প্রত্যেকটির উচ্চতাই বলে দেবে মূল ফাংশানে এদের কোন্‌টির অবদান কতখানি। এখানে ফুরিয়ারের গণিতটি হলো মূল ফাংশানটিকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘের ওই হার্মোনিক তরঙ্গগুলোর প্রত্যেকটির উচ্চতা নির্ণয় করা – যাতে পরস্পর উপরিপাতিত হলে এরা মূল ফাংশানটিকেই দিতে পারে। শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর বস্তু তরঙ্গকেও এরকম অসীম সংখ্যক হার্মোনিকে গঠিত বলে মনে করলেন; কাজেই বস্তু তরঙ্গের তরঙ্গ-ফাংশান বিশ্লেষণ করে এই তরঙ্গগুলোর উচ্চতা নির্ণয় করতে পারলেন।

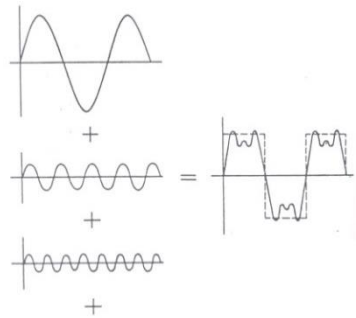

বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির হার্মোনিকের উপরিপাতনে
মূল তরঙ্গ-ফাংশানের সৃষ্টি।

এই ব্যাপারটির বোঝার জন্য আমরা একটি সহজ উপমা নিতে পারি। একটি তারকে টান টান করে দুই প্রান্তে আটকিয়ে রাখলে এবং তাতে টোকা দিলে তাতে নানা তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। একে ওই হার্মোনিক সৃষ্টির ব্যাপারটিকে এক মাত্রিক একটি স্থির তরঙ্গের বিশেষ রূপে দেখা যায়। একটি তরঙ্গ হয় পুরো তারটি কেঁপে, আরেকটি হয় তারটি দুভাগে ভাগ হয়ে কেঁপে, আরেকটি তিন ভাগে ভাগ হয়ে এমনি ভাবে অসীম সংখ্যক। প্রথমটিতে বোঝাই যাচ্ছে সব চেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ পুরো তার একসঙ্গে কাঁপাতে, দ্বিতীয়টিতে তার-অর্ধেক, তৃতীয়টিতে তার এক তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। তাই ফ্রিকোয়েন্সি প্রথমটির সব চেয়ে কম, দ্বিতীয়টির তার দ্বিগুণ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্সিকে বলা যায় ওই দৈর্ঘের ওই তারটির এক একটি স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সি, যাদের মধ্যে গোটা সংখ্যায় গুণের সম্পর্ক রয়েছে। যে আওয়াজটি আমরা শুনি তা এই সবগুলোর একটি সামগ্রিক রূপ। তারের কম্পন গুণ ও পরিস্থিতি ঠিক করে দেবে কোন্ বিশেষ হার্মোনিকের তরঙ্গের উচ্চতা কতখানি হবে; আর সেই উচ্চতা অনুযায়ীই ওই হার্মোনিকটি সামগ্রিক তরঙ্গে অবদান রাখবে অর্থাৎ সামগ্রিক সুর সৃষ্টি করবে যা কিনা তার তরঙ্গ-

ফাংশানেরই সুর-রূপী প্রকাশ। এখানে সব কম্পন ঘট্ছে একটি মাত্র মাত্রায়, তারের যেহেতু একটি মাত্রই মাত্রা রয়েছে– শুধু লম্বালম্বি হওয়াতে। এটি তাই এক-মাত্রিক তরঙ্গ হিসেবে সাধারণ তিন মাত্রার তরঙ্গের একটি বিশেষ রূপ, উদাহরণ স্বরূপ ধরা যায় যে x, y, z এই তিন মাত্রার মধ্যে এটি শুধু x এর ওপর নির্ভর করবে, লিখতে হবে $\psi(x)$ রূপে।

স্থির তরঙ্গ হিসেবে তারের উপমাটি ভালো খাট্বে এটমের মধ্যে ইলেকট্রনের তরঙ্গের ক্ষেত্রে, কারণ ওটাও স্থির তরঙ্গ। এটমের মধ্যে ইলকট্রন তরঙ্গের যে হার্মোনিকগুলো তাদের প্রত্যেকটির সঙ্গে বোর-সমারফিল্ড এটম মডেলের এক একটি অনুমোদিত কক্ষপথ জড়িত। দ্যব্রগলি দেখিয়েছেন ওই– হার্মোনিকের তরঙ্গ-দৈর্ঘই ওই কক্ষপথের সঙ্গে হুবহু ফিট্ করে। এখন শ্রোয়েডিঙ্গারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ফাংশানের ফুরিয়ার বিশ্লেষণ থেকেই এই হার্মোনিকগুলো গাণিতিক ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। সেটি যদি করা যায় তা হলে নীল বোরের মত অনুমোদিত কক্ষপথগুলোকে নেহাৎ ধরে নিতে হবেনা, দ্যব্রগলির মত চিরায়ত বিজ্ঞান আর কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের মেশাল দিয়ে তরঙ্গকে ফিট করিয়ে কক্ষপথ নির্ণয় করতে হবেনা, কক্ষপথগুলো তরঙ্গ ফাংশান থেকে অতি স্বাভাবিক ভাবে চলে আসবে। শ্রোয়েডিঙ্গার এটি করতে পারার চ্যালেঞ্জ নিয়ে নিলেন।

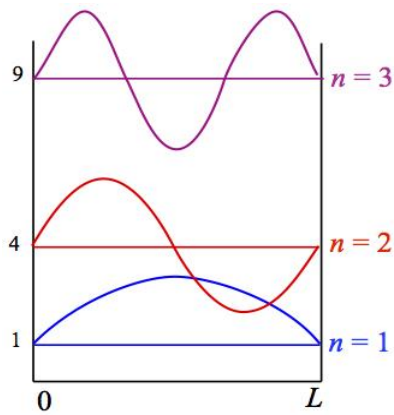

এটমে ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ফাংশানের প্রত্যেকটি হার্মোনিকের (এখানে এক মাত্রায় দেখানো) সঙ্গে এক একটি কক্ষপথ (কোয়ান্টাম নম্বর) জড়িত।

অবশ্য সেটি দেখার আগে আমাদের তারের উপমার থেকে এটমের ক্ষেত্রে কাজটি যে মাত্রার সংখ্যার দিক থেকেও জটিলতর তা বুঝে নেয়া যাক। এটম

যদি তারের মত একমাত্রিক হতো তা হলে তার তরঙ্গ-ফাংশান হতো শুধু একটি মাত্রা নির্ভর, তাকে লেখা যেতো $\psi(x)$। সমতল গ্রাফে তার লেখচিত্র হতো রেখার মত, সহজেই যা আঁকা যায়। কিন্তু এটম আসলে ত্রিমাত্রিক– ডানে-বামে, সামনে পেছনে, ওপরে নিচে; তার তরঙ্গ ফাংশানকে লিখতে হবে হবে $\psi(x, y, z)$। স্থির তরঙ্গ হওয়াতে অবশ্য এটি সময়ের ফাংশান হবেনা। তবে এক মাত্রিক তারের থেকে মাত্রার দিক থেকে এটমের আরেকটু কাছাকাছি অন্য একটি উপমা আমরা নিতে পারি যেটি দুই মাত্রিক। তবলার ওপরে যে টান টান করা চামড়া চাঁটি দিলে কাঁপে সেটিই হতে পারে এরকম দুই মাত্রিক স্থির তরঙ্গের উপমা। এটি ডানে-বামে, সামনে-পেছনে এই দুই মাত্রায় বিস্তৃত, তবে তৃতীয় মাত্রাটি (ওপরে-নিচে) নেই। চাঁটি দিলেও এরও সার্বিক তরঙ্গের ওরকম অসীম সংখ্যক হার্মোনিক তৈরি হয় প্রত্যেকটি দুই মাত্রার। তারের এক মাত্রিক তরঙ্গের মত এও কিছুটা চোখে দেখা যায়। এদেরও প্রত্যেকটির ও সামগ্রিক তবলা তরঙ্গের লেখচিত্র আঁকা যায়, তা এক মাত্রিক রেখা না হলেও ছবিতে ফুটিয়ে তোলা যায়। এটমের মত তিন-মাত্রিক তরঙ্গকে অবশ্য সেভাবে ছবিতে ফুটিয়ে তোলা কঠিন। তবে এক মাত্রিক ও দুই-মাত্রিক উপমায় যা দেখলাম তার থেকে এটিও কল্পনা করে নিতে পারি।

এটমের মধ্যে ইলেকট্রনের অনুমোদিত কক্ষপথগুলো নির্ণয়ের জন্য শ্রোয়েডিঙ্গারকে ত্রিমাত্রিক হার্মোনিকগুলো নির্ণয় করতে হলো। কিন্তু সেজন্য সবার আগে নির্ণয় করতে হলো তার সামগ্রিক তরঙ্গ-ফাংশান। অর্থাৎ x, y, z এর কী ধরনের ফাংশান এই তরঙ্গের $\psi(x, y, z)$ সেটি তাঁকে বের করতে হলো। এটি তিনি করলেন একটি বিখ্যাত সমীকরণ খাড়া করে।

শ্রোয়েডিঙ্গারের সমীকরণ

এতে কেন কাল্পনিক সংখ্যা এলো:

যে কোন তরঙ্গকে গাণিতিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রথমে তার জন্য সমীকরণ খাড়া করতে হয়। সেই সমীকরণের সমাধান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে স্থানের ও সময়ের পরিবর্তনে তরঙ্গের উচ্চতার পরিবর্তন– অর্থাৎ তার তরঙ্গ-ফাংশান। এটমের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনের তরঙ্গ স্থির তরঙ্গ হওয়াতে এরকম সমীকরণে তরঙ্গ-ফাংশানের সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনের কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধারণ ভাবে ব্যবহার্য চলন্ত বস্তু তরঙ্গের জন্য এই ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে, যাতে তরঙ্গ-ফাংশান স্থান ও সময় উভয়ের ওপর নির্ভর করে।

আমরা শ্রোয়েডিঙ্গারের সমীকরণের এই রূপটিই আগে দেখবো। চিরায়ত বিজ্ঞানে পানির তরঙ্গ, শব্দের তরঙ্গ ইত্যাদিতে যেখানে উচ্চতার কমবেশি হওয়াতে যান্ত্রিক ভাবে বস্তুর নড়াচড়া ঘটে, কাজেই সে সবের তরঙ্গ সমীকরণ এসেছে নিউটনের গতির নিয়ম থেকে। বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গে এই কমবেশি হওয়া মানে বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের কমবেশি হওয়া– তাই সেখানে তরঙ্গ সমীকরণ এসেছে ম্যাক্সওয়েলের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বের চারটি সমীকরণ থেকে। এখন শ্রোয়েডিঙ্গারকে খাড়া করতে হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের সমীকরণ– বস্তু তরঙ্গের জন্য। শ্রোয়েডিঙ্গারের ধারণা অনুযায়ী বস্তু তরঙ্গের তরঙ্গ-ফাংশান একটি সিস্টেমে কণিকার অবস্থা নিয়ে কথা বল্‌বে যেমন কণিকার অবস্থানের অবস্থা নিয়ে। অন্যান্য অবস্থা যেমন ভরবেগের অবস্থাটিও জানা জরুরি– শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ-ফাংশানকে সেগুলোকে জানানোর উপযুক্ত করেও দেখানো যায়। কিন্তু আমরা আমাদের বর্ণনায় কণিকার অবস্থানের অবস্থাকেই গুরুত্ব দেবো। এই ক্ষেত্রে স্থানের এক একটি বিন্দুতে কণিকাটির থাকা সম্পর্কে তথ্য দেবে তার তরঙ্গ-ফাংশান। আর এই তরঙ্গ-ফাংশানটি পাওয়া যাবে কণিকাটির শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণের সমাধান করে।

শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর সমীকরণ গড়ে তুল্‌লেন সিস্টেমটির মোট শক্তির ভিত্তিতে, এবং সমীকরণটি যেন দ্যব্রগলির বস্তু তরঙ্গের নিয়ম আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের স্বীকৃত নিয়মগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। একে দাঁড় করানো হলো চিরায়ত বিজ্ঞানের ব্যাপন সমীকরণের (ডিফিউশন ইকোয়েশন) আদলে। ব্যাপন মানে তরল বা গ্যাসের মত প্রবাহযোগ্য কোন কিছুর ছড়িয়ে পড়া– ব্যাপন সমীকরণটি জানতে সাহায্য করে কীভাবে এই ছড়িয়ে পড়াটি ঘটে। ব্যাপন সমীকরণ আবার গড়ে ওঠেছে নিরবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ– নামে পরিচিত আর একটি প্রতিষ্ঠিত নিয়মের ওপর। এটি বলে একটি সিস্টেমে তরল বা গ্যাসের মত কোন জিনিসের ঘনত্বের পরিবর্তন নির্ভর করবে বাইরে থেকে জিনিসটি সিস্টেমের মধ্যে কতখানি ঢুকলো বা বের হলো তার ওপর। ওই ঘনত্ব পরিবর্তন আবার সিস্টেমের ভেতর জিনিসটি ছড়িয়ে পড়ার প্যাটার্নের সঙ্গে সম্পর্কিত। আসলে পুরো ব্যাপারটি জিনিসটি কখনো নতুন করে সৃষ্টিও হয়না বা ধ্বংসও হয়না– এই নিত্যতার নীতির ওপর নির্ভর করে। শক্তিও যেহেতু এরকম সৃষ্টি হয়না বা ধ্বংস হয়না, এবং শক্তিও যেহেতু ছড়াতে পারে কাজেই ওই ব্যাপন সমীকরণটি শক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

ব্যাপন সমীকরণে একদিকে থাকে (সমান চিহ্নের বাম দিকে) সময়ের সঙ্গে জিনিসটির ঘনত্বের পরিবর্তন হার আর অন্যদিকে থাকে (সমান চিহ্নের ডান

দিকে) স্থানের সঙ্গে জিনিসটির পরিবর্তনের হারের পরিবর্তন হারকে একটি ধ্রুবকের সঙ্গে গুণ করে। ধ্রুবকটিকে বলা হয় ওই বিশেষ জিনিসটির ব্যাপন-ধ্রুবক। শ্রোয়েডিঙ্গারের সমীকরণে অনেকটা একেই অনুসরণ করা হলো, তবে সেখানে যে জিনিসটির পরিবর্তন-হারগুলো নেয়া হলো তা কোন তরল বা গ্যাসের ঘনত্ব নয়, বরং শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ-ফাংশান সেই ψ। এখানে স্থানের সঙ্গে ψ এর পরিবর্তন-হার নেয়া হলো পরপর দুইবার– পরিবর্তন হারের পরিবর্তন হয়ে। তাছাড়া সমীকরণের যেদিকে এটি কখনো তার সঙ্গে যুক্ত করা হলো মোট শক্তিকে– তার কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক রূপে। মোট শক্তি বল্‌তে বোঝানো হলো ওই সিস্টেমের পরিবেশের কারণে কণিকার মধ্যে জমা শক্তি (পোটেনশিয়াল এনার্জি) এবং কণিকার গতির কারণে সৃষ্টি হওয়া গতীয় শক্তির যোগফল। কাজেই কোন একটি সিস্টেমের জন্য এই সমীকরণটি খাড়া করতে হলে তার সুপ্ত শক্তি ও গতীয় শক্তির সম্পর্কে জানতে হয়। চিরায়ত বিজ্ঞানের ব্যাপন সমীকরণকে অনুসরণে আসলেও এটি যে একটি নির্ভেজাল কোয়ান্টাম তত্ত্বেরই সমীকরণ তা বোঝা যায় সমীকরণে উভয় দিকে সেই প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবককে h বা $\hbar$ হিসেবে আসতে দেখে। উল্লিখিত বিবেচনা থেকে এগুলো স্বাভাবিক ভাবে আসে।

শ্রোয়োডিঙ্গার সমীকরণে স্থানের সঙ্গে ψ এর পরিবর্তন-হারের পরিবর্তন-হার, এবং সময়ের সঙ্গে এর পরিবর্তন-হার– এসবের প্রকাশ করতে যে কোন পরিবর্তন-হারের উচ্চতর গণিত সেই ক্যালকুলাসকে ব্যবহার করতে হয়। এগুলোর সমন্বয়ে এটি ডিফারেনশিয়াল ইকোয়েশন নামক গণিতের রূপ লাভ করে যার সমাধান করে ψ পাওয়া যায়। ওই গণিতের ব্যবহার ছাড়া শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ লেখার সহজ উপায় নেই, যে রকম ব্যাপন সমীকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও নেই। আমরা এখানে সেকারণে সমীকরণটি লিখবোনা তবে তার সমাধান কোয়ান্টাম তত্ত্বে কী জ্ঞান কেমন করে আন্‌লো, তাতে প্রকৃতির ভবিষ্যদ্বাণী কেমন করে আসে তা খানিকটা বোঝার চেষ্টা করবো।

ব্যাপন সমীকরণের সঙ্গে শ্রোয়োডিঙ্গার সমীকরণের আরো একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। ব্যাপন সমীকরণে যেখানে স্বাভাবিক সংখ্যা হিসেবে আসা ব্যাপন ধ্রুবকটি ব্যবহার করা হয়, শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণে তার বদলে ব্যবহার করা হয় গণিতের i নামক একটি অদ্ভুত সংখ্যা যাকে কাল্পনিক সংখ্যা বলা হয়; অবশ্য i মানে আর কিছু নয় $\sqrt{-1}$ অর্থাৎ -1 এর বর্গমূল মাত্র। এখানে এই i আসাটি এত গুরুত্ব বহন করে যে একে কাল্পনিক কেন বলা হয়, আর এটি শ্রোয়েডিঙ্গার

সমীকরণে আসতে হলোই বা কেন তা এখন একটু দেখার চেষ্টা করবো। আসলে শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণে ও তার সমাধানে তরঙ্গ ফাংশানে এই কাল্পনিক সংখ্যা থাকাটি কোয়ান্টাম তত্ত্বকে চিরায়ত বিজ্ঞান থেকে অনেকটা আলাদা করে তুলেছে।

$\sqrt{-1}$ বা i এর মত যে কোন ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল এবং তা দিয়ে গুণ করা যে কোন সংখ্যাই একটি কাল্পনিক সংখ্যা, এবং কোন স্বাভাবিক সংখ্যাকে i দিয়ে গুণ করেই তা লেখা যায় যেমন $\sqrt{-3}$ এই কাল্পনিক সংখ্যাকে লেখা যায় $i\,3$ রূপে। এদেরকে কাল্পনিক সংখ্যা বলার কারণ হলো গণিতেও এমন সংখ্যা স্বাভাবিক ভাবে থাকার কথা নয়। কোন সংখ্যা ধনাত্মক হোক কিংবা ঋণাত্মক হোক তার বর্গ সব সময় ধনাত্মকই হয় যেমন $+2$ এবং -2 এই উভয় সংখ্যার বর্গই $+4$। বর্গ যেহেতু কখনো ঋণাত্মক হয়না, তাই ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলেরও কোন অর্থ হয়না। তা সত্ত্বেও এমন সংখ্যা কল্পনা করে তাকে নিয়ে গণিতের কিছু চমৎকার কাজ গড়ে তোলা হয়েছে; তবে অস্বাভাবিক বলে তাকে কাল্পনিক সংখ্যাই বলা হয়েছে। স্বাভাবিক সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাল্পনিক সংখ্যা যখন আসে তাকে বলা হয় কম্‌প্লেক্স নাম্বার (জটিল সংখ্যা) ; সব কম্‌প্লেক্স নাম্বারকে প্রয়োজনে স্বাভাবিক ও কাল্পনিক এই দুই অংশে ভাগ করে দেখানো যায়, যেমন $(2+ i3)$ এই কমপ্লেক্স নাম্বারকে 2 এই স্বাভাবিক সংখ্যা এবং $i3$ এই কাল্পনিক সংখ্যায় ভাগ করে ফেলা হয়েছে। চিরায়ত বিজ্ঞানেও গাণিতিক কৌশল হিসেবে অনেক ক্ষেত্রে এই কমপ্লেক্স নাম্বার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু গণিতের শেষ ফল থেকে যখন বাস্তব ফলটি পেতে চাওয়া হয় তখন ওটিকে স্বাভাবিক ও কাল্পনিক ওই দুই অংশে ভাগ করে শুধু স্বাভাবিক অংশটাই ফল হিসেবে গণ্য করা হয়, কাল্পনিক অংশটি বাদ দিয়ে দেয়া হয়, কারণ এই শেষেরটিতে কোন বাস্তবতা নেই। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে ওভাবে কাল্পনিক অংশ বাদ দেবার সুযোগ নেই, কারণ কোয়ান্টাম বাস্তবতায় তার স্থান রয়েছে, যেটি কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের একটি অদ্ভুত বিষয়।

বস্তু তরঙ্গের উচ্চতাটি যদি কণিকার অবস্থানের অবস্থা নির্দেশ করে, আর সেই অবস্থান যদি নিশ্চিত একটি ক্ষুদ্র জায়গাতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে এমনই নির্দেশ করে তা হলে বস্তু তরঙ্গের চেহারাটি কী রকম হবে? মনে হবে ওই অবস্থান সূচক তরঙ্গ-ফাংশান ঠিক ওই জায়গাতেই একটি উল্‌টে পেরেকের মত অতি সরু ঢেউ হয়ে অনেক ওপরে উঠে গেছে (কারণ তরঙ্গ ফাংশানের বেশি উচ্চতা ঠিক এই

জায়গাতেই অবস্থানের নির্দেশ করছে) এবং তার বামে ডানে সোজা নেমে গিয়ে বাকি জায়গায় প্রায় শূন্য হয়ে থাকছে (এসব জায়গায় অবস্থান নির্দেশ করছেনা বলে)। একে তখন তালে তালে ওঠা নামা করা একটি তরঙ্গের মত দেখাবে না– যা আমরা একটি বস্তু তরঙ্গের থেকে আশা করি, বিশেষ করে তার যদি নির্দিষ্ট একই তরঙ্গ-দৈর্ঘ থাকে। ওপরে বর্ণিত তরঙ্গ-ফাংশানকে কোন স্বাভাবিক সংখ্যা দিয়ে গুণ করে ওই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব নয়– সেই ক্ষেত্রে ওই পেরেকের মত জায়গাটি আরো ওপরে যাবে বা নেমে আসবে মাত্র। কিন্তু যদি আমরা কাল্পনিক সংখ্যা দিয়ে গুণ করি তা হলে কিন্তু ওই তরঙ্গ ফাংশনও ঘুরে গিয়ে সময়ের সঙ্গে ওঠানামার মত আশানুরূপ তরঙ্গ সৃষ্টি করবে।

খুব সরল ভাবে দেখতে পারি কাল্পনিক সংখ্যা i এর এই ঘুরিয়ে ফেলার ক্ষমতাটি কীভাবে আসে। তরঙ্গ ফাংশানে যদি i থাকে এবং তা দিয়ে একটি স্বাভাবিক সংখ্যাকে (ধরা যাক+1) গুণ করা হয় তা হলে পার $1\times i=i$। এই ফলকে যদি আবার i দিয়ে গুণ করা হয় তা হলে পাব $i\times i=-1$। আবার i দিয়ে গুণ করলে $i\times i\times i=-i$, তারপর আবার করলে $i\times i\times i\times i=1$ এভাবে i দিয়ে বার বার গুণ করার ফলে আমরা শুরুতে 1 থেকে i,-1, $-i$,হয়ে আবার 1 ফিরে পাই। আর এ কাজ চল্‌তে থাকলে চক্রাকারে বার বার ওই একই 1 কেই খুঁজে পাব। গ্রাফ পেপারে শূন্য বিন্দু থেকে ডান দিকে এক একক গেলে যদি বলি +1, বাম দিকে এক একক গেলে যদি বলি -1, ওপরের দিকে এক একক গেলে যদি বলি $+i$ এবং নিচের দিকে এক একক গেলে যদি বলি $-i$; তা হলে i দিয়ে বার বার গুণ করার ফলে এদের যোগ করা লেখচিত্রটি বার বার রিং এর আকৃতি নিয়ে ঘুরতে থাকবে। i এর এই ঘূর্ণন গুণ তরঙ্গ-ফাংশানকে তরঙ্গের রূপে প্রকাশিত হবার সুযোগ দেয়। চলমান তরঙ্গ এবং স্থির তরঙ্গ উভয়ের জন্যই তরঙ্গ-ফাংশানের এই চক্রাকার ঘূর্ণনে ওঠানামাটি দরকার।

যে সব পরিস্থিতিতে তরঙ্গ-ফাংশান স্থির তরঙ্গ থাকে যেমন এটমের মধ্যে, সেখানকার তরঙ্গ-ফাংশান পাওয়ার জন্য শ্রোয়েডিঙ্গার তরঙ্গকে কিছুটা সরলতর রূপে প্রকাশ করা যায়। ওরকম স্থির তরঙ্গ সময়ে স্থির থাকে শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণের যে অংশে সময়ের সঙ্গে ψ এর পরিবর্তনের হারটি থাকে সেই অংশ বাদ দেয়া যায় এবং তার জায়গায় আসে স্থির তরঙ্গের নানা শক্তিমাত্রার মান সূচক একটি রাশিকে ψ দিয়ে গুণ করা। এই রাশিটিকে বলা হয় 'প্রকৃত মান'

(এ ক্ষেত্রে শক্তিমাত্রার প্রকৃত মান)। এই প্রকৃত মানের বিশেষ বিশেষ মানের জন্যই শুধু, অর্থাৎ বিভিন্ন অনুমোদিত শক্তিমাত্রার জন্যই শুধু সমীকরণটি সমাধান করা সম্ভব – যা এটমের মত সিস্টেমে অনুমোদিত কক্ষপথগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়। স্থির তরঙ্গের জন্য শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণটি সমাধান করলে বিভিন্ন অনুমোদিত প্রকৃত মানের জন্যই এই সমাধান বেরিয়ে আসে– যেমন এটমে বিভিন্ন কোয়ান্টাম নম্বরের জন্য।

শ্রোয়েডিঙ্গারের সমীকরণের সাফল্যঃ

অবস্থানের অবস্থা জানানোর যে তরঙ্গ-ফাংশান ψ, তা স্থানের মধ্যে কণিকাটির অবস্থানের খবর দেয়। ψ যেখানে উঁচু বেশি সেই বিন্দুতেই কণিকাটির থাকার বেশি নির্দেশনা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু গতি ব্যাপারটিই এমন যে তাতে ওই বিন্দুতেই থাকা কালে অবস্থানের খবরের সঙ্গে সঙ্গে তার বেগের অবস্থাটাও জানতে হয়, তাহলেই এরপর গতি কোন্ দিকে গড়াবে তা স্পষ্ট হবে। এক্ষেত্রে বেগের খবরটিকে ভরবেগের খবর হিসেবে জানাটিই রেওয়াজ। আগে দেখেছি শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ-ফাংশান ψ অসীম সংখ্যক নিয়মিত তরঙ্গ বা হার্মোনিকের উপরিপাতনে গড়া যার প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি হয়েছে (যেগুলো পরস্পর সম্পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে সম্পর্কিত)। দ্যব্রগলির নিয়ম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি মানে হলো সেই কণিকার একটি নির্দিষ্ট ভরবেগ। কাজেই হার্মোনিকগুলো আসলে ভরবেগের অবস্থা জানাবার ব্যবস্থা। বোঝাই যাচ্ছে এখানে সামগ্রিক তরঙ্গ ফাংশান ψ অবস্থান সূচক তরঙ্গ-ফাংশান হলেও এর সঙ্গেই হার্মোনিক হিসেবে জড়িত রয়েছে ভরবেগ সূচক ব্যবস্থা।

ব্যাপারটিকে ভাল বোঝার জন্য আমরা এর একটি সরল চিত্র কল্পনা করি। মনে করি আমাদের প্রাসঙ্গিক সিস্টেমটি তিন মাত্রিক নয়; বরং এক মাত্রিক। তাহলে ψ শুধু একটি মাত্রা x এর ওপর নির্ভর করে হবে $\psi(x)$, ধরে নিই লেখচিত্রে বাম থেকে ডানে গেলেই x বাড়ে; আর এই x এর বিভিন্ন মানের জন্য $\psi(x)$ এর মান পরিবর্তিত হয়। $\psi(x)$ এর মধ্যে কাল্পনিক সংখ্যা i থাকার ফলে x এর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে $\psi(x)$ পরিবর্তিত হবার সময় এটি লেখচিত্রে আবর্তিতও হতে থাকবে। তখন কম্প্লেক্স নাম্বারকে লেখচিত্রে দেখার জন্য আমরা তিন মাত্রিক লেখচিত্রের বাকি দুটি মাত্রা y এবং z কে কমপ্লেক্স নাম্বারের চিত্ররূপ দেবার জন্য ছেড়ে দিতে পারি। মনে করি y সামনে-পেছনে দিকে– অর্থাৎ যদি কাগজের ওপর আঁকি তাহলে কাগজ ফুঁড়ে ঢোকার বা বেরিয়ে আসার

দিকে। ওটিকে কমপ্লেক্স নাম্বারে প্রকাশিত $\psi(x)$ এর শুধু স্বাভাবিক সংখ্যার দিকটি কমবেশি হবার জন্য ব্যবহার করি। আর z হলো ওপর-নিচের দিকে, ওটাকে $\psi(x)$ এর শুধু কাল্পনিক সংখ্যার দিকটি কম বেশি হবার জন্য ব্যবহার করি। তাহলে কম্‌প্লেক্স হওয়া সত্ত্বেও লেখচিত্রের তিন মাত্রায় আমরা $\psi(x)$ কে দেখতে পাচ্ছি এমন কল্পনা করতে পারি। i এর ঘূর্ণন গুণের কারণে দেখবো x যতই বাড়ছে ψ ততই স্প্রিং আকৃতির মত প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে এগোচ্ছে। যেমন আগেও 1 থেকে ক্রমাগত i দিয়ে গুণ করে চক্রাকারে রিঙের মত লেখচিত্র হতে দেখেছি। এখানে বাড়তি যা হচ্ছে তা হলো x এর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রিংগুলো x এর দিকে স্প্রিঙের মত এগোচ্ছে। ফাংশানটির গাণিতিক রূপ দেখলেই বোঝা যায় যে প্যাঁচগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব বলে দেবে সেখানে কণিকার ভরবেগ কত। $\psi(x)$ এর মধ্যে থাকা একটি বিশেষ হার্মোনিকের ফ্রিকোয়েন্সি সুনির্দিষ্ট বলে $\psi(x)$ এর এই অংশের জন্য ওই স্প্রিং-সদৃশ তরঙ্গের প্যাঁচগুলোর মধ্যে দূরত্ব সব সময় একই থাকবে এবং সেখানে প্যাঁচের সৃষ্ট যে বৃত্তাকার রিং তার ব্যাসার্ধ $\psi(x)$ এর মধ্যে ওই হার্মোনিকটির অবদানের অনুপাত বলে দেবে; অর্থাৎ অবদান বেশি হলে সেই হার্মোনিকের রিংগুলো বড় হবে। কাজেই $\psi(x)$ এর ফুরিয়ার বিশ্লেষণ প্রত্যেক হার্মোনিকের অবস্থার বর্ণনা দিয়ে দেবে। এই ক্ষেত্রে তা হলো রিঙের ব্যাসার্ধের মাধ্যমে কণিকার অবস্থানের অবস্থায় তার অবদান এবং রিঙের পারস্পরিক দূরত্বের মাধ্যমে তার ভরবেগ।

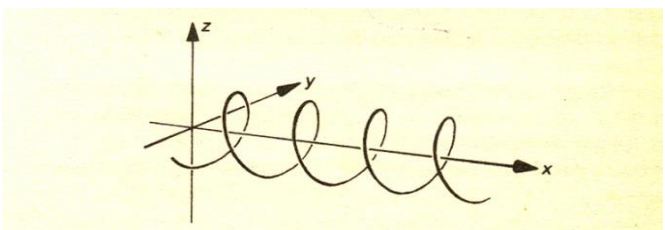

অবস্থান-অবস্থার তরঙ্গ-ফাংশানের (ψ) একটি হার্মোনিক, এর থেকে এই হার্মোনিকে ভরবেগ-অবস্থা (রিঙের পারস্পরিক দূরত্ব থেকে) এবং মূল তরঙ্গ-ফাংশানে এই হার্মোনিকের অবদান (রিঙের ব্যাসার্ধ থেকে) জানা যায়।

আমরা এখানে অবশ্য বোঝার সুবিধার জন্য একমাত্রিক স্থান কল্পনা করে চিত্রটিকে সরল করে নিয়েছি। প্রকৃত ক্ষেত্রে ψ কে তিন মাত্রায় $\psi(x, y,z)$ হিসেবেই নিতে হয়। তখন প্রত্যেক মাত্রার কম্প্লেক্স নাম্বার দেখাবার জন্য প্রত্যেকটির আরো দুটি করে মাত্রা যোগ করতে হবে বলে এতগুলো মাত্রায় তার চিত্রটি কল্পনা করা আমাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু গাণিতিক ভাবে মূল জিনিসটি একই ভাবে ঘটে এবং অবস্থান ও ভরবেগের অবস্থা অংক কষে ঠিকই নির্ণয় করা যায়।

শ্রোয়েডিঙ্গার হাইড্রোজেন এটমের ইলেকট্রনের স্থির তরঙ্গের জন্য এই কাজগুলোই করলেন। প্রথমে তিনি হাইড্রোজেন এটমের নিউক্লিয়াসের চারিদিকের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে ইলেকট্রনের জন্য জমা শক্তি ও গতীয় শক্তির সমন্বয়ে যে মোট শক্তি সৃষ্টি হয় তার ভিত্তিতে এর জন্য স্থির তরঙ্গের শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণটি খাড়া করলেন। এর সমাধান করে তিনি বিভিন্ন হারমোনিকের জন্য তরঙ্গ ফাংশান পেলেন। আগেই দেখেছি এক একটি হার্মোনিক বলে দেয় নীল বোরের একটি শক্তি মাত্রা বা কক্ষপথ। শ্রোয়েডিঙ্গার এটমের ভেতর স্থানের তিন মাত্রায় এভাবে সমাধান করে বিভিন্ন মাত্রা থেকে বোর-সমারফিল্ড মডেলের তিনটি কোয়ান্টাম নম্বর n, k, m কে অতি স্বাভাবিক ভাবে অংকের হিসেবেই নির্ণয় করতে পারলেন।

সাধারণ স্থানে আমাদের জন্য ডান-বাম (x), সামনে-পেছনে (y), ওপর-নিচ (z) এভাবে তিন মাত্রা বিবেচনা করাটি স্বাভাবিক ও সুবিধাজনক জ্যামিতির। কিন্তু এটম যেহেতু একটি গোলকাকার জিনিস তাতে গোলকের জ্যামিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিন মাত্রা বিশ্লেষণ করা সুবিধাজনক। শ্রোয়েডিঙ্গার সেটিই করলেন। এতে এটমের কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে যে ব্যাসার্ধ সেটি বরাবর একটি মাত্রা হলো– কেন্দ্রে নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে যাব এটি তত বাড়বে। আর অন্য দুটি মাত্রা থাকে দুটি কোণের হিসেবে– কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত যাওয়া রেখাটি বিষুব রেখা বরাবর অবস্থার সঙ্গে উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে যাবার যে কোন অবস্থার কোণ তৈরি করে (ভূ-গোলকের সঙ্গে এই গোলক তুলনা করলে) সেটি হয় একটি কোণ। অন্য কোণ পাশের দিকে বেষ্টনীতে এক দিকে থেকে অন্যদিকে নিয়ে যায়। ব্যাসার্ধের দিকের মাত্রায় অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে ক্রমে বাইরের দিকে যাওয়ার মাত্রায় তাঁর সমীকরণ সমাধান করে শ্রোয়েডিঙ্গার যে তরঙ্গ ফাংশান পেলেন তার হার্মোনিকগুলোর সূচক গোটা গোটা সংখ্যা 1, 2 ও ইত্যাদি বোর-সমারফিল্ড মডেলের প্রধান কোয়ান্টাম নম্বর $n=1, 2,$ ও

ইত্যাদি ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন $n=1$ সূচক যে হার্মোনিক পেলেন নিউক্লিয়াস থেকে দূরত্বে, ভরবেগে, এবং শক্তিতে এটি খুবই নির্দিষ্ট এবং এটম মডেলের কোয়ান্টাম নম্বর $n=1$ থেকে পাওয়া মানের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। এমনি ভাবে $n=2, 3$ ও অন্য হার্মোনিকগুলোও। কাজেই কোয়ান্টাম নম্বর n এখানে স্বাভাবিক ভাবে সমীকরণ থেকেই এলো। কৌণিক মাত্রা দুটিতে সমাধান করে তেমনি অন্য দুটি কোয়ান্টাম নম্বর k এবং m স্বাভাবিক ভাবেই এলা। উপবৃত্তাকার কক্ষ পথের আকৃতি এবং তাদের অভিমূখ ঠিক করার k ও m এর কাজ; এর সঙ্গে এই কৌণিক মাত্রার সাযুজ্য আছে। এই ভাবে শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ থেকে পাওয়া উপবৃত্তাকার কক্ষপথগুলোর মধ্যে ইলেকট্রনের 'কোয়ান্টাম লাফের' মাধ্যমে যেই সূক্ষ্মভাবে নির্ধারিত ফ্রিকোয়েন্সির আলো নি:সরিত হয়ে হাইড্রোজেন বর্ণালীর লাইনগুলো সৃষ্টি হওয়ার কথা সেগুলোর হিসেব করা ফ্রিকোয়েন্সি বাস্তব লাইন ও বামার ফরমুলার সঙ্গে সুন্দর মিলেও গেল। এটি ছিল শ্রোয়েডিঙ্গারের তত্ত্বের দারুণ সাফল্য। প্রায় একই সময় জার্মান বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ আরেক ধরনের গণিতের প্রয়োগে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে খাড়া করে একই ভাবে সফল হয়েছিলেন। শ্রোয়েডিঙ্গার দেখাতে পেরেছিলেন যে এই দুই পদ্ধতি আসলে একই জিনিস।

মনে রাখতে হবে বোর-সমারফিল্ড মডেল এসেছিলো কিছুটা ধরে নেয়া, কিছুটা চিরায়ত বিজ্ঞান আর কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের মেশাল দিয়ে। এখন বাস্তবের সঙ্গে মিলে যাওয়া একই ফলাফল এলো শ্রোয়েডিঙ্গারের বিশুদ্ধ কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভিত্তিতে। কণিকাকে সম্পূর্ণ রূপে তরঙ্গ হিসেবে নিয়ে শ্রোয়েডিঙ্গারের ধারণার বিরাট বিজয় হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সবের ব্যাখ্যায় শ্রোয়েডিঙ্গারের যে আশাটি ছিলো সেটি কিন্তু বড় ধাক্কা খেলো। তিনি তাঁর তরঙ্গ-ফাংশানের যেই মানে করতে চেয়েছিলেন সেটি করা সম্ভব হলোনা, একে দিতে হলো অন্য রকম মানে, যা শ্রোয়েডিঙ্গারের কাছে তৃপ্তিকর মনে হয়নি। তাঁর সমীকরণ, তাঁর পুরো গাণিতিক প্রক্রিয়া, এগুলোর সাফল্য সবই অক্ষুণ্ন রইলো, কিন্তু এর মানেটি তাঁর ইচ্ছে মত হলোনা। পরের অধ্যায়ে আমরা দেখবো শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ ফাংশানের ব্যাখ্যা কোন্ দিকে গেল।

শুধু সম্ভাবনার খবরই সম্ভব

অবস্থান সব জায়গায়

তরঙ্গ প্যাকেটের ধারণায় বিপত্তিঃ

শ্রোয়েডিঙ্গার কণিকার সবকিছুকে তরঙ্গ হিসেবে দেখেছিলেন। অনেক তরঙ্গের সম্মিলনে মোট তরঙ্গটি যখন একটি ছোট্ট জায়গায় উঁচু হয় ফুলে ওঠে সেটি একটি তরঙ্গ-প্যাকেট যাকে শ্রোয়েডিঙ্গার কণিকার একমাত্র সত্তা বলেই গণ্য করেছেন। এভাবে কণিকার আলাদা সত্তাকে বাতিল করে তিনি কণিকা-তরঙ্গ দ্বৈততার মত অদ্ভুত জিনিসকে এড়াতে চাচ্ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন মোটের ওপর সবকিছুকে তরঙ্গ গতিবিদ্যার মাধ্যমে চিরায়ত বিজ্ঞানের মধ্যে রাখতে, যদিও তার মধ্যে কিছু কোয়ান্টাম নিয়মও থাকছে। বাস্তবতার সঙ্গে মেলাতে গিয়ে বোর-সমারফিল্ড এটম মডেলের কক্ষপথগুলো এবং তাদের একটি থেকে অন্যটিতে লাফ দেবার বিষয়টি অনিবার্য ভাবে এসেছে। কিন্তু বড় অদ্ভুত সেই লাফ; মাঝখানের অননুমোদিত জায়গার ওপর দিয়ে না গিয়েই সেটি কীভাবে সম্ভব? তার ওপর কোন্ মুহূর্তে সেই লাফ তাও চান্সের ওপর নির্ভর করে, নির্দিষ্ট করে বলা যায়না। শ্রোয়েডিঙ্গার এই অদ্ভুত ব্যাপারগুলো বাদ দিয়েই ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষ পথে গিয়ে সঠিক আলো নি:সরণ সম্ভব করছে– এমনটিই দেখতে চাচ্ছিলেন।

শ্রোয়েডিঙ্গার এই ব্যাপারে ভরসা করছিলেন চিরায়ত তরঙ্গের কিছু বিশেষ আচরণের ওপর। যেমন খুব সামান্য ফ্রিকোয়েন্সি পার্থক্য আছে এমন দুটি তরঙ্গ একটির ওপর অন্যটি চড়াও হলে ভাঙ্গাগড়ার ফলে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল তরঙ্গ প্যাকেটের সৃষ্টি হয়– যাকে বলা হয় বীট তরঙ্গ। শব্দ তরঙ্গের ক্ষেত্রে এটি বেশ পরিচিত। এর বৈশিষ্ট হলো যে সময় এগোবার সঙ্গে সঙ্গে এতে শব্দ ওঠানামা করে। এতে ভাঙ্গাগড়ার ফলে একটি তরঙ্গ প্যাকেট গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে শব্দ জোরালো হয়, তারপর আবার প্যাকেটটি ধীরে ধীরে চুপসে গিয়ে শব্দ কমে যায়, এরপর আবার জোরালো হয়– এমনি করে চল্‌তে থাকে। এভাবে সেকেন্ডে কতবার এটি জোরালো হয়ে ওঠে তাকে বলা হয় বীট ফ্রিকোয়েন্সি– যা মূল ফ্রিকোয়েন্সি দুটার পার্থক্যের সমান। শ্রোয়েডিঙ্গারের বিশ্বাস ছিল কাছাকাছি ওই দুটি মূল তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সির প্রত্যেকটিকে এক একটি কক্ষপথে ইলেকট্রন তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি মনে করলে এদের ফ্রিকোয়েন্সি-পার্থক্য বা বীট ফ্রিকোয়েন্সিকে নি:সরিত আলোর ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে সম্পর্কিত

করা যাবে। ওভাবেই চিরায়ত বিজ্ঞানের মধ্যেই কোন অদ্ভুত আচরণ ছাড়া বর্ণালী লাইন এবং ওপরের নিয়মগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। কিন্তু শ্রোয়েডিঙ্গারের সেই চেষ্টা বাকি সব কিছুর সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ হয়নি।

শ্রোয়েডিঙ্গারের ধারণার মূলে যে তরঙ্গ প্যাকেট, অন্যান্য বিজ্ঞানীরা দেখিয়ে দিলেন যে সাধারণ ক্ষেত্রে সেটি ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। দ্রব্রগলি এটমে ইলেকট্রনের যে স্থির তরঙ্গ অনুমোদিত কক্ষপথে ফিট্ করে বলে দেখিয়েছিলেন সেখানে স্থায়ী তরঙ্গ প্যাকেটের ধারণাটি ঠিকই কাজ করেছে। কিন্তু এটমের বাইরে মুক্ত অবস্থায় যদি ইলেকট্রনকে বিবেচনা করা হয় সেখানে তার তরঙ্গ প্যাকেট ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে বিলীন হয়ে যাবে। এটি অনেকটা ব্যাপন সমীকরণে বর্ণিত এক জায়গায় অধিক ঘনত্বে জমে থাকা গ্যাসের সময়ের সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার মত, যার সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গার অধিক ঘনত্বটি কমে আসবে। এখানে তরঙ্গ প্যাকেটও তার ফোলা জায়গাটি আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেল্‌বে।

তাছাড়া এরকম একটি মুক্ত ইলেকট্রন যখন একটি এটমের সঙ্গে সংঘর্ষ করে তাকে দেখতে হয় ওই তরঙ্গ প্যাকেটের সঙ্গে একটি স্পন্দনশীল সিস্টেমের বিক্রিয়া হিসেবে। কারণ প্রত্যেক এটমকে একটি বিশেষ ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপছে এরকম একটি সিস্টেম হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সংঘর্ষের মুহূর্তে উভয়ের উপরিপাতন ঘটে, তারপর এরা যখন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তখন তাদের কার অবস্থা কী রকম হবে সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়না। এই বস্তুগুলোকে তরঙ্গ হিসেবে দেখার এটিই বিপত্তি। একই রকম সংঘর্ষ যদি চিরায়ত অর্থে দুটি বস্তুর মধ্যে হতো– যেমন দুটি মার্বেলের মধ্যে– তা হলে চিরায়ত বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকের সংঘর্ষের আগের অবস্থা থেকে পরের অবস্থা নির্দিষ্ট করে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতো। কিন্তু এখানে তরঙ্গরূপী ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে যেন কোন্ কারণে কোন্ কাজ হবে সেই কার্য-কারণ সম্পর্কটাই লোপ পেয়েছে। ফলে সংঘর্ষের পর ইলেকট্রন কোন্ দিকে, কোন বেগে বিক্ষিপ্ত হবে বলা যাবেনা, বরং মনে করা যাবে তার সব দিকে সব বেগে যাবারই সম্ভাবনা রয়েছে। সেটি হবে ইলেকট্রনের তরঙ্গ প্যাকেট গুড়ো গুড়ো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ার মতই অনেকটা। শ্রোয়েডিঙ্গারের কথা মত ইলেকট্রন যদি শুধুই তরঙ্গ প্যাকেট হয় তা হলে এই সংঘর্ষের পর আর ইলেকট্রনের অস্তিত্ব থাকেনা। আইনস্টাইন আলোর ওপর কণিকা গুণ আরোপ করে যেভাবে ফটো-ইলেকট্রন সমস্যার সমাধান করেছিলেন সেই সমস্যাটি এখানে ইলেকট্রনের জন্য আবার দেখা দেয়।

শ্রোয়েডিঙ্গারের তরঙ্গ প্যাকেট যে মুক্ত ইলেকট্রনের জন্য স্থায়ী হতে পারেনা আরো এক ভাবে দেখানো যায়। আগামী অধ্যায়ে আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের অনিশ্চয়তার নীতি নিয়ে আলোচনা করবো। অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী কোন কণিকার অবস্থান ও ভরবেগ সম্পর্কে এক সঙ্গে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়; এর একটি যত নিশ্চিত হবে অন্যটির অনিশ্চয়তা তত বেড়ে যায়। এগুলোর মধ্যে একটি যদি একেবারে নিশ্চিত হয় অন্যটি অসীম রকমের অনিশ্চিত হয় যা অসম্ভব। কাজেই যে কোন মুহূর্তে অবস্থান ও ভরবেগ উভয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা অনিশ্চয়তা নিয়েই থাকতে হয়। এটি পরিমাপের প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে অনিশ্চয়তা নয়, তাত্ত্বিক ভাবে একেবারে অনিবার্য অনিশ্চয়তা। একটি তরঙ্গ প্যাকেটে যে অনেকগুলো তরঙ্গ উপরিপাতিত হয়ে সৃষ্টি হয় তার প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে। এ ফ্রিকোয়েন্সিগুলো প্যাকেটটির যে ইলেকট্রন তার ভরবেগ ঠিক করে দেয়। আর তরঙ্গ প্যাকেটটির উচ্চতা ইলেকট্রনটির অবস্থান ঠিক করে দেয়। কিন্তু তরঙ্গ প্যাকেটের মধ্যে ইলকট্রনের এই অবস্থান ও ভরবেগ উভয়ের তথ্যের ক্ষেত্রে কিছু অনিশ্চয়তা থাকে। প্রশ্ন হলো এই মুহূর্তে এই দুইয়ের যে অনিশ্চয়তা পরের মুহূর্তে তার কী হবে? পরের মুহূর্তে কণিকাটি কোথায় যাবে তা তার ভরবেগই ঠিক করে দেয়। কাজেই ভরবেগের অনিশ্চয়তার কারণে অবস্থানের অনিশ্চয়তা পরের মুহূর্তে আরো বাড়বে, এরপর আরো খানিকটা, এভাবে বেশ কিছুটা; অন্যদিকে কিন্তু ভরবেগের অনিশ্চয়তা একই থাকবে। শুরুতে তরঙ্গ প্যাকেটের মাঝখানটি বেশি উঁচু থাকার মানে হলো ও জায়গায় ইলেকট্রনটি থাকার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বেশি। এ নিশ্চয়তা সময়ের সঙ্গে কমতে থাকবে আর শেষ পর্যন্ত ওই উঁচু জায়গা আর থাকবেনা। এর অর্থ তরঙ্গ প্যাকেটটি বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে বিলীন হয়ে যাবে। শ্রোয়েডিঙ্গার তরঙ্গ প্যাকেটকেই কণিকা বলতে চেয়েছেন তাই ওই প্যাকেটে ছোট জায়গার মধ্যেই ইলেকট্রনকে দেখেছেন। কিন্তু যত ছোট জায়গার মধ্যে ইলেকট্রনকে নিবদ্ধ করেছেন ততই দ্রুত প্যাকেটটি ছড়িয়ে তাঁর ওই ধারণাটিকেই ব্যর্থ করছে।

সব দিক থেকে ক্রমে পরিস্কার হয়ে গেলো যে তরঙ্গ প্যাকেটের্ মাধ্যমে শ্রোয়েডিঙ্গার ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ফাংশানকে যেই অর্থ দিতে চেয়েছিলেন তাকেই ইলেকট্রন সাব্যস্ত করে, তা চল্‌বেনা। তরঙ্গ-ফাংশান তা হলে সরাসরি ইলেকট্রন নয়, তাহলে সেটি কী, তার সঙ্গে ইলেকট্রনের সম্পর্কই বা কী? এর একটি নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলো।

নানা সম্ভাবনার উপরিপাতনঃ

ইলেকট্রনের সঙ্গে এটমের সংঘর্ষের পর এদের অবস্থার নির্দিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী যে সম্ভব নয় এটি দেখিয়ে দিয়ে শ্রোয়েডিঙ্গারের ব্যাখ্যাকে যিনি নাকচ করেছিলেন তিনি হলেন জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্স বর্ন। এই ম্যাক্স বর্নই তরঙ্গ-ফাংশানের বিকল্প ব্যাখ্যা দিলেন– যেই ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত কোয়ান্টাম তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তরঙ্গ-ফাংশান আসলে অবস্থার 'সম্ভাবনাকেই' নির্দেশ করছে, সত্যিকার অবস্থাকে নয়। যদি জিজ্ঞেস করা হয় এই তরঙ্গ কিসের তরঙ্গ, তাহলে সবচেয়ে সঙ্গত উত্তর হবে এটি সম্ভাবনার তরঙ্গ। এ তরঙ্গের সঙ্গে বাস্তব কণিকাকে গুলিয়ে ফেলা ঠিক হবেনা– এটি একটি বিমূর্ত গাণিতিক তরঙ্গ। অবস্থানের অবস্থার তরঙ্গ-ফাংশান শুধু জানিয়ে দিচ্ছে সিস্টেমটির ভেতর কোন্ বিন্দুতে কণিকাটির অবস্থানের সম্ভাবনা কতখানি। তরঙ্গ-ফাংশানের লেখচিত্রের দিকে যদি তাকাতে পারতাম তা হলে স্থানের সেই বিন্দুতে তরঙ্গ ফাংশানের যে উচ্চতা তা সেই সম্ভাবনাটিই জানিয়ে দিতো। এই যে সম্ভাবনার কথা বল্‌ছি আমাদের জানা চিরায়ত সম্ভাবনার সঙ্গে সেটি হুবহু এক জিনিস নয়। সেজন্য একে সরাসরি সম্ভাবনা না বলে বলা হলো 'সম্ভাবনা-উচ্চতা'।

কথা হলো নিশ্চিত কিছু না বুঝিয়ে ওটি সম্ভাবনাকে বোঝাচ্ছে কেন? সম্ভাবনার কথাটি উঠ্‌লোই বা কেন? ম্যাক্স বর্নের যে গবেষণা সংঘর্ষে ইলেকট্রনের বিক্ষিপ্ত হবার ঘটনা দেখিয়েছে সেখানেই এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিলো। আমরা দেখেছি সেখানে সংঘর্ষের আগের অবস্থা থেকে পরের অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়না, চিরায়ত বিজ্ঞানে যা করা যায়। সংঘর্ষের পর ইলেকট্রন যে কোন বেগে যে কোন দিকে যেতে পারে। কাজেই তরঙ্গের নিরিখে যে কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক বর্ণনা তাতে এর যে কোন জায়গার যে কোন বেগে যাওয়ার সব সম্ভাবনাকেই অন্তর্ভুক্ত করে কথা বল্‌তে হয়। সেটি বড় জোর যা করতে পারে কোন্ সম্ভাবনাটির গুরুত্ব কতখানি সেটি বলে দিতে পারে। তরঙ্গ-ফাংশানের নিরিখে যেখানে সম্ভাবনা বেশি সেখানেই বাস্তব ফলাফলে তা বেশি প্রতিফলিত হবে, আর সেখানে তা কম ফলাফলেও কম দেখা যাবে তা। বর্নের ব্যাখ্যায় তরঙ্গ-ফাংশান এটিই করে। কণিকার তরঙ্গ আচরণই অবস্থার তথ্যকে এরকম ছড়িয়ে ঘোলাটে হয়ে থাকার ব্যাপারটিকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। সাধারণভাবে বল্‌তে গেলে যখনই আমরা কোন সিস্টেমের মধ্যে কণিকাগুলোর গতি-প্রকৃতি সম্পর্ক জানতে চাইবো তখনই বড় জোর যেটি করতে পারি তা হলো তার তরঙ্গ-ফাংশান ψ নির্ধারণ করতে পারি যা বলে দেবে একটি কণিকা 'ক' অবস্থা থেকে 'খ' অবস্থায় যাওয়ার সম্ভাবনা কী, অথবা 'গ' অবস্থায় যাওয়ার সম্ভাবনা কী ইত্যাদি। এটি কণিকার

অবস্থানের অবস্থার জন্য যেমন সত্য, তেমনি ভরবেগ ইত্যাদি সব কিছুর অবস্থার জন্যই সত্য। চিরায়ত বিজ্ঞানের সঙ্গে কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ওখানেই বড় পার্থক্য। বিশেষ করে ক্ষুদ্র জিনিসের গতিবিধি জানার একমাত্র উপায় এই কোয়ান্টাম বিজ্ঞানে সেগুলোকে এই সম্ভাবনার নিরিখেই জানতে হয়। কিন্তু তাই বলে তার ফলাফলটিও কি এই তথ্যের মতই ঘোলাটে হয়ে গেছে? সব কিছুরই যখন সম্ভাবনা, কোন নির্দিষ্ট ফলাফল কি আমরা পাবনা? তা কিন্তু মোটেই নয়, এর থেকেই আমরা প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে জানতে পারছি। সেটি কীভাবে সম্ভব তা এর পরের আলোচনাগুলো থেকে কিছুটা স্পষ্ট হবে।

অবস্থান-অবস্থার কথা যদি বলি তরঙ্গ-ফাংশানের উচ্চতা এখানে অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করছে, এবং সিস্টেমের সব স্থানে এই উচ্চতা কম বেশি কিছু না কিছু আছে। কিন্তু বর্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আসলে কিন্তু কণিকাটি নিজে সব জায়গায় ছড়িয়ে নেই, সেটি এ মুহূর্তে এক জায়গাতেই আছে - তা যেখানেই হোক না কেন। যা ছড়িয়ে আছে বলে তরঙ্গ-ফাংশান বল্‌ছে তা হলো প্রতিটি বিন্দুতে সেই অবস্থান ঘটার সম্ভাবনা। ওখানে তরঙ্গ-ফাংশানের মান সেই বিন্দুতে কণিকার থাকার সম্ভাবনা-উচ্চতাটিই দিয়ে থাকে। যদি আমরা c_n রাশিটিকে স্থানের nতম বিন্দুটিতে সম্ভাবনা-উচ্চতা মনে করি তা হলে 1, 2, 3 ইত্যাদি নানা বিন্দুতে উচ্চতাগুলোকে লেখা যায় c_1, c_2. c_3, c_4 এই ভাবে। এদের একরকম যোগফলই হলো তরঙ্গ-ফাংশান – যা কিনা আসলে এই সব অবস্থার একটি উপরিপাতন। তাই বলা যায়; $\psi = c_1 + c_2 + c_3$ +.....ইত্যাদি। আসলে c_1, c_2 ইত্যাদির প্রত্যেকে বলে দিচ্ছে ψ এর মধ্যে থাকা তার নিজের 'ওজনটা' – অর্থাৎ ψএর মধ্যে এই বিশেষ সম্ভাবনাটি কতখানি অবদান রাখছে সেই তথ্যটি।

শুধু অবস্থানের অবস্থার ব্যাপারে নয়, সাধারণ ভাবে সব রকম অবস্থার ক্ষেত্রেও দেখলেও যখনই একটি সিস্টেমের অবস্থার একাধিক বিকল্পের কথা ওঠে তখনই সব বিকল্পের সম্ভাবনা-উচ্চতার সম্মিলিত যোগফল নিয়েই তরঙ্গ ফাংশান গঠিত হয়। আবার যখন একাধিক সিস্টেম সংযুক্ত হয়ে কাজ করে তখন এই দুই সিস্টেমের প্রত্যেকটিকেই সংযুক্ত সিস্টেমের এক একটি বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং উভয়ের তরঙ্গ-ফাংশানের উপরিপাতিত রূপটিকে একটি সম্মিলিত তৃতীয় তরঙ্গ-ফাংশান হিসেবে বিবেচনা করা যায়। একই সিস্টেমের নানা বিন্দুতে অবস্থানের বিকল্পগুলোই হোক বা একাধিক সিস্টেম হিসেবে আসা বিকল্পগুলোই হোক যেহেতু এদের সব ক'টিই কম্‌প্লেক্স নাম্বারে প্রকাশিত কাজেই

যোগফলগুলো সাধারণ যোগের কাজ নয়– কম্‌প্লেক্স নাম্বারের যোগের পদ্ধতি অনুসরণ করবে। যা পাওয়া যাবে তাও কম্‌প্লেক্স নাম্বারেই, এবং আগেই দেখেছি কাল্পনিক সংখ্যার কারণে তার মধ্যে ঘূর্ণনে একরকম তরঙ্গ প্রকৃতিও চলে আসে সময়ের সঙ্গে পুনরাবৃত্ত হয়ে এগোবার মত। কিন্তু এগুলো সম্ভাবনা নির্দেশ করবে কী করে? আমরা সম্ভাবনা বলে যা চিনি তা তো এরকম কম্‌প্লেক্স নাম্বার হতে পারেনা।

সম্ভাবনা-উচ্চতা থেকে পরিচিত সম্ভাবনাঃ

আমাদের পরিচিত সম্ভাবনা কম্‌প্লেক্স নাম্বার হতে পারে না কারণ তাকে স্বাভাবিক সংখ্যায় গড়া একটি ভগ্নাংশ হতে হয়। একটি– ঘটনা ঘটার মোট সংখ্যার মধ্যে একটি বিশেষ বিকল্প কতবার ঘটবে সেটিই তো তার সম্ভাবনা– তাই এটি এই বিকল্পটি ঘটার আর মোট ঘটনার সংখ্যার একটি অনুপাত মাত্র যা সাধারণ একটি ভগ্নাংশ হতে বাধ্য। সম্ভাবনার এই চিরায়ত পরিচয়টি আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি। তরঙ্গ-ফাংশানে সম্ভাবনা-উচ্চতার ওঠানামা যেভাবে ঘটে– সেটি কমপ্লেক্স নাম্বারের ওঠানামা সেখানে এরকম ভগ্নাংশের হদিশ থাকেনা। সহজ করার জন্য অবস্থান-অবস্থাকে এক মাত্রায় এনে আমরা এই তরঙ্গ-ফাংশানের একটি লেখচিত্র মনে মনে দেখার চেষ্টা করেছিলাম। সেখানে ক্রমে আবর্তিত এই ওঠানামায় ওপরের ধনাত্মক দিক থেকে নিচে ধনাত্মক দিকে আসা যাওয়া করে বারবার– ওখান থেকে ভগ্নাংশের মত একটি শুধু ঋণাত্মক সংখ্যা কীভাবে বের করবো? এ সমস্যার সমাধানও ম্যাক্স বর্ন দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ওই কোয়ান্টাম সম্ভাবনা-উচ্চতা থেকে সত্যিকারের বাস্তব সম্ভাবনাটি জানার উপায়টি বের করে এনেছেন।

এখানে একটি কথা স্মরণ করতে হবে যা আমরা আগেই দেখেছি। চিরায়ত বিজ্ঞানে সম্ভাবনা জিনিসটি আনা হয় অসংখ্য ক্ষেত্রের মধ্যে প্রত্যেকটিকে আলাদা করে সুনির্দিষ্ট ভাবে হিসেব অসম্ভব হয় বলে। যেমন গ্যাসের প্রত্যেক অণুর চলাচলের ভিত্তিতে পাত্রের মধ্যে গ্যাসের উত্তাপ, চাপ ইত্যাদি বের করার অসুবিধাটি আমরা দেখেছি। নীতিগত ভাবে কাজটি করা যায়, কিন্তু বাস্তবে সেটি করা অসম্ভব– ওই সময়, ওই ব্যবস্থা নেই বলে। এভাবে এই অণুগুলোর চলাচল সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা সত্ত্বেও যেন আমরা গ্যাসের সিস্টেমটির মোদ্দা হিসেবটি করতে পারি সে জন্যই সম্ভাবনার হিসেবে সেখানে গড়পড়তা হিসেব করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে বেগের বন্টনের মত সার্বিক ছবি খাড়া করা হয়েছে। এসব আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি। একই ভাবে লটারির চাকা যখন

ঘোরে তখন সে চাকার প্রকৃতি, এতে নানা ঘর্ষণ, এর শুরুর ঘূর্ণন বেগ, ইত্যাদির খুঁটিনাটি হিসেব নেয়া গেলে চাকাটি কত নম্বরে গিয়ে থাকবে তা ঠিকই বলা যেতো। কিন্তু এই কাজগুলো বাস্তবে সম্ভব নয় বলে বাজিকররা আগের সাফল্য ব্যর্থতার হিসেবে সম্ভাবনার ভিত্তিতে বাজি ধরেন। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে এসে আমরা যে সম্ভাবনার কথা বল্‌ছি সেটি কিন্তু তা নয়। এখানে সম্ভাবনা আমাদের অজ্ঞতার কারণে আসেনি; বরং এমনকি নীতিগত ভাবেও সুনির্দিষ্ট কোন হিসেব করার সুযোগ নেই বলেই এসেছে।

এই সম্ভাবনাটি অজ্ঞতা অতিক্রম করার কোন কৌশল নয়, বরং তত্ত্বের মধ্যেই একেবারে অঙ্গীভূত। এখন কম্‌প্লেক্স সম্ভাবনা-উচ্চতা থেকে প্রকৃত সম্ভাবনা পেতে গেলে ওই কমপ্লেক্স নাম্বারটির পরম মান (মডিউলাস) বের করে নিতে হবে যা স্বাভাবিক ও কাল্পনিক নির্বিশেষে তার অন্তর্নিহিত মানটি দেবে: যেমন 3 এবং $i3$ দুটি ভিন্ন সংখ্যা হলেও এদের উভয়ের পরম মান হবে 3। স্বাভাবিক ও কাল্পনিক অংশ নিয়ে পুরো কম্‌প্লেক্স সংখ্যাটির পরম মান নির্ণয়ের উপায়ও এর গণিতে আছে। পরম মানকে লেখার নিয়ম হলো $i3$ এর পরম মান $|i3|$ আমাদের পূর্ব পরিচিত C_n একটি কমপ্লেক্স নাম্বার, এর পরম মান $|C_n|$। C_n নিজে দিচ্ছে একটি সম্ভাবনা-উচ্চতা; আর এর থেকে সত্যিকার সেই সম্ভাবনা পাওয়া যাবে তা হবে $|C_n|^2$ অর্থাৎ তার পরম মানের বর্গ। এটি যে একটি স্বাভাবিক ধনাত্মক সংখ্যা হবে তা বলাই বাহুল্য; এটি একটি ভগ্নাংশ অবশ্যই হতে পারে, এই ভগ্নাংশটি বলে দেবে n তম বিন্দুতে কণিকাটির অবস্থানের সত্যিকার সম্ভাবনা কত। ঘোড়দৌড়ে আমার ঘোড়াটি জেতার সম্ভাবনা যদি $\frac{১}{৩}$ হয় তা হলে আগামী ৯ বার ঘোড়দৌড়ে এটি তিনবার জিতবে বলে আমি আশা করতে পারি। $|C_n|^2$ সেরকমই একটিই সম্ভাবনা প্রকাশ করছে কণিকার nতম বিন্দুতে অবস্থানের ক্ষেত্রে। আমাদের সেই আগের লেখচিত্রে C_n গুলোর তরঙ্গায়িত ওঠানামা দেখেছি, সেটি ছিল তরঙ্গ-ফাংশান। কিন্তু তার বদলে $|C_n|^2$ গুলোর ওঠানামার লেখচিত্র যদি নিই সেটি হবে সম্ভাবনা ফাংশান। এর উচ্চতাটি তরঙ্গ ফাংশানের মত কমপ্লেক্স নাম্বারে সম্ভাবনা-উচ্চতা দেবেনা, বরং বাস্তবের 'প্রকৃত সম্ভাবনা' দেবে। তার পুরোটাই হবে ধনাত্মকের দিকে। যেই বিন্দুতে কণিকাটির থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি সেখানে ওটি একটি পেরেকের মত সরু হয়ে ওপরে ওঠে যাবে, যেখানে কম সেখানে ছড়ানো ভাবে অল্প উঠবে– কিন্তু সবই ওঠার দিকে, নামার দিকে বা ঋণাত্মক দিকে কোথাও হতে পারেনা, এতে কোন কাল্পনিক সংখ্যাও থাকেনা, কারণ এটি যে প্রকৃত সম্ভাবনার চিত্র।

প্রত্যেক বিন্দুতে যেমন এরকম প্রকৃত সম্ভাবনার হিসেব $|C_n|^2$ থেকে বের করা যায় তেমনি পুরো সিস্টেমের অবস্থার প্রকৃত সম্ভাবনা $|\psi|^2$ থেকে বের করা যায়। সে ক্ষেত্রে $|c_1 + c_2 + c_3 + ...|^2$ C_n গুলোর যোগফলের ওপর হিসেব করে সেটি নির্ণয় করতে হয়। এখানে কিছু বাড়তি সমস্যা দেখা দেয়। বোঝার সুবিধার জন্য ধরা যাক বিকল্প সম্ভাবনা- উচ্চতা এতগুলো নয় মাত্র দুটি c_1 এবং c_2। তাহলে $|\psi|^2$ পেতে হলে $|c_1 + c_2|^2$ এই প্রকৃত সম্ভাবনাটি নির্ণয় করতে হবে। এটি যদি করা হয় দেখা যাবে যে তাতে $|c_1|^2$ এবং $|c_2|^2$ এই দুটি রাশি ছাড়াও অতিরিক্ত একটি মিশ্র রাশি থাকবে যা উভয়ের একটি উপরিপাতিত রাশি। এই মিশ্র রাশিটির মান হবে পরিস্থিতি অনুযায়ী বড় বা ছোট, ধনাত্মক বা ঋণাত্মক, কখনো শূন্য। এক তরঙ্গ অন্য তরঙ্গের ওপর উপরিপাতিত হয়ে ভাঙ্গাগড়ার মাধ্যমে যেমন নানা ফল দিতে পারে, শূন্যও হতে পারে এই মিশ্র রাশিটি যেন অনেকটা তারই মত। এই উপরিপাতনে মিশ্র রাশির সৃষ্টি একটি কোয়ান্টাম বাস্তবতা। $|c_1 + c_2|^2$ একটি বাস্তব প্রকৃত সম্ভাবনার প্রকাশ, অথচ এই বাস্তবতার মধ্যেও একটি কোয়ান্টাম চরিত্র ঢুকে রয়েছে। চিরায়ত বিজ্ঞানে কখানো এমন উপরিপাতিত মিশ্র রাশি আসেনা।

ইলেকট্রন বা অণু-পরমাণুর মত এক বা কয়েকটি ক্ষুদ্র কণিকা নিয়ে যে সিস্টেম সেখানে ওই মিশ্র রাশির কোয়ান্টাম বাস্তবতাটি খুবই উপস্থিত। তার কারণেই চিরায়ত ধারণার থেকে অনেক ভিন্ন রূপ নিয়েই ওগুলোর প্রকৃত সম্ভাবনাগুলো আসে। কিন্তু তার থেকে অনেক বড় আমাদের নিত্য পরিচিত বড় জিনিসগুলোর পর্যায় যখন আসে তখন তাতে পৃথক কণিকার সংখ্যা বিপুল এবং ইতস্তত। এগুলোর প্রত্যেকের ক্ষেত্রে হিসেব করা হলে প্রকৃত সম্ভাবনার মধ্যে ওই মিশ্র রাশিটি বিভিন্ন রকমের হবে– এবং গড়পড়তায় তার ধনাত্মকগুলোর এবং ঋণাত্মকগুলোর মধ্যে কাটাকুটি হয়ে সামগ্রিক সিস্টেমে তা শূন্যে পরিণত হবে। কাজেই কোয়ান্টাম বাস্তবতার অংশটি তাকে প্রভাবিত করবেনা। বড় জিনিস যে চিরায়ত বিজ্ঞানেই বিবেচনা করা যায় তাতে মিশ্ররাশি শূন্য হয়ে যাওয়া তার একটি কারণ।

এটমের সম্ভাবনা চিত্রঃ

একটি সিস্টেমে ওপরের নিয়ম অনুযায়ী সম্ভাবনার যে চিত্র পাওয়া যায় তাকে সিস্টেমের পুরো স্থানের মধ্যে সম্ভাবনা ঘনত্ব হিসেবে দেখানো যায়। যেখানে ঘনত্ব বেশি সেসব জায়গায় কণিকাটিকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, ঘনত্ব কম হলে

পাওয়ার সম্ভাবনা কম। এটমের মধ্যে এই চিত্রটি বিবেচনা করতে পারি। গত অধ্যায়ে দেখেছি শ্রোয়েডিঙ্গার হাইড্রোজেন এটমের জন্য তাঁর সমীকরণের সমাধান করে তার তরঙ্গ-ফাংশান নির্ণয় করেছেন। এর ফুরিয়ার বিশ্লেষণ করে নিজস্ব ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে এক একটি হার্মোনিক এসেছে, বিভিন্ন কোয়ান্টাম নম্বর অনুযায়ী যা এটমের মধ্যে ইলেকট্রন কক্ষপথগুলোর এক একটির হদিশ দিতে পেরেছে। কিন্তু এখন আমাদেরকে ম্যাক্স বর্নের ব্যাখ্যা ও প্রক্রিয়া অনুযায়ী এগুলোকে প্রকৃত সম্ভাবনার ঘনত্ব চিত্র হিসেবে দেখতে হচ্ছে। এর আগে বোর-সমারফিল্ড মডেলে যদিও বা অনুমোদিত কক্ষপথগুলো থেকে মনে হয়েছিলো যে ইলেকট্রন সব সময় কক্ষপথের নির্দিষ্ট রেখার ওপরেই থাকে, এখন কিন্তু তা থাকার সম্ভাবনাগুলো নিউক্লিয়াসের বাইরে সারা এটম জুড়েই ছড়ানো। অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ীও কক্ষপথের সরু রেখার মধ্যে ইলেকট্রনকে সীমিত রাখার কোন সুযোগ নেই। সম্ভাবনার ঘনত্ব চিত্রেও এটি ধরা পড়বে– যদিও কোথাও তা বেশি ঘন– যেই অঞ্চলে ইলেকট্রনের থাকার সম্ভাবনা বেশি, আর কোথায় কম ঘন– যেই অঞ্চলে থাকার সম্ভাবনা কম। সম্ভাবনার ঘনত্বের তারতম্য অনুযায়ী থাকার সম্ভাবনা কমবেশি। ওই তরঙ্গ ফাংশান থেকে পাওয়া প্রকৃত সম্ভাবনা-উচ্চতাগুলো এই ঘনত্বকে ঠিক করে দেবে। যেই কারণে শ্রোয়েডিঙ্গার ইলেকট্রনগুলোকে অনুমোদিত কক্ষপথে পেয়েছিলেন সেই একই কারণে এবার সম্ভাবনা ঘনত্ব কিছু কিছু অঞ্চলে অত্যন্ত বেশি হবে। যেমন ধরে নিতে পারি যে শতকরা হিসেবে ৯৫% বা তার বেশি ঘনত্ব হবে বিশেষ কিছু অঞ্চলের মধ্যে এক একটি কোয়ান্টাম নম্বর যার এক একটিকে নির্ধারিত করে দেবে। অর্থাৎ ইলেকট্রনকে এই অঞ্চলে পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। এগুলোকে বলা হলো এক একটি অরবিটাল, কক্ষপথ বা অরবিটের অনুসরণে শব্দটি এলো, কিন্তু এটি অরবিট নয়।

অরবিটকে (কক্ষপথকে) ধারণা করা হয়েছিলো এই মর্মে যে ইলেকট্রন সত্যি সত্যি ওই কক্ষপথে থাকে। অরবিটালের ধারণা কিন্তু সম্ভাবনা নিয়ে, এখানে ইলেকট্রন থাকার সম্ভাবনা বিপুল ভাবে বেশি। কিন্তু এগুলো রেখার মত নয় বরং বিভিন্ন আকৃতি নিয়ে বেশ খানিকটা অঞ্চল, যেখানে এরকম উচ্চ সম্ভাবনা বিমূর্ত হয়ে আছে। এর বাইরেও যে ইলেকট্রনের অবস্থানের সম্ভাবনা নেই তা নয়, তা প্রায় পুরো এটম জুড়েই আছে, তবে অরবিটালের বাইরে সম্ভাবনা খুব কম। আমরা এটমের ত্রিমাত্রিক মডেলে কুয়াশার মত ঘনত্ব সৃষ্টি করে এই অরবিটালগুলোকে দেখাতে পারি, যেখানে সম্ভাবনা ঘনত্ব বেশি সেখানে কুয়াশার ঘনত্বও আনুপাতিক ভাবে বেশি দেখিয়ে। আরো সহজ কাজ হলো কাগজের

ওপর দুই মাত্রায় একে দেখানো অর্থাৎ গোলকাকার পুরো এটমকে বৃত্ত হিসেবে দেখিয়ে। ওখানে নিউক্লিয়াসের বাইরে জায়গায় গাঢ় বা পাতলা করে ঘনত্ব সম্ভাবনার বোঝাতে পারি অথবা কালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুকে ঘন ভাবে বা পাতলা করে দেখিয়েও তা করতে পারি। বোর-সমারফিল্ড মডেলের কক্ষপথগুলোর বদলে এখন কালির বিন্দুর কুয়াশার আকারে অরবিটালগুলো এ চিত্রে দেখা যাবে। একেবারে নিম্নতম কক্ষপথটি যদি নিই তাহলে বোর-সমারফিল্ড মডেল সেটি নিউক্লিয়াসের কাছাকাছি একটি সরু বৃত্তাকার কক্ষপথ হবে। আর সম্ভাবনার ব্যাখ্যায় এই নতুন মডেলে তা হবে বৃত্তাকার একটি চওড়া বলয়ের মত, বা একটি পুরু রিং এর মত অরবিটাল, বেশি ঘনত্বের কুয়াশার মত। উচ্চতর কোয়ান্টাম নম্বরগুলো নিয়ে অন্য অরবিটালগুলো নানা আকৃতির এরকম ঘন কুয়াশার অঞ্চল হবে যাতে কোন কোনটি আগেরটির মত পুরু রিঙের আকৃতি ছাড়াও বিভিন্ন রকম লম্বাটে ডাম্বেলের মত কিছু আকৃতিও থাকবে। এই সবই ওই সম্ভাবনা ঘনত্বের প্রতিনিধিত্বকারী কুয়াশায় গঠিত। এটি বোর-সমারফিল্ড মডেলের এ একরকম সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রকাশ যা একটি সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় এটম মডেল– ডাক নামে কুয়াশা মডেলও বলা যায়। আগেই দেখেছি এই মডেলের অরবিটালগুলো আগের মডেলের কক্ষপথের মত নয়; কক্ষপথে ইলেকট্রন সত্যি সত্যি থাকার কথা, কিন্তু অরবিটাল শুধু ইলেকট্রনের উপস্থিতির সম্ভাবনার গাণিতিক প্রকাশ মাত্র। শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁর তরঙ্গ ফাংশান থেকে যেমন বাস্তব বর্ণালী লাইনের নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী করতে পেরেছিলেন তেমনি এটমের এই সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় মডেলের অরবিটালের সাহায্যে বিজ্ঞানের অনেক কিছুর নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী ও ব্যাখ্যা সম্ভব হচ্ছে। এটিই এটম মডেলের বিচিত্র ইতিহাসে সর্বশেষ মডেল, এবং এপর্যন্ত সবচেয়ে সফল মডেল।

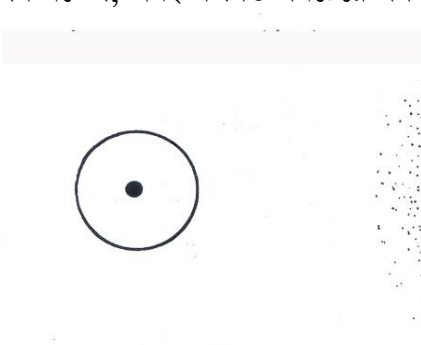

বোর-সমারফিল্ড এটম মডেলে
হাইড্রোজেনের নিম্নতম 'অরবিট'
(কক্ষপথ)

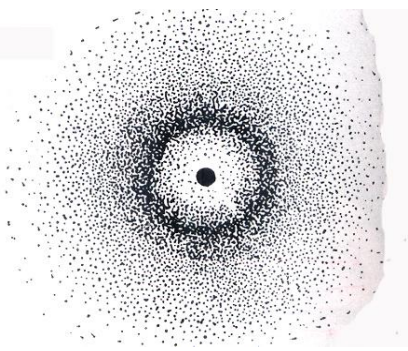

কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় এটম মডেলে
হাইড্রোজেনের নিম্নতম 'অরবিটাল'
(শুধু সম্ভাবনা)

মাপার আগে ও মাপার পরে

উপরিপাতনের অবসানঃ

তরঙ্গ-ফাংশান থেকে হিসেব করে যা কিছুই ভবিষ্যদ্বাণী করা হোক না কেন তা আসে সম্ভাবনা রূপে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিজ্ঞানকে সম্ভাবনা নয়, নিশ্চিত বাস্তবতার ভিত্তিতে যাচাই হতে হয়; সেই যাচাইয়ের পরেই বোঝা যায় যে সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সঠিক ছিল কিনা। এটি বোঝা যাবে সত্যিকার পরিমাপের পর – সেখানে লাগবে যন্ত্রপাতি এবং পরিমাপকারীর বোধশক্তি। যেমন পরিমাপকারীকে নিশ্চিত হতে হবে যন্ত্রের কাঁটা ঘোরা দেখে, শব্দ শুনে, সংবেদী পর্দার ওপর আলো দেখে, অথবা এমনি কোন কিছুতে নিশ্চিত হয়ে। তার সব কিছুই আমাদের পরিচিত চিরায়ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্র। কাজেই মাপার পর্যায়ে আর সেটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাপার থাকছেনা, সম্ভাবনার ব্যাপারও থাকছেনা। কাজেই কোয়ান্টাম তত্ত্বকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু পরিমাপযোগ্য সম্ভাবনার ভবিষ্যদ্বাণীর কথায় এনে পরিমাপের চিরায়ত জগতের কাছেই সোপর্দ করে দিতে হয়। কিন্তু তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত রয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্য কাহিনী।

পরিমাপের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্ভাবনার জগতে থাকি। সেখানে তরঙ্গ-ফাংশানের সম্ভাবনার খবরগুলোই একমাত্র সম্বল। এর মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটি হলো এই সম্ভাবনা একটি বিশেষ ঘটনা বিশেষ ভাবে ঘটার সুনির্দিষ্ট সম্ভাবনা নয়, তার বিভিন্ন বিকল্পের মিশ্রণে গড়া এক সম্ভাবনা। এটি বিভিন্ন অবস্থার উপরিপাতন; যেমন অবস্থানের অবস্থার কথা যদি বলি কণিকা এখানেও আছে, ওখানেও আছে এমনিতরো তথ্যের উপরিপাতনে গড়া মিশ্র সম্ভাবনা। কিন্তু সত্যি সত্যি কণিকাটিতো এক সঙ্গে সব বিন্দুতে থাকতে পারেনা, পরিমাপের ফলে একে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতেই পেতে হবে। কিন্তু সে তো পরিমাপের পরের ব্যাপার, তার আগে পর্যন্ত ওই উপরিপাতিত অবস্থাটাই সই। তাতে যে তথ্য রয়েছে তার গাণিতিক প্রক্রিয়াকরণ বিজ্ঞানকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে। এটি এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে যা সম্ভাবনার ভিত্তিতে আস্‌লেও বাস্তবে পরিমাপযোগ্য। এভাবেই কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনেক অসাধ্য সাধন করছে।

আমরা আগেই দেখেছি কোয়ান্টাম তত্ত্বের হিসেব শেষ পর্যন্ত যে সম্ভাবনার তথ্য দেয় তা প্রকৃত সম্ভাবনা, আমাদের পরিচিত সম্ভাবনা। মোট যতবার ঘটনাটি দেখা হয়েছে তার মধ্যে একটি বিশেষ বিকল্প কতবার এসেছে সেই ভগ্নাংশ নিয়ে যেই সম্ভাবনা ঠিক সেটি। সত্যি সত্যি সেই মত ঘটতে দেখলে বল্‌বো সম্ভাবনা ঠিক আছে; কিন্তু কোন্ কোন্ বার এই বিশেষ বিকল্প ঘটবে তা জানার উপায় নেই।

যেমন সেই যে বলেছি আমার ঘোড়ার জেতার সম্ভাবনা $\frac{১}{৩}$ হলে আগামী ৯ বারে ঘোড়দৌড়ে এটি ৩ বার জিতবে আশা করবো; আশা পূর্ণ হলে সম্ভাবনা সঠিক ছিল বলতে হবে। কিন্তু এই ৯ বারের মধ্যে কোন্ ৩ বার যে এটি জিত্‌বে, যেমন এখুনি যে দৌড়টা হবে তাতে আমার ঘোড়া জিত্‌বে কিনা এমন কোন কথা এই $\frac{১}{৩}$ সম্ভাবনার খবরের মধ্যে নেই। কোয়ান্টাম তত্ত্বেও তা থাকেনা। এর সম্ভাবনা-উচ্চতা বা সম্ভাবনা ঘনত্ব জানিয়ে দেয় বটে উদাহরণ স্বরূপ ১০০ বার মাপলে ৯৫ বার ইলেকট্রনটিকে এই অরবিটালের কোথাও পাব, কিন্তু সেটি কোন্ ৯৫ বার তা বলেনা। কাজেই আগামী বার পরিমাপে সেটি এর বাইরেও পেতে পারি এমন চান্স কিন্তু থেকে যায়। কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই দিকটাই শুধু চান্সের ওপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ একটি কণিকা সংঘর্ষে বিক্ষিপ্ত হয়ে কোন্ দিকে যাবে তার ভবিষ্যদ্বাণী এটি করতে পারেনা– সেটি চান্সের ব্যাপার। অথবা এক অরবিটাল থেকে, আরেক অরবিটালে ইলেকট্রনের স্থানান্তরের 'কোয়ান্টাম লাফ' ঠিক কোন মুহূর্তে ঘটবে সেটি চান্সের ব্যাপার। চিরায়ত বিজ্ঞানের মত কোন নির্দিষ্ট জ্ঞানের দাবী কোয়ান্টাম তত্ত্ব এখানে করেনা। কিন্তু এদের মোট ফল অর্থাৎ কত শতাংশ ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত ইলেকট্রন কোনদিকে যাবে, কিংবা ওই লাফ্‌গুলো কোন্ ফ্রিকোয়েন্সির আলো নি:সরিত করবে এই ফলাফল খুব সুনির্দিষ্ট ভাবেই কোয়ান্টাম তত্ত্বে পাওয়া যায়, এবং বাস্তব পরিমাপে তা নিখুঁত ভাবে মিলেও যায়। এর মধ্যে চান্সের কিছু নেই। যেই শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ থেকে এসব আসছে সেখানেও চান্সের কোন ব্যাপার নেই। কাজেই সম্ভাবনার ভাষায় এবং উপরিপাতনের ভাষায় কথা বললেও কোয়ান্টাম তত্ত্বে সবই অনির্দিষ্ট চান্সের ব্যাপার একথা ঠিক নয়।

ওই সফল ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্বে সিস্টেমটির জন্য শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ খাড়া করা থেকে শুরু করে, এর সমাধানে পাওয়া তরঙ্গ-ফাংশানের মধ্যে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অন্য তরঙ্গ-ফাংশানের সঙ্গে এর উপরিপাতন ইত্যাদি গাণিতিক প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হয়। শেষ পর্যন্ত সবই আসে সম্ভাবনা রূপে। কিন্তু যে মুহূর্তে তা পরিমাপ করা হলো সেই মুহূর্তে তা সুনির্দিষ্ট বাস্তবতায় পরিণত হচ্ছে, আর সম্ভাবনা থাকছেনা, উপরিপাতনের কোন মিশ্র ব্যাপারও থাক্‌ছেনা। তা হলে এতক্ষণ এত সব কোয়ান্টাম গাণিতিক প্রক্রিয়ায় যে সব তরঙ্গ-ফাংশান পাওয়া গেল, নানা উপরিপাতিত অবস্থা পাওয়া গেলো, এসবের কোন মানে তো মাপার পর অবশিষ্ট রইলো না। ম্যাক্স বর্নের ব্যাখ্যা বলে মাপের

মুহূর্তের পর এই উপরিপাতিত অবস্থাগুলো 'চুপসে গিয়ে' নির্দিষ্ট তথ্যে পরিণত হয়। এই চুপসে যাওয়া ব্যাপারটি যে ঠিক কী তার ব্যাখ্যা না থাকলেও, এটি ঠিক যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সম্ভাবনা ভিত্তিক মর্মকথা, এবং উপরিপাতনের হিসেব নিকেষগুলো প্রকৃত ফলাফলকে কোন ভাবে ভুল পথে নিয়েও যায়না, ঘোলাটে করেও ফেলেনা। স্পষ্টত প্রকৃতিই এই ব্যাপারে যেন কোয়ান্টাম তত্ত্বের পক্ষে রয়েছে।

ম্যাক্স বর্নের ব্যাখ্যায় দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের উদাহরণঃ

একটি উদাহরণ হিসেবে ম্যাক্স বর্নের ব্যাখ্যাটি ধাপে ধাপে দেখার জন্য আমরা ইলেকট্রনের ওপর দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টটি আবার বর্ণনা করতে পারি। মনে করি একটি ইলেকট্রন তার উৎস থেকে দুটি ফাটলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইলেকট্রনটির এগোবার পথের বিবেচনায় সিস্টেমটির দুটি বিকল্প আছে। প্রথম বিকল্পটি হলো 1 নামক ফাটলের ভেতর দিয়ে গিয়ে একটি পর্দার ডানে বামে বিস্তৃত স্কেলে গিয়ে পৌঁছা। আর দ্বিতীয় বিকল্পটি হলো 2 নামক ফাটলের ভেতর দিয়ে গিয়ে পর্দায় ওই স্কেলে গিয়ে পৌঁছা। মনে করি পর্দার p নামক একটি বিন্দুতে প্রথম বিকল্পের মাধ্যমে ইলেকট্রনটির পৌঁছার সম্ভাবনা C_1 এবং দ্বিতীয় বিকল্পের মাধ্যমে পৌঁছার সম্ভাবনা C_2। কোয়ান্টাম নিয়মে ওই p বিন্দুতে পৌঁছার একটি উপরিপাতিত অবস্থাই থাকবে উভয় বিকল্পের একত্রে কাজ করার মধ্য দিয়ে, তাই p বিন্দুতে পৌঁছার সামগ্রিক সম্ভাবনা-উচ্চতা হবে $C_1 + C_2$। ফলে ইলেকট্রনটি p বিন্দুতে পৌঁছার প্রকৃত সম্ভাবনা হবে $|C_1 + C_2|^2$। C_1 এবং C_2 কম্প্লেক্স নাম্বার হওয়ার কারণে এই প্রকৃত সম্ভাবনাকে লেখা যাবে এ ভাবে:

$|C_1 + C_2|^2 = |C_1|^2 + |C_2|^2 +$ উপরিপাতনের ফলে মিশ্র রাশি।

উৎস থেকে p এর দূরত্বের ওপর নির্ভর করে মিশ্র রাশিটি ধনাত্মক, শূন্য, অথবা ঋণাত্মক হবে। যদি ধনাত্মক হয় তবে ওপরের সমীকরণ অনুযায়ী $|C_1 + C_2|^2$ এর মান সব চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ ইলেকট্রন p বিন্দুতে পৌঁছার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশি হবে। যদি মিশ্র রাশিটি শূন্য হয় তা হলে ওই সম্ভাবনা মাঝারি হবে, আর যদি ঋণাত্মক হয় তবে সম্ভাবনাটি হবে শূন্য। ফাটল দুটির মধ্যে দূরত্ব, ফাটল থেকে পর্দার দূরত্ব, ইলেকট্রনটি ভরবেগ অর্থাৎ তার তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদির বিবেচনা বলে দেবে মিশ্র রাশিটি পর্দার কোথায় কত হবে। সেই অনুযায়ী দেখা যায় p বিন্দুটি পর্দার ওই স্কেলের একটি জায়গায় থাকলে ওখানে

ইলেকট্রনটি পৌঁছার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি হয়। তার খানিকটা পাশে থাকলে সম্ভাবনা মাঝারি হয়, আর তারও পাশে থাকলে সম্ভাবনা একেবারে শূন্য হয়। আবার তার থেকে আরেকটু পাশ সরলে আবার মাঝারি, আবার সবচেয়ে বেশি, তার পাশে আবার মাঝারি, তার পাশে আবার শূন্য এমনি করে হতে থাকে– ওই মিশ্র রাশির মান ক্রমান্বয়ে শূন্য, ধনাত্মক, শূন্য ও ঋণাত্মক হতে থাকার কারণে।

এই সব অবশ্য সম্ভাবনার ব্যাপার। আমরা তো একটি ইলেকট্রনের কথাই বল্‌ছি, আর তা পর্দায় গিয়ে আসলে আঘাত করতে পারবে একটি মাত্র জায়গাতেই, সবখানে নয়। সেই একটি মাত্র জায়গাটি কোথায় তা দেখতে হলে আমাদেরকে পরিমাপ করতে হবে। পরিমাপের একটি উপায় হতে পারে পর্দার ওপর ইলেকট্রন-সংবেদী প্রলেপ লাগিয়ে দেয়া। তাহলে বোঝা যাবে ইলেকট্রনটি সত্যি সত্যি পর্দায় কোথায় আঘাত করেছে– কারণ সেখানে তখন একটি আলোর রেখা ফুটে ওঠবে। কিন্তু সম্ভাবনার মানেটা যদি স্মরণ করি তা হলে বুঝতে পারবো যে আমাদের এই ইলেকট্রনটি পর্দার কোথায় আঘাত করার এবং কোথায় আলোর রেখা দেখা যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু একের পর এক ইলেকট্রন যখন আসতে থাকবে তাদের প্রত্যেকের ওপরও ওপরে বর্ণিত ওই নানা রকম সম্ভাবনাগুলো প্রযোজ্য হবে পর্দায় কোথায় যাবে সেই সম্ভাবনা একই ভাবে বলবৎ থাকবে। কাজেই তাদের কোন্‌টি কোথায় যাবে সেটি নিশ্চিত না হলেও ১০০টির মধ্যে বা এক লক্ষটির মধ্যে কতগুলো ওই সর্বোচ্চ সম্ভাবনার জায়গায় জায়গায় যাবে, কতগুলো মাঝারি সম্ভাবনার জায়গায় যাবে, এবং শূন্য সম্ভাবনার জায়গায় যাওয়াটাকে কতগুলো এড়িয়ে চল্‌বে সেটি ওই $|C_1 + C_2|^2$ এর মান যেখানে যেভাবে দিয়েছে যেভাবেই ঘটবে। অর্থাৎ পরিমাপে সংবেদী পর্দায় অনেক বেশি ইলেকট্রন আঘাত করার ফলে সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনার জায়গাটিই উজ্জ্বলতম হবে, তার পাশেরটিতে মাঝারি সংখ্যক ইলেকট্রন আঘাত করার ফলে তাতে মাঝারি উজ্জ্বলতা সৃষ্টি হবে আর কার্যত নগণ্য সংখ্যক ইলেকট্রন আঘাত করার ফলে শূন্য সম্ভাবনার জায়গাটি অন্ধকার থাকবে। অর্থাৎ ওই উপরিপাতন, মিশ্র রাশি, সম্ভাবনা, কোন্‌ ইলেকট্রন কোথায় পড়বে তার অনিশ্চয়তা ইত্যাদি সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আমরা কিন্তু বাস্তবে ইলেকট্রনের সেই ঝালরটিকেই পর্দায় আমরা দেখতে পাব দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্ট থেকে আমরা যেটি আশা করি। এটিই যে পাব কোয়ান্টাম তত্ত্ব সেই ভবিষ্যদ্বাণীই করে, এবং এটিই পাই। সামগ্রিক ফলাফলে গিয়ে চান্সের কোন অবকাশ নেই।

শেষ ফলাফল অনিবার্য ভাবে এলেও মাঝখানে কিছু জিনিসের জবাব কিন্তু এতে মিলবেনা। যেমন দেখলাম কোন্‌ ইলেকট্রন কোথায় যাবে তার নিশ্চয়তা ছিলনা।

তেমনি বিশেষ কোন্ ইলেকট্রনটি 1 নামক ফাটল দিয়ে গেল, না 2 নামক ফাটল দিয়ে গেলো তাও জানতে পারবোনা, যদিও একটি কণিকা হবার কারণে তাকে কোন না কোন্ একটি ফাটলের মধ্য দিয়েই যেতে হয়েছিলো। উভয় বিকল্পের এক সঙ্গে ঘটাটি কোয়ান্টাম তত্ত্বে গাণিতিক কথা, এটি নিশ্চয়ই ইলেকট্রনকে ভাগ করে দুই ফাটলের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়নি। হ্যাঁ 1 নামক ফাটলের ভেতর দিয়ে যাওয়ার একটি প্রকৃত সম্ভাবনা $|C_1|^2$ রয়েছে এমন কথা কেউ বলতে পারেন। কিন্তু সেটি ঠিক হবেনা, কারণ এমন সম্ভাবনা ইলেকট্রনটিকে পর্দায় অন্ধকার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার মত উদ্ভট ঘটনাও ঘটাতে পারে। কাজেই এখানে একক ভাবে $|C_1|^2$ বা $|C_2|^2$ এর সম্ভাবনাটি দেয়ার উপায় নেই– শুধু উভয়ের মিলিত রূপ $|C_1 + C_2|^2$ এর সম্ভাবনাটিই দেয়া যাবে– যতক্ষণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভেতর আছি ইলেকট্রন উভয় ফাটলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এটি মনে করাটাই বিধান। এই দিকটিই কোয়ান্টাম তত্ত্বের অদ্ভুত রূপ।

শ্রোয়েডিঙ্গারের বেড়াল:

ম্যাক্স বর্নের ব্যাখ্যা বস্তু তরঙ্গকে বিমূর্ত সম্ভাবনার তরঙ্গ হিসেবে দেখিয়েছে। এর ফলে কণিকা নিজে তার কণিকা-সত্ত্বাকে রক্ষা করতে পেরেছে, যা ব্যাপারটিকে এক দিক থেকে বেশ ছিমছাম রেখেছে। অন্যদিকে কণিকা পর্যায়ে কিসের জন্য কী হওয়া উচিত সেই কার্য-কারণ সম্পর্কটি বিসর্জন দিয়ে এবং শুধু সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে এই ব্যাখ্যা অনেকের অতৃপ্তির কারণও ঘটিয়েছে। যদিও বিজ্ঞানীদের কাছে এর কোন সত্যিকার বিকল্প তখনো ছিলনা, পরেও খুঁজে পাওয়া যায়নি, এই অতৃপ্তি কিন্তু তাঁদের পিছু ছাড়েনি। এই অতৃপ্তি যে সবচেয়ে বেশি ছিল শ্রোয়েডিঙ্গারের নিজের সেটি আগেই দেখেছি– যাঁর সমীকরণ ও তরঙ্গ-ফাংশান এর অনেকখানি সাফল্য সম্ভব করেছে। একই মনোভাব ছিল কোয়ান্টাম তত্ত্বের আরেকজন সৃষ্টিকার আইনস্টাইনেরও।

শ্রোয়োডিঙ্গার ম্যাক্স বর্নের ব্যাখ্যাকে কৌতুকপ্রদ ভাবে সমালোচনা করার জন্য কাল্পনিক একটি এক্সপেরিমেন্টের আকারে একটি প্যারাডক্স বা কূটাভাসকে হাজির করেছিলেন। স্বাভাবিক যুক্তিতে উদ্ভট প্রতিপন্ন করে কোন বক্তব্যের মধ্যে অযৌক্তিকতাগুলো দেখিয়ে দেয়াকে প্যারাডক্স বলা যায়। পরে শ্রোয়েডিঙ্গারের কথিত এই প্যারাডক্সটি 'শ্রোয়েডিঙ্গারের বেড়াল নামে এত বিখ্যাত হয়েছে যে সাধারণ মানুষের অনেক কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এর আলোকে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছেন।

ওই কল্পিত এক্সপেরিমেন্টে শ্রোয়েডিঙ্গার একটি বেড়ালকে একটি বদ্ধ বাক্সে এমন ভাবে রাখলেন যাতে তার সেখানে বেঁচে থাকতে এমনিতে কোন অসুবিধা না হয়, কিন্তু বাইরে থেকে তাকে দেখা যায়না। সেই একই বাক্সে রাখা হলো একটি তেজষ্ক্রিয় পদার্থ। তেজষ্ক্রিয় পদার্থের গুণ হলো তার থেকে এক একটি চার্জযুক্ত কণিকা (আলফা কণিকা, বিটা কণিকা) হঠাৎ হঠাৎ নির্গত হয়, কিন্তু কখন, কত পরে আরেকটা নির্গত হবে তা চান্সের ব্যাপারে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (ধরা যাক এক ঘন্টা) এটি আদৌ নির্গত হবে কি হবেনা তা আগে থেকে বলা অসম্ভব। যদি সত্যিই এর মধ্যে একটি কণা নির্গত হয় তা হলে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যে ওই কণা তার উদ্ঘাটক যন্ত্রে উদ্ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বৈদ্যুতিক কারেন্ট মোটর ঘুরিয়ে একটি হাতুড়ি ফেলে কাচের একটি শিশি ভেঙ্গে ফেলবে, যেই শিশিতে রাখা আছে বিষাক্ত গ্যাস। এই গ্যাস ছড়িয়ে পড়লে বেড়ালের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটবে।

এখন শ্রোয়েডিঙ্গারের প্রশ্ন হলো এক ঘন্টা পর বেড়ালটিকে জীবিত অবস্থায় আছে মনে করবো, না মরে গেছে মনে করবো। কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক বিবেচনায় বর্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি ভাবি তা হলে এখানে পুরো সিস্টেমটির দুটি বিকল্প অবস্থা রয়েছে। একটিতে তেজষ্ক্রিয় পদার্থ থেকে কণিকা নির্গত হয়নি, শিশিও ভাঙ্গেনি, কাজেই বেড়াল বেঁচে আছে। অন্যটিতে কণিকা নির্গত হয়েছে, শিশি ভেঙ্গেছে, গ্যাসের বিষক্রিয়ায় বেড়াল মরে গেছে। এই তত্ত্ব শুধু দেবে এই উভয় অবস্থার উপরিপাতনের ফলে সৃষ্ট তরঙ্গ-ফাংশান যা একটি মিশ্র অবস্থা। এখান থেকে বাঁচা বা মরার প্রকৃত সম্ভাবনা যা নির্ণিত হবে তাও একটি মিশ্র জিনিস– প্রত্যেকটির সম্ভাবনা দেবে বটে কিন্তু সত্যিই বাক্স খুল্লে কী দেখতে পাব সে সম্পর্কে বল্তে পারবেনা। কাজেই যতক্ষণ বাক্স খুলে না দেখবো, অর্থাৎ বাস্তবে পরিমাপ না করবো, ততক্ষণ কোয়ান্টাম জগতে থেকে আমাদেরকে বল্তে হবে যে বেড়ালটি জীবিত অবস্থায় থাকা আর মৃত অবস্থায় থাকা উভয় অবস্থার একটি উপরিপাতিত অবস্থায় আছে! ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষেত্রে ওরকম উপরিপাতিত অবস্থায় থাকাটি আমাদেরকে চম্কে নাও যদি দেয়, এভাবে বেড়ালের মরা-বাঁচার ক্ষেত্রে এমনটি চম্কে দেয়াটাই স্বাভাবিক– এরও উৎপত্তি ক্ষুদ্র কণিকার চান্সে নির্গত হবার মধ্যে। এরপর সত্যি সত্যি যখন বাক্স খুলে দেখবো (পরিমাপ করবো) তখন কিন্তু ওই সব কিছু চুপসে যাবে, ওই চান্সে ঘটা, উপরিপতিত অবস্থায় থাকা– সব কিছু! তখন হয় বেড়ালকে বেঁচে থাকতে দেখবো, নয় মরে গেছে দেখবো, মাঝামাঝি কিছু নয়। তা হলে ওই আগের কথাগুলোর মানে কী? ওগুলো উদ্ভট নয় কি? এখানেই সেই প্যারাডক্স।

শ্রোয়েডিঙ্গার এভাবে এই প্যারাডক্সের মাধ্যমে বলার চেষ্টা করেছেন যে সম্ভাবনা-তরঙ্গ, উপরিপাতিত অবস্থা, চুপ্‌সে যাওয়া এসব কথার মধ্যে এমন কিছু আছে যা মান্‌তে অন্তর সায় দেয় না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে তাঁকে চিরায়ত চিন্তার দিকে একটু রক্ষণশীলই বল্‌তে হবে। কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞানী ওর মধ্যে উদ্ভট কিছু না দেখে তাকে প্রকৃতির নিয়ম হিসেবেই মেনে নিয়েছেন। ম্যাক্স বর্ন তাঁর ব্যাখ্যাটি দেয়ার পর প্রায় শত বর্ষ হতে চল্‌লো, এর মধ্যে সেটিই কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যাখ্যা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং বিজ্ঞানের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে চলেছে।

অনিশ্চিত এ জগতের ফলাফল নিশ্চিত

অনিশ্চয়তার অর্থ

পরিচিত বিজ্ঞানে সব কিছুই নিশ্চিত :

ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি চিরায়ত বিজ্ঞানে কিছুই অনিশ্চিত হতে পারেনা, অন্তত নীতিগতভাবে তা হতে পারেনা। বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত নিয়মগুলো প্রয়োগ করে হিসেব করে বর্তমান অবস্থা থেকে ভবিষ্যতের যে কোন সময়ের অবস্থা হিসেব করে বের করে ফেলা সম্ভব। সেই হিসেব যতটা নিশ্চিত করতে চাই ততটাই নিশ্চিত করা সম্ভব। আর পরিমাপ করে কোন কিছু জানার সময় তাতে যদি কিছু অনিশ্চয়তা থেকে যায় তাহলে সেটি হবে আমাদের বর্তমান পরিমাপ-প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতা, বিজ্ঞানের নয়। প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে সেই অনিশ্চয়তা দূর হয়ে যাবে– যেমন আরো ভাল অণুবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবনের মাধ্যমে। কাজেই কতখানি নিশ্চয়তার সঙ্গে কোন কিছু জানতে পারবো তার কোন সীমা চিরায়ত বিজ্ঞান ঠিক করে দেয়না– নীতিগত ভাবে যতখানি চাই তত খানিই নিশ্চয়তা পেতে পারি। অবশ্য ইতোমধ্যেই দেখেছি কিছু বাস্তব সীমাবদ্ধতার কারণে কখনো কখনো সেটি সম্ভব হয়না– যেমন বদ্ধ পাত্রে রাখা গ্যাসের অণুর সংখ্যা অত্যন্ত বড় বলে তার প্রত্যেকটির হিসেব নেয়া বাস্তবে অসম্ভব। কিন্তু তাও নীতিগত ভাবে অসম্ভব নয়।

কোন কিছু পরিমাপ করতে চাইলে প্রায়শ একটি সমস্যা দেখা দেয়– যার সাহায্যে পরিমাপটি করছি তা যাকে পরিমাপ করছি তার তুলনায় বেঢক বড় কিংবা শক্তিশালী কিনা। সেক্ষেত্রে পরিমাপটিতে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকে। যদি এমন হয় যে আঙ্গুল বুলিয়ে বা কোন কাঠি দিয়ে স্পর্শ করে করে ছোট্ট জিনিসের ওপর পরিমাপটি করতে হবে তাহলে যাকে পরিমাপ করছি তাকে মোটা আঙ্গুলের বা কাঠির দ্বারা আলাদা করে ওটি ঠিক কোথায় আছে বুঝে নিতে পারবো তো, আবার এই আঙ্গুল বা কাঠির গুতায় সেটিকে একটু এদিক-ওদিক সরিয়ে ফেলবো না তো? তেমনটি যদি হয় তা হলে পরিমাপে কিছুটা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে যাকে দিয়ে মাপছি তার কারণেই। মাপতে গিয়েই মাপের অনিশ্চয়তাটি ওখানে সৃষ্টি করলাম। এরকম ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত পরিমাপের জন্য বুলিয়ে দেখতে ব্যবহৃত জিনিসটিকে আরো সরু করে এবং তার গুতো দেয়ার শক্তিকে আরো কমিয়ে এনে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা করি– অনেকটা ছোট মোবাইল ফোনের ছোট বোতামগুলো টেপার জন্য আঙ্গুলের বদলে স্টাইলাস ব্যবহারের

মত। এভাবে প্রযুক্তিকে বদলিয়ে আমরা পরিমাপকে যতটা বেশি নিশ্চিত করতে চাই ততটাই করা সম্ভব। ব্যাপারটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন আমরা কাঠির মত যান্ত্রিক কিছু নয় বরং আলোর মত আরো সূক্ষ্ম জিনিস ব্যবহার করে অতি ক্ষুদ্র জিনিসের কোন পরিমাপ করি– যেমন অণুবীক্ষণের মধ্যে। আলোরও একটি শক্তি আছে, এটিও যখন কোন ক্ষুদ্র জিনিসের ওপর পড়ে তার থেকে বিক্ষিপ্ত হয়, এবং ওসময় জিনিসটিকে নাড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে আলো ফেলে দেখার মত সাধারণ ঘটনাতেই জিনিসগুলোর অবস্থানের পরিমাপে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে। এর সমাধানও ওই কাঠির বেলায় যা করেছিলাম তেমনি করা যায়– আলোকে আরো সূক্ষ্ম রশ্মিতে ফেলে, এবং আলোর তীব্রতাকে আরো কমিয়ে। এভাবে যত নিশ্চয়তা আমরা চাই সেই অনুযায়ী আলোকে কমিয়ে আনলেই হলো। নীতিগত ভাবে আলোকে এভাবে কতখানি দুর্বল করা যাবে তার কোন সীমা চিরায়ত বিজ্ঞানে নেই। তবে এক পর্যায়ে গিয়ে দুর্বল আলো দিয়ে পরিমাপে অসুবিধা হতে পারে; সেটি প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার ব্যাপার। তাছাড়া এর ফলে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হবে তাত্ত্বিক ভাবে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায়। কী রকম তীব্রতার আলো দেখার জিনিসটিকে কোন্ দিকে কতখানি সরাবে তা চিরায়ত বিজ্ঞানের নিয়মের দ্বারা নিখুঁতভাবে হিসেব করে নির্ণয় করা যায়। সেটি দিয়ে পরিমাপে পাওয়া ফলাফলকে শুদ্ধ করে নেয়াও সব সময় নীতিগত ভাবে সম্ভব। অর্থাৎ চিরায়ত বিজ্ঞানে সব কিছু নিশ্চিত।

কোয়ান্টাম তত্ত্বে পরিমাপের উভয় সংকটঃ

কোয়ান্টাম তত্ত্বের কারবার হলো অতি ক্ষুদ্র জিনিস নিয়ে– ফোটন, ইলেকট্রন, এটম ইত্যাদি। এ তত্ত্বের মধ্যে যখনই এসবের অবস্থা মাপার কথা কল্পনা করা হয় তখনও ওপরে উল্লেখিত ওই সমস্যাগুলোর প্রশ্ন ওঠে। এই ক্ষেত্রে মাপার জন্য কোন না কোন ধরণের আলোর ব্যবস্থা না করে উপায় নেই, তবে সেই 'আলোর' তরঙ্গ-দৈর্ঘ হতে হবে যা মাপছি ওই ক্ষুদ্র জিনিসগুলোর থেকেও ক্ষুদ্র। সে রকম ক্ষুদ্র অবয়ব না হলে এটি ক্ষুদ্র জিনিসগুলোর অবস্থান ঠিক ভাবে নির্দেশিত করবে কী ভাবে? বোঝাই যাচ্ছে এমন কোন অণুবীক্ষণের মাধ্যমে এই মাপার কাজটি বিবেচনা করতে হবে, সেই অণুবীক্ষণে আমাদের সাধারণ দৃশ্যমান আলো ব্যবহার করা যাবেনা, কারণ তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ ওই দেখার জিনিসগুলোর থেকে অনেক বড়। আমাদেরকে আরো অনেক ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘের বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ গামা আলোর অণুবীক্ষণ কল্পনা করে নিতে হবে এর জন্য। এমনি ভাবে মনে করা যাক এরকম একটি গামা আলোর অণুবীক্ষণ দিয়ে আমরা একটি

ইলেকট্রনের অবস্থান মাপার চেষ্টা করছি। এই গামা আলো ইলেকট্রনটিতে বিক্ষিপ্ত হয়ে গামা আলোর উপযুক্ত লেন্স-সিস্টেমের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনটির একটি বড় করে দেখানো ইমেজকে আমাদের চোখে পরিমাপের জন্য হাজির করছে।

অণুবীক্ষণের ক্ষেত্রে একটি জানা নিয়ম রয়েছে যে এতে ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ যত ছোট হবে (অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সি যত বড় হবে), ততই ওই অণুবীক্ষণে দেখা জিনিসের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর অংশকে ততই স্পষ্ট করে আলাদা বোঝা যাবে এবং মাপা যাবে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি যে যা বুলিয়ে বা বিক্ষিপ্ত করে জিনিসটিকে দেখবো তা দেখার জিনিসটির থেকে যত ছোট হবে ততই সূক্ষ্ম ভাবে কাজটি করতে পারবো। এ জন্যইতো ইলেকট্রনটিকে দেখার জন্য আমরা কাল্পনিক ভাবে হলেও অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘের গামা আলোর প্রয়োজন অনুভব করেছি। আর সেটি যদি যথেষ্ট ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ করতে পারি তা হলে ইলেকট্রনটিকে হয়তো দেখতে পারবো, এবং এর অবস্থানটিকে প্রায় নিশ্চিত করেই মাপ্তে পারবো।

কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যাটি দেখা দেবে ইলেকট্রনটির বেগ মাপার ক্ষেত্রে। অবস্থান ও বেগ উভয়টিই নিশ্চিত করে না মাপ্তে পারলে তো পরিমাপ সম্পূর্ণ হবে না। গামা আলোর অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ-দৈর্ঘ মানে হলো এর অতি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি। যেহেতু আমরা এখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের আওতায় আছি এই গামা আলোর কণিকা যে ফোটন উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির জন্য তার শক্তি হবে অত্যন্ত বেশি– ফোটনের শক্তির সঙ্গে তার ফ্রিকোয়েন্সির সম্পর্ক $E=hf$ কে তো আমরা ভুলিনি। কাজেই এই উচ্চ শক্তির গামা ফোটন যখন ইলেকট্রনটিকে গিয়ে আঘাত করবে এবং তার থেকে বিক্ষিপ্ত হবে, সেটি হবে সেই ম্যাক্স বর্নের দুই কণিকার সংঘর্ষের মত ব্যাপার। এর ফলে ইলেকট্রনের নিজেরও নানা দিকে নানা বেগে অনিশ্চিত ভাবে বিক্ষিপ্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়– নিশ্চিত করে কোন্দিকে কোন্ বেগে করবে তা জানা যাবেনা; শুধু প্রত্যেক রকম হবার সম্ভাবনাই জানা যাবে। এ অবস্থায় ইলেকট্রনের ভরবেগ মাপলে তাতে যথেষ্ট অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হবে। কাজেই একটি উভয়-সংকটের সৃষ্টি হলো। ইলেকট্রনটির অবস্থান যত নিশ্চিত করে মাপতে চাইবো গামা আলোর ফ্রিকোয়েন্সিকে তত বাড়াতে হবে, কিন্তু সেটি যত বাড়াবো তার ফোটনের ধাক্কায় ইলেকট্রনটি তত বেশি বিক্ষিপ্ত হবে বলে ভরবেগ তত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। উল্টো ভাবে ভরবেগ নিশ্চিত করার জন্য যদি গামা আলোর ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দিই, তা হলে ওই আলোর বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘের কারণে ইলেকট্রনের অবস্থানটি আর সঠিক বোঝা যাবেনা, অবস্থানের মাপ তত অনিশ্চিত

হয়ে পড়বে। বোঝা যাচ্ছে এক্ষেত্রে অবস্থান ও ভরবেগ উভয়কে নিশ্চিত করা কিছুতেই সম্ভব নয়। যেমন অবস্থানকে যদি একেবারে নিশ্চিত করতে চাই তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি এত বাড়াতে হবে যে ভরবেগ তখন যে কোন কিছু হতে পারে, সেটি প্রায় অসীমভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। আর উল্‌টো ভরবেগকে যদি একেবারেই নিশ্চিত করতে চাই তখন ফ্রিকোয়েন্সি এত কমাতে হবে যে অবস্থান সম্পর্কে কোন খবরই আর পাওয়া যাবেনা, ইলেকট্রন যে কোন জায়গায় থাকতে পারে, এমনই অনিশ্চিত হয়ে পড়বে তা।

এতে একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। এই যে অবস্থান আর ভরবেগের অনিশ্চয়তা এখানে প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার কোন ব্যাপার নেই। আমরা তো কল্পনায় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর যে কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘের গামা আলো পাওয়ার কথা বলেছি এবং তা দিয়ে যথেষ্ট স্পষ্ট ইমেজ সৃষ্টির কথা ধরে নিয়েছি; কিন্তু যাই করিনা কেন অনিশ্চয়তা অনিবার্য ভাবে আসছে, একটিকে বেশি নিশ্চিত করতে চাইলে অন্যটি অনিবার্যভাবে নিশ্চয়তা হারাচ্ছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের নীতির মধ্যেই এই অনিবার্যতা অবশ্যম্ভাবী; এটি নীতিগত অনিশ্চয়তা, প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এই অবস্থার পরিবর্তনের কোন সুযোগ নেই। চিরায়ত বিজ্ঞানে এরকম নীতিগত অনিশ্চয়তা নেই, তা আমরা দেখেছি।

অনিশ্চয়তার নীতি

ন্যূনতম অনিশ্চয়তার পরিমাণঃ

জার্মান বিজ্ঞানী হাইজেনবার্গ কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রধান সৃষ্টিকারদের একজন। কোয়ান্টাম তত্ত্বে এই অনিশ্চয়তার বিষয়টিকে তিনিই একটি মাপের মধ্যে নিয়ে দেখিয়েছেন যে অনিশ্চয়তার মাত্রাটি প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক h এর দ্বারা নির্দিষ্ট। এতে দেখা যায় যে h এর মানের মত ক্ষুদ্র পর্যায়ে পৌঁছলে কণিকার অবস্থানে ও বেগে আর এক সঙ্গে নিশ্চয়তা আশা করতে পারিনা, তেমনি আরো কিছু গুণাগুনের ক্ষেত্রেও পারিনা। এই যে অনিশ্চয়তাটি ওই পর্যায়ে গিয়ে দেখা দেয় তার ফলে প্রকৃতিতে অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, যা আগে আমরা কখনো কল্পনাও করতে পারিনি। h ধ্রুবকটিকে জড়িত করে হাইজেনবার্গ বিভিন্ন অনিশ্চয়তার মধ্যে যে সম্পর্কটি আবিষ্কার করলেন তাকে বলা হয় "হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি"। যেই কাল্পনিক গামা আলোর অণুবীক্ষণের মাধ্যমে আমরা একটি ইলেকট্রনের ওপর পরিমাপের চেষ্টা করছিলাম তার কথায় ফিরে গেলে এই নীতিটি বুঝতে সুবিধা হবে।

অণুবীক্ষণে ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যে কোন আরোর তরঙ্গ যাওয়ার সময় আলোর (বা যে কোন তরঙ্গের) একটি বৈশিষ্ট সেখানে দেখা দেয় যাকে বলা হয় ডিফ্র্যাকশন। এটি আমাদের পূর্বপরিচিত তরঙ্গের ইন্টারফেরেন্স বা ভাঙ্গাগড়ার ব্যাপারের মত– এক্ষেত্রে দুটি ফাটলের মধ্য দিয়ে না গিয়েই নিজের ওপর নিজে উপরিপাতিত হয়ে যা ঘটছে। এখানেও পর্দার মত কিছুর ওপর পড়লে ওই আলোর ফোটার কিনারায় বৃত্তাকারে পর পর আলো অন্ধকারের রিং সৃষ্টি হয়– অনেকটা ওই দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের ঝালরের মত। গামা অণুবীক্ষণে ইলেকট্রনের ওপর আলো পড়ে সেখানে যখন এই রিংগুলো সৃষ্টি হয় তখন তা ইলেকট্রনের সঠিক অবস্থান নির্ণয়ে একটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ইলেকট্রনটির অবস্থান নিশ্চিত করে মাপার জন্য আমাদেরকে অণুবীক্ষণে তার ইমেজের দৈর্ঘ মাপতে হয়। কিন্তু ডিফ্র্যাকশান সৃষ্টির নিয়মটি এমন যে আলোটির তরঙ্গ-দৈর্ঘের সমান পরিমাণ একটি অনিবার্য অনিশ্চয়তা ওই আলো-অন্ধকারের রিঙের কারণে ওই দৈর্ঘ মাপার ক্ষেত্রে তৈরি হয়। অন্য কোনদিক থেকে কোন অসুবিধা না থাকলেও এই ন্যূনতম অনিশ্চয়তাটি অবস্থান নির্ণয়ে থেকেই যাবে। কাজেই অবস্থানের অনিশ্চয়তাকে এর থেকে সাধারণত বড় হতে হবে, বড় জোর সমান হতে হবে। একে লিখতে পারিঃ অবস্থানের অনিশ্চয়তা $\geq \lambda$, যেখানে λ আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ।

ব্যাপারটিকে সরল রাখার জন্য আমরা যদি স্থানকে শুধু এক মাত্রায় বিবেচনা করি, তা হলে ইলেকট্রনের অবস্থান জানতে শুধু x এর দিকে এটি কোথায় আছে তা নির্ণয় করতে হবে; অর্থাৎ মাপতে হবে শুধু x কে। এতে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিবে রেওয়াজ মত তাকে Δx বলতে পারি। তার মানে মাপার সময় x টি Δx পরিমাণ বেশিও হতে পারে, অথবা Δx পরিমাণ কমও হতে পারে। তাহলে ওপরের দেখানো অনিশ্চয়তাটির সম্পর্কটিকে আরো সংক্ষেপে লিখতে পারিঃ

$\Delta x \geq \lambda$

এবার দেখা যাক এই গামা আলোর ফোটনের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে মাপতে চাওয়া ইলেকট্রনটি কত জোরে ধাক্কা খাবে সেটি। এটি নির্ভর করবে আলোর ফোটনের ভরবেগের ওপর। এই ভরবেগটি আমরা দ্যব্রগলির নিয়ম থেকে পাই। যা কিনাঃ

ফোটনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ $= \frac{h}{\text{ফোটনের ভরবেগ}}$, কাজেই ফোটনের ভরবেগ $= \frac{h}{\lambda}$

যেখানে λ ফোটনের তরঙ্গ-দৈর্ঘ। এই ভরবেগটিই ইলেকট্রনটিকে নাড়িয়ে দিয়ে তার ভরবেগে ন্যূনতম অনিশ্চয়তার পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অনিশ্চয়তা আরো

বড় হতে পারে, কিন্তু এই ন্যূনতমটির কম কখনো নয়। ইলেকট্রনের ভরবেগকে যদি আমরা রেওয়াজ অনুযায়ী p বলি, এবং তার অনিশ্চয়তাকে Δp বলি তাহলে

$$\Delta p \geq \frac{h}{\lambda}$$

তাহলে ইলেকট্রনের অবস্থানের অনিশ্চয়তা (Δx) এবং তার ভরবেগের অনিশ্চয়তা (Δp) গুণ করলে

$$\Delta x . \Delta p \geq \lambda . \frac{h}{\lambda}$$

অর্থাৎ $\Delta x . \Delta p \geq h$

এটিই হাইজেনবার্গের বিখ্যাত অনিশ্চয়তার নিয়ম। এটি বলছে একটি কণিকার অবস্থান এবং ভরবেগ মাপ্‌তে গেলে উভয়টিতে মাপের অনিশ্চয়তা থাকবে এবং এই দুই অনিশ্চয়তার গুণফলকে অন্তত h এর সমান হতে হবে। এই h অনিশ্চয়তার একটি ন্যূনতম পর্যায় ঠিক করে দিয়েছে– একেবারে নীতিগত ভাবেই অনিশ্চয়তাকে এর চেয়ে কমে আনা সম্ভব নয়। যদি এর মধ্যে যে কোন একটিকে তার চেয়ে বেশি নিশ্চিত করতে চাই তার অনিশ্চয়তাটি শূন্যের কাছাকাছি চলে যাবে বলে অন্যটি প্রায় অসীমের কাছে চলে যাবে– যা একটি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যেমন অবস্থান একেবারে নিশ্চিত হবার মানে হলো Δxটি 0 শূন্য হওয়া। সেক্ষেত্রে Δp অসীমে পরিণত হয়; অর্থাৎ ভরবেগের অনিশ্চয়তা এমন কোথাও গিয়ে ঠেকবে যে কণিকাটি যে কোন অসম্ভব রকম বেগে যে কোন জায়গায় চলে যেতে পারে তার কোন সীমা-পরিসীমা থাকবেনা। অন্যদিকে ভরবেগকে যদি একেবারে নিশ্চিত ধরে নিই, তা হলে $\Delta p = 0$ হওয়াতে Δx অসীমে পরিণত হবে। অর্থাৎ তখন কণিকাটির অবস্থান এত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে যে সেটি বিশ্বের স্থানের মধ্যে যে কোন জায়গায় থাকতে পারে, সেটিও একটি অসম্ভব ব্যাপার। এগুলো অসম্ভব কিছু চরম অবস্থা। সাধারণত যা হবে তা হলো অবস্থান ও ভরবেগ উভয়ের মধ্যে h এর পর্যায়ের কিছু অনিশ্চয়তা অবশ্যম্ভাবী ভাবে থাকবে, একটির অনিশ্চয়তা কমলে অন্যটির অনিশ্চয়তা বাড়বে। এখানে অবস্থান ও ভরবেগ এই জোড়া গুণের ক্ষেত্রে এটি হয়েছে, অন্য রকম জোড়া গুণের ক্ষেত্রেও যে এটি হয় তা কিছু পরে আমরা দেখবো। এই সব অনিশ্চয়তাটি h এর পর্যায়ে গিয়ে প্রকট হওয়ার কারণে, ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র কণিকা বা আরো কিছু বড় অণু-পরমাণুর ক্ষেত্রেই এই অনিশ্চয়তা দেখা যায়। h এর থেকে অনেক বড় কিছুর জন্য এর প্রশ্ন ওঠেনা – যেমন ধূলাবালির জন্য নয়,

ক্রিকেট বলের জন্য নয়, পৃথিবী বা অন্য গ্রহের জন্যও নয়। তবে ওই ক্ষুদ্র কণিকার অনিশ্চয়তা থেকে অনেক বড় বড় ঘটনার সৃষ্টি হওয়ার পেছনেও তার হাত রয়েছে।

অবস্থান-ভরবেগ অনিশ্চয়তার কিছু অদ্ভুত ফলঃ

এর আগে কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিচারে আমরা বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখেছি। এরকম একটি ঘটনায় অনিশ্চয়তার নীতিকে কারণ হিসেবে দেখাতে পেরেছি– তা হলো তরঙ্গ প্যাকেট ধীরে ধীরে বিস্তৃত হয়ে বিলীন হবার ঘটনা। ইতোমধ্যে সাক্ষাত পাওয়া আরো কিছু অদ্ভুত ঘটনাকে আমরা এই অনিশ্চয়তা দিয়েই ব্যাখ্যা করতে পারি।

অনিশ্চয়তার একটি ফল বড় খুবই কৌতুকপ্রদ মনে হতে পারে। ধরা যাক আমরা একটি ইলেকট্রনকে ক্ষুদ্র একটি বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চাচ্ছি, আর এই বাক্সটিকে ইচ্ছেমত যত ক্ষুদ্র করতে চাই তত ক্ষুদ্র করতে পারি। দেখা যাবে ইলেকট্রনের সাইজের কাছাকাছি গিয়ে বাক্সটিকে আর যত ক্ষুদ্র করবো এর ভেতর ইলেকট্রনের অবস্থানটি তত বেশি করে নিশ্চিত হয়ে যাবে। এভাবে অবস্থানের অনিশ্চয়তা একেবারে কমে গিয়ে শূন্যের যত কাছাকাছি যাবে ততই এর ভরবেগের অনিশ্চয়তা অসম্ভব ভাবে বেড়ে বাক্সের ভেতরতো দারুণ ছুটাছুটি তো করবেই বাক্স থেকে বের হবে কোথায় কোন্ বেগে যে ছুটে যাবে তার ইয়ত্তা থাকবেনা– এজন্য যে তাকে যে বাক্স ভেঙ্গে বা ফুটো করে বের হতে হবে তাও নয়; তবে সব জায়গায় তার ছুটে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে এবং তাই সে যাবে, বাক্স এতে কোন বাধা নয়। ইলেকট্রনকে এক বিন্দুতে আবদ্ধ করে রাখার ফলে সৃষ্টি হওয়া এই ব্যাপারগুলো অসম্ভব ব্যাপার বলেই ইলেকট্রনটিকে ওভাবে এক বিন্দুতে আবদ্ধ করে তার অবস্থানকে কখনোই নিশ্চিত করা যাবেনা– ইলেকট্রন বিস্তৃত হয়েই থাকবে, এক জায়গায় থাকবেনা। কোয়ান্টাম জগতে ওরকম কোন কণিকাই একটি সুনির্দিষ্ট বিন্দুতে আছে এমন বলা যায় না।

এখন আরো বাস্তব পরিস্থিতিতে ওই ব্যাপারটিকেই দেখা যাক্। ইলেকট্রনকে নিয়ে দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্টের কথাটি বিবেচনা করি। উৎস থকে একটি একটি ইলেকট্রন যখন ফাটল দুটির কাছে যায় তখন কণিকা হিসেবে তার ফাটল দুটির যে কোন একটির মধ্য দিয়েই যাওয়ার কথা। কিন্তু ইলেকট্রন নিয়ে এই এক্সপেরিমেন্টটি করতে যে ফাটলের ব্যবস্থা করতে হয় তাকে অত্যন্ত সরু হতে হয় প্রায় ইলেকট্রনের কাছাকাছি পর্যায়ের। কাজেই একটি ফাটলের মধ্য দিয়ে যদি ইলেকট্রনকে যেতে হয় ফাটলের মধ্যে থাকা কালে তার অবস্থান অত্যন্ত

বেশি নিশ্চিত হয়ে যেতে হয়, যা ওই ফাটলের প্রশস্ততার দ্বারা নিশ্চিত। কাজেই অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী ওপরের বর্ণনার মত তার ভরবেগ অত্যন্ত অনিশ্চিত হয়ে সাংঘাতিক ভাবে যে কোন দিকে যে কোন বেগে ছুটে যাওয়ার মত হবে– সেটি অসম্ভব ব্যাপার। তাই ইলেকট্রনটি আদৌ কোন একটি ফাটলের মধ্য দিয়ে যেতে পারবেনা– ওই অনিশ্চয়তার নীতির কারণে। আগেও আমরা দুই-ফাটল এক্সপেরিমেন্টের যে কোয়ান্টাম-তাত্ত্বিক বর্ণনা পেয়েছি তাতেও দেখেছি যে ইলেকট্রনের কোন একটি ফাটলের মধ্য দিয়ে যাওয়াটিকে আমরা বাস্তবে অনুসরণ করতে পারবোনা, যা পারবো তা হলো এর সম্ভাবনার তরঙ্গ দুই ফাটলের মধ্য দিয়েই একযোগে পার হয়ে সেখানে রাখা পর্দায় ইলেকট্রন চলে গেছে এমন অবস্থা ধরে নিতে। শুধু তাই নয় দুই ফাটলের ভেতর দিয়ে যাওয়া তরঙ্গ উপরিপাতিত হয়ে ইলেকট্রন পর্দায় কোথায় যাওয়ার সম্ভাবনা কত তাও ঠিক করে দেবে ওই বর্ণনা। কিন্তু ইলেকট্রন কণিকাকে ফাটল দিয়ে যেতে 'দেখা' যাবেনা। অনিশ্চয়তার নীতিও ঠিক করে দিয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বে বর্ণনাটি এভাবেই দিতে হবে; ইলেকট্রনের গতিবিধির যাবতীয় হিসেব-নিকেশ এভাবেই করতে হবে, ওই সম্ভাবনার তরঙ্গের নিরিখে।

তবে আরো একটি এক্সপেরিমেন্ট আমরা কল্পনা করতে পারি। ওই দুই ফাটলের কোন একটিতে একটি ইলেকট্রন কণিকা উদ্ঘাটক যন্ত্র রাখায় ব্যবস্থা করলাম– কাজটি যদিও বাস্তবে সহজ হবেনা কল্পনা করতে তো বাধা নেই। এরকম উদ্ঘাটন যন্ত্রে সাধারণত একটি ইলেকট্রন কণিকা ভেতরে গিয়ে তা দেখা যাওয়া বা শোনা যাওয়ার মত কোন প্রক্রিয়া সৃষ্টি করে। তখন আমরা যন্ত্রের ডায়াল দেখে বা ক্লিক্ শব্দ শুনে বুঝতে পারি এ একটি ইলেকট্রন ওখানে রয়েছে। যদি ইলেকট্রন কণিকা ওই ফাটলটি দিয়ে পার হয় তা হলে বাস্তবে ওই উদ্ঘাটন যন্ত্রে এভাবে তা ধরা পড়বে। মনে করি তেমনটিই ঘটলো। তখন তো বলতেই হবে যে ইলেকট্রনটি এই ফাটলের ভেতর দিয়েই যাচ্ছে; তাহলে ওই কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক বর্ণনার কী হবে? এক্ষেত্রে বাস্তব পরিমাপের পর যা হবার কথা তাই হবে– কোয়ান্টাম বর্ণনাটি 'চুপসে যাবে', কোন অনিশ্চয়তা আর থাকবেনা, উপরিপাতন থাকবেনা, সম্ভাবনার ব্যাপার থাকবেনা; সবই নিশ্চিত বাস্তব ব্যাপারে পরিণত হয়ে, চিরায়ত বিজ্ঞানের মত। সংবেদী পর্দার একটি জায়গায় ইলেকট্রনটিকে দেখে ফেলার পর যেমনটি হয়েছিলো এক্ষেত্রেও তাই হবে। কিন্তু মাপার আগে পর্যন্ত ওই অনিশ্চিত অবস্থাটাই থাকবে।

বোর-সমারফিল্ড এটম মডেলকে আমরা যে সম্ভাবনা-ঘনত্বে কুয়াশার এটম মডেলে পরিণত করেছি তার মধ্যেও অনিশ্চয়তা নীতির হাত দেখা যায়। আগের

বোরের মডেলটিতে ইলেকট্রনকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে থাকতে হয়; ওটি একটি বাস্তব কক্ষপথ যেখানে ইলেকট্রন বাস্তব ভাবেই ঘোরে বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী সেটি সম্ভব নয়। ওভাবে সরু কক্ষপথে থাকতে গেলে ওদিক থেকে ইলেকট্রনের অবস্থান একেবারে নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছে, যা হতে গেলে এর ভরবেগকে অসীমভাবে অনিশ্চিত হয়ে গড়তে হবে– সেটি অসম্ভব। এ কারণে ইলেকট্রনের অবস্থানে অনিশ্চয়তা থাকতেই হয়, এটমের ভেতর নিউক্লিয়াসের চারিধারে সব জায়গায় তার থাকার সম্ভাবনা থাকতে হয়, শুধু কক্ষপথে নয়। আমরা বড় জোর তার সম্ভাবনার কমবেশিটি নির্ণয় করতে পারি– এভাবেই পাই সব জায়গায় তার সম্ভাবনা-ঘনত্ব যা বিভিন্ন ঘনত্বের পাতলা কুয়াশার আকারে প্রকাশ করা যায়। বোর-সমারফিল্ডের কক্ষপথের বদলে এখানে আমরা শুধু খুব বেশি সম্ভাবনা-ঘনত্বের অরবিটালের কথাই বলতে পারি এক একটি জায়গা জুড়ে রয়েছে; সেগুলোই কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক ভাবে এটমের সব গুণাগুন সুন্দর ভাবে দিতে পারে। এও সেই অনিশ্চয়তারই ফল।

সময়-শক্তির অনিশ্চয়তা

সময়ের সঙ্গে শক্তির অনিশ্চয়তার বন্ধনঃ

অনিশ্চয়তার নীতি কোন কণিকার অবস্থান ও ভরবেগের অনিশ্চয়তার মধ্যে যে রকম একটি সম্পর্ক সৃষ্টি করে, তেমনি আবার সময় ও শক্তির অনিশ্চয়তার মধ্যেও একই রকম সম্পর্ক এনে দেয়। এই নীতি অনুযায়ী একটি সিস্টেমের শক্তি নি:সরণের অবস্থাটি যতই একটি ক্ষুদ্র নিশ্চিত জানা সময়ের মধ্যে নির্ণয় করা হবে ও শক্তিটির পরিমাণের অনিশ্চয়তা ততই বেড়ে যায়। আর ওই সময়টি যত অনিশ্চিত হয়, শক্তিটিতে অনিশ্চয়তা তত কমে যায়।

শক্তিকে কণিকা তরঙ্গ হিসেবে ভাবলে ব্যাপারটিকে এক ভাবে বোঝা যায়। তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি মানে হলো একটি নির্দিষ্ট সময়ে তরঙ্গের সংখ্যা যত দীর্ঘ সময় ধরে, যত বেশি সংখ্যক তরঙ্গের ওপর গড় করে ফ্রিকোয়েন্সি নির্ণয় করা হবে তাতে সময়ের অনিশ্চয়তা বাড়বে বটে কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সিটি বেশি নিশ্চিত হয়ে আসবে। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে $E=hf$ অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি বেশি নিশ্চিত হওয়া মানে শক্তি বেশি নিশ্চিত হওয়া। এটমকেই এরকম একটি সিস্টেম হিসেবে বিবেচনা করে তার শক্তি-নি:সরণের প্রক্রিয়াটি দেখা যাক। ভারসাম্যের নিম্নতম শক্তি অবস্থায় থাকা একটি এটম বাড়তি শক্তি লাভ করলে ইলেকট্রন তার স্বাভাবিক নিম্ন অরবিটাল থেকে কোন উচ্চতর অরবিটালে স্থানান্তরিত হয়।

কিন্তু এটি একটি অস্থায়ী অবস্থা, শিগ্‌গির কোন এক সময় এই অস্থায়ী অবস্থা 'অবক্ষয়িত' হয়ে আবার আগের মত স্বাভাবিক অরবিটালে ইলেকট্রনটি ফিরে আসে 'কোয়ান্টাম লাফের' মাধ্যমে; এর ফলে এই দুই অরবিটালের শক্তির পার্থক্য অনুযায়ী ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে বর্ণালীতে একটি নি:সরণ লাইন সৃষ্টি করে। ওখানকার নানা এটমের এই বিশেষ কোয়ান্টাম লাফের অবদান থাকে ওদের সম্মিলিত ভাবে সৃষ্ট এই বর্ণালী লাইনে।

পুরো এই প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে আমরা একটি উপমার সাহায্য নিতে পারি। ধরা যাক সরু করে চাঁছা একটি পেন্সিলকে খাড়া আমার হাতের আঙ্গুলে আগার ওপর দাঁড় করিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। যতক্ষণ হাত একদম না নড়ে, খাড়া পেন্সিলটি ওখানে ভারসাম্যে থাকে ঠিক ওই ক্ষণটুকু ওভাবে রাখা সম্ভব হবে। ভারসাম্য একটু খানিও নষ্ট হলেই পেন্সিলটি ন্যূনতম শক্তি অবস্থায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে এবং পড়ে যাবে। এই ভারসাম্য নষ্ট হবার শক্তি যত অনিশ্চিত হবে ততই ক্ষুদ্র নিশ্চিত সময়ে পেন্সিলটি পড়ে যাবে। এটমের ক্ষেত্রেও উচ্চতর অস্থায়ী শক্তির অবস্থা থেকে নিচের অবস্থায় কোয়ান্টাম লাফের ক্ষেত্রেও এটিই ঘটে। ওই অস্থায়ী অবস্থাটি যদি খুব অল্পক্ষণ টেকে তাহলে ওই ক্ষুদ্র নির্দিষ্ট বেশি নিশ্চিত সময়ের মধ্যে এটি তার নি:সরণ সেরে ফেলে– কিন্তু এই নিচের নতুন ভারসাম্যে যাওয়ার ফলে সৃষ্ট শক্তিতে বেশি অনিশ্চয়তা থাকে। সৃষ্ট বর্ণালী লাইনটিও তাই অতটা সূক্ষ্ম হয়না ফ্রিকোয়েন্সির অনিশ্চয়তার কারণে। আর যদি অবস্থাটি বেশিক্ষণ টেকার পর কোয়ান্টাম লাফ দেয় এবং নি:সরণ ঘটে, তা হলে নি:সরিত ফ্রিকোয়েন্সি হবে দীর্ঘক্ষণের ওপর যা তাত্ত্বিক ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে অনেক সূক্ষ্ম ভাবে মিলে গিয়ে অনেক বেশি নিশ্চিত শক্তি দেবে। এখানেও পুরো হিসেবটি করে দেখা যায় যে হাইজেনবার্গের সেই অনিশ্চয়তার নীতিটিই পাওয়া যায়। সময়ের অনিশ্চয়তা আর শক্তির অনিশ্চয়তার গুণফলকে h দ্বারা নির্দিষ্ট একটি ন্যূনতম সংখ্যায় সীমাবদ্ধ থাকে। উভয়ের গুণফলকে h এর থেকে বড় হতে হয়, অথবা নিদেনপক্ষে h এর সমান হতে হয়, এর থেকে ছোট হওয়া চলেনা। শুধু এটমের ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে নয়, এটি সাধারণ ভাবে যে কোন কণিকার কোয়ান্টাম অবস্থার স্থায়ীত্বের সময়ের অনিশ্চয়তা এবং তার অবক্ষয়ে নি:সারত শক্তির অনিশ্চয়তার গুণফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। একে লেখা যায়ঃ

$\Delta t.\ \Delta E \geq h$, যেখানে Δt সময়ের অনিশ্চয়তা, এবং ΔE শক্তির অনিশ্চয়তা। সময়কে যদি একেবারে নিশ্চিত করতে চাই তা হলে শক্তির অনিশ্চয়তা অসীম ভাবে বেড়ে যাবে, আর শক্তিকে একেবারে নিশ্চিত করতে চাইলে সময়টিই অসীম ভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। সাধারণ যা হয় উভয়কেই একটি ন্যূনতম

অনিশ্চয়তার মধ্যেই থাকতে হয়– যেমন নি:সরণের সময় এবং বর্ণালী নি:সরণ লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি উভয়ের মধ্যে এই অনিশ্চয়তা থাকে।

সময়-শক্তি অনিশ্চয়তার অদ্ভুত ফল:

এদের একটিকে নিশ্চিত করতে গিয়ে যে অন্যটি অসীম ভাবে অনিশ্চিত হবার মত অসম্ভব ব্যাপার ঘটে সেখান থেকেই কিছু অদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন সময়ের অনিশ্চয়তাকে একেবারে শূন্য না করেও শূন্যে খুব কাছাকাছি আছে বলে বিবেচনা করা যায় তখন শক্তির অনিশ্চয়তা অসীমের মত অসম্ভব না হয়েও অত্যন্ত বেশি অনিশ্চিত হবার একটি সত্যিকার সম্ভাবনায় চলে যায়– যেখান থেকে আসে সেই অদ্ভুত ঘটনাগুলো।

চিরায়ত বিজ্ঞানে কোন বস্তুর যে শক্তি থাকে, তার চেয়ে বড় কোন শক্তি-বাধা সেটি কখনোই অতিক্রম করতে পারেনা। যেই কারণে একজন হাই জাম্পার তাঁর সীমিত শক্তি দিয়ে হাই জাম্পে এক শ' মিটার উচ্চ বাধা ডিঙ্গাতে পারেন না সেই একই কারণে চিরায়ত বিজ্ঞানে আমাদের পরিচিত জগতের কোথাও এমনটি সম্ভব নয়, কিন্তু হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতির কারণে কোয়ান্টাম তত্ত্বে তা সম্ভব হয়। যেমন একটি ইলেকট্রনের চলাচলে বৈদ্যুতিক বাধা সৃষ্টি করা যায় তাকে যথেষ্ট বড় উল্টো ভোল্টেজ প্রয়োগ করে তাকে কারেন্টের মধ্যে এগোতে বাধা দেয়া যায়। ইলেকট্রনের গতীয় শক্তি যদি ওই বাধার থেকে কম হয় তা হলে সেটি কারেন্টে যাবার কথা নয়। কিন্তু খুবই অল্প সময়ের খুবই অল্প অনিশ্চয়তার সুযোগে ইলেকট্রনের শক্তি অনেক অনিশ্চিত হয়ে পড়লে ওই বাধা অতিক্রমের মত বড় শক্তিও সেটি ক্ষণিকের জন্য পেয়ে যাওয়ার একটি সত্যিকার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। আর তার ফলে ইলেকট্রনটি তার নিজের শক্তির থেকে অনেক বড় বাধাকেও অতিক্রম করে যেতে পারে। এটি যে কোন ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা কোয়ান্টাম তত্ত্বের আওতায় রয়েছে। এ যেন কোয়ান্টাম জগতের একজন হাইজাম্পার তাঁর সকল শক্তি দিয়ে যতটুকু বাধা পার হতে পারার কথা তার থেকে অনেক গুণ উঁচু বাধা যে হঠাৎ হঠাৎ পার হয়ে যেতে পারছেন কোন এক অলৌকিক ভাবে। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে এটি মোটেই অলৌকিক নয়, অনিশ্চয়তার নীতির সুনির্দিষ্ট ফল।

ব্যাপারটিকে একটু অন্য ভাবেও দেখা যায়। খুবই নিশ্চিত অতি ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে কী ঘট্‌তে পারে তা যদি বিবেচনা করি, ওই সিস্টেমের মধ্যে ইলেকট্রন নি:সরণের শক্তি এত সাংঘাতিক ভাবে অনিশ্চিত থাকে যে ইলেকট্রন তখন বাইরে থেকে যে কোন পরিমাণ শক্তি ধার করতে পারে এবং ওই ক্ষুদ্র সময়ের

মধ্যে তা আবার ফেরতও দিতে পারে। অনিশ্চয়তা নীতির কারণে এভাবে অতি ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে যে কোন শক্তির অধিকারী হতে কোয়ান্টাম তত্ত্বে একটি স্পষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, যা বাস্তবে ঘটতে পারে। ওই ধার করা শক্তিই তখন ইলেকট্রনকে বড় বাধা অতিক্রমে সমর্থ করে, এবং পরে ওই ধার করা শক্তি ফিরিয়ে শক্তির সমতা বজায় রাখতেও। সামগ্রিক ভাবে আগের ও পরের অবস্থা এতটাই স্বাভাবিক থাকে যে মনে করা যেতে পারে যে ইলেকট্রনটি আদৌ অসম্ভব রকমের ওই বাধা অতিক্রম করেনি, বরং নীরবে বাধার নিচে দিয়ে সুড়ঙ্গ কেটে (টানেলিং) তার অপর পারে যাওয়ার সুযোগ নিয়েছে। অনিশ্চয়তার নীতি এই সুযোগ এনে দিয়েছে। এজন্য পুরো ব্যাপারটিকে কোয়ান্টাম টানেলিংও বলা হয়। এভাবে সুড়ঙ্গ কাটাতে যেন কোন বাধাই অতিক্রম করতে হয়নি, যেন একটি রাবারের বল পাঁচ ফুট পুরু কঠিন কংক্রীটের ভেতর দিয়ে চলে গেলো দেয়ালে কোন ফুটোর চিহ্ন না রেখেই, অপর পারে একে পাওয়া যাওয়ার একটি বাস্তব সম্ভাবনা থাকাটাই এখানে বড় কথা। কোয়ান্টাম তত্ত্বের একটি নীতিই হলো যে ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে, যে ঘটনা ঘটার বিরুদ্ধে কোয়ান্টাম তত্ত্বের দিক থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, সেটি ঘট্‌বেই।

ঘটনাগুলোকে খুব অদ্ভুত শোনাতে পারে, কিন্তু একেবারেই বাস্তব এই আচরণের সুযোগ নিয়ে আমরা নানা রকম যন্ত্র ও কৌশল সৃষ্টি ঠিকই করতে পেরেছি। উদাহরণ স্বরূপ ইলেকট্রনিক্সে বেশ পরিচিত একটি সাধারণ ডিভাইসের নাম টানেল ডায়োড। ইলেকট্রনিক সার্কিটে ডায়োড জিনিসটি ট্রানজিস্টরের মত বহুল ব্যবহৃত একটি ছোট ডিভাইস। এটি কারেন্টকে একদিকে প্রবাহিত হতে দেয়, বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দেয়। অথচ টানেল ডায়োডে এই বাধাকে নিজের যথেষ্ট শক্তি না থাকা সত্ত্বেও ইলেকট্রন ইত্যাদি কণিকা অতিক্রম করে যেতে পারে– ওই অনিশ্চয়তা ভিত্তিক টানেলিং এর কারণে। ব্যাপারটি সেই রাবার বলের দেয়াল ফুঁড়ে যাবার মতই ভৌতিক, অথচ আমরা সহজলভ্য টানেল ডায়োড ডিভাইসে তা অহরহ হতে দেখ্‌ছি।

কোয়ান্টাম টানেলিঙের আর একটি চমৎকার উদাহরণ দেখি আধুনিক এক প্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপে (এসটিএম)। এটি এতো ক্ষুদ্র জিনিসের ইমেজ তৈরি করতে পারে যে পালিশ করা বস্তুর পৃষ্ঠদেশের ওপরের এক একটি এটমকে পর্যন্ত এতে দেখা সম্ভব হয়। এতে ওই পৃষ্ঠদেশের ওপর দিয়ে অত্যন্ত সরু করে নেয়া একটি সূঁচের মাথাকে বুলিয়ে যাওয়া হয় (যে কারণে স্ক্যানিং নামটি এসেছে)– সেই পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ না করেও সূঁচের মাথাটি ওখানকার এটমগুলোর অত্যন্ত কাছাকাছি চলে যেতে পারে। এটম আর সূঁচের

মাথার মধ্যে যে অতি সামান্য ব্যবধান তার মধ্যে একটি ভোল্টেজ দেয়া থাকলেও ব্যবধান পার হয়ে তার মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়া এমনিতে সম্ভব নয়; কারণ ওই ব্যবধানে ঝাঁপ দেবার মত শক্তি ইলেকট্রনে নেই। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে সময়-শক্তি অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে একটি টানেলিং কারেন্ট এখানেও সৃষ্টি হয়। এই কারেন্টের পরিমাণ অবশ্য ব্যবধানের ফাঁকটির ওপর নির্ভর করবে, ব্যবধান যত কম হবে টানেলিং তত বেশি হয়ে কারেন্ট বেশি হবে। খুব ভাল পালিশ করা পৃষ্ঠদেশের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় সূঁচ যখন একটি এটমের ঠিক ওপরে থাকে তখন সূঁচের মাথার সঙ্গে পৃষ্ঠের ব্যবধান কমে যায়, এর ঠিক পাশে দুই এটমের মাঝখানে একটু গর্ত হওয়া জায়গার ওপর যখন যায় তখন সূঁচের মাথার সঙ্গে পৃষ্ঠদেশের ব্যবধানটি সামান্য বেড়ে যাবে। এভাবে এক একটি এটম অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গে টানেলিং কারেন্টও ওঠানামা করে। এই ওঠানামার ছবিই পৃষ্ঠদেশে এটম বিন্যাসের একটি সুন্দর ইমেজ সৃষ্টি করে যাতে যেন এক একটি এটমকেই দেখা যায়। সব কিছুর মূলে রয়েছে অবশ্যই সময়-শক্তির অনিশ্চয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট টানেলিং কারেন্ট। চিরায়ত বিজ্ঞানে এই অণুবীক্ষণ সম্ভব হতোনা।

আমাদের নিজেদের উদ্ভাবনে আমরা কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তাকে কী ভাবে ব্যবহার করছে তা দেখলাম। ওভাবে প্রকৃতিও কিন্তু তাকে ব্যবহার করছে। এমন অনেক প্রাকৃতিক ঘটনা রয়েছে কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক অনিশ্চয়তা ছাড়া যাকে ব্যাখ্যা করা যায়না। পৃথিবীতে আমাদের বাস সম্ভব হয়েছে সূর্য থেকে শক্তি পাচ্ছি বলে। সূর্যের অভ্যন্তরে এই শক্তি তৈরি হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ায় সেখানে শক্তি উৎপাদিত হওয়ার মাধ্যমে; সব তারার ক্ষেত্রেও এভাবেই শক্তি উৎপাদিত হয়। এভাবে শক্তি উৎপাদন শুরুই হতে পারতোনা যদি কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা না থাকতো। কোন তারার প্রথম বয়সে এর জন্মের সময় থেকে নিউক্লিয়ার ফিউশন কাজ করে ভারি হাইড্রোজেনের দুটি নিউক্লিয়াস পরস্পরের খুব কাছে চলে এসে হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিণত হবার ফলে। দুটি অপেক্ষাকৃত হালকা নিউক্লিয়াস একত্র হয়ে অপেক্ষাকৃত ভারি একটি হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠনের ফলেই এই নিউক্লিয়ার শক্তি নির্গত হয়। এরকম অসংখ্য নিউক্লিয়াসে তা ঘটলে শক্তিটি প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। সাধারণ হাইড্রোজেনের অন্য এই রূপের নিউক্লিয়াসে একটি প্রোটন থাকা ছাড়াও একটি বা দুটি নিউট্রনও থাকে। প্রোটন ধনাত্মক কণিকা এবং নিউট্রন চার্জহীন কণিকা। দুটি ধনাত্মক প্রোটনকে পরস্পরের একেবারে খুব কাছে চলে আসতে হলে ওদের মধ্যে উচ্চ বিকর্ষণ শক্তিকে অতিক্রম করার মত শক্তি তাদের থাকতে হয়– সেই শক্তি আসতে পারে অত্যন্ত উচ্চ উত্তাপ থেকে।

সেই বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও ধূলি কণা ঘন হয়ে এই নতুন তারার সৃষ্টি হচ্ছে তার বিশাল ভর এর কেন্দ্রের ওপর প্রচণ্ড চাপে ধরে পড়ার উপক্রম থেকে নতুন তারার কেন্দ্রে খুব উচ্চ উত্তাপ সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু তা দুটি প্রোটনকে পরস্পর অতটা কাছে নেয়ার মত যথেষ্ট নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কাছে যাওয়াটি ঘটতে পারে, এবং নিউক্লিয়ার ফিউশন ঘটার মাধ্যমে তারার প্রচণ্ড শক্তি অনিশ্চয়তা সুযোগ করে দিয়েছে ক্ষুদ্র সময়ের প্রায় নিশ্চিত অবস্থার সুযোগ নিয়ে শক্তিকে একেবারে অনিশ্চিত করে ফেলতে এবং দুই ধনাত্মক নিউক্লিয়াসকে কাছে আনার মত শক্তি ক্ষণিকের জন্য ধার করতে। এভাবে কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা সূর্যের শক্তি তৈরির সুযোগ করে না দিলে পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হতোনা।

অন্য ভাবে আর একটি একই রকম ঘটনা তেজষ্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়াসে ঘটছে। সেখানে নিউক্লিয়াসের ভেতর ইলেকট্রন তৈরি হয়ে বিটা কণিকা হিসেবে বের হয়ে আসে। কিন্তু নিউক্লিয়াসের অভ্যন্ত ঘন ধনাত্মক চার্জের ভেতর থেকে তার আকর্ষণ আগ্রাহ্য করে ঋণাত্মক ইলেকট্রনের বের হয়ে আসা সাধারণ চিরায়ত বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অসম্ভব। কিন্তু এই অসম্ভব কাজটি ক্ষণে ক্ষণে সম্ভব হচ্ছে সেই সময়-শক্তি অনিশ্চয়তারই কারণে। এভাবেই সম্ভব হচ্ছে তেজষ্ক্রিয় পদার্থের বিটা রে' নি:সরণ। কাজেই আমাদের চিরায়ত বিজ্ঞান-ভিত্তিক ধারণাতে যতই অদ্ভুত শোনাক্ না কেন প্রকৃতি এরকম নানা ভাবে কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

অনিশ্চয়তার সুযোগে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টিঃ

কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার যে সব পরিচয় প্রকৃতি দিয়েছে তার মধ্যে সব চেয়ে অবাক করে মহাবিশ্বের নিজেরই সৃষ্টি। অবশ্য এতে আরো একটি বৈপ্লবিক ও অদ্ভুত তত্ত্বের সাহায্য দরকার হয়– আপেক্ষিকতার তত্ত্বের। মহাবিশ্ব সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব বিগ্ ব্যাং অনুযায়ী প্রায় ১৪০০ কোটি বছর আগে বিশেষ একটি ক্ষণে স্থান, কাল, বস্তু, শক্তি সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছিলো ছোট্ট একটি বিন্দু রূপে মহাবিশ্বের শুরুর মাধ্যমে। এর কোন কিছুই সেই ক্ষণটির আগে ছিলনা, তার মানে বলা যায় কিছুই ছিলানা– অর্থাৎ এক্কেবারে ডাহা শূন্য (ভ্যাকুয়াম)। এই শূন্য থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলো মহাবিশ্ব।

সাধারণ ভাবে আমরা শূন্যকে শূন্যই দেখবো, তার মধ্যে যত সূক্ষ্মভাবেই হোক ক্ষুদ্র কোন অংশকে দেখিনা। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্ব ভিন্ন কথা বলে। আমরা যদি

অত্যন্ত শক্তিশালী একটি অণুবীক্ষণ কল্পনা করি এবং শূন্যের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখতে পেতাম ওই শূন্যের মধ্যেই হঠাৎ কণা-রূপী শক্তি সৃষ্টি হচ্ছে আর অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে তা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে– এভাবে ওখানে ক্রমাগত শক্তির জন্ম ও বিলুপ্তি ঘট্‌ছে অত্যন্ত ক্ষুদ্র সময়ে। শক্তি নি:সরণের সময়টি এভাবে খুবই নিশ্চিত হবার ফলে খুবই অনিশ্চিত যে কোন রকম শক্তি দেখা দেয়ার একটি সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। আর সম্ভাবনা থাকা মানে তা বাস্তবেও ঘটা– কারণ কোন কোয়ান্টাম নিয়ম তাকে মানা করছেনা। কোয়ান্টাম নিয়ম অবশ্য এই শক্তিকে কণিকার আকারে আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য করে। আবার বিজ্ঞানের অন্য অবশ্যম্ভাবী নিয়ম তাকে বাধ্য করে জোড়া-কণিকা হিসেবে দেখা দিতে। শর্তটি হলো ওই অতি ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যেই এই 'ধার করা' শক্তিটুকু ফেরৎ দিয়ে কণিকা-জোড়াকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে; অতি ক্ষণিকের জন্য দেখা দেয়া এই কণিকাকে তাই বলা হয় আপাত কণিকা (ভার্চুয়াল পার্টিকল) এই কণিকাকে যে তার একটি দোসরকে সঙ্গে নিয়ে জোড়া-কণিকা হিসেবে দেখা দিতে হয় তার কারণ বিজ্ঞানের অবশ্য পালনীয় কিছু নিয়ম– কিছু কিছু জিনিসের নিত্যতার নিয়ম। আমরা আগেই দেখেছি ভরবেগ, কৌণিক ভরবেগ, শক্তি ইত্যাদি কয়েকটি জিনিস একটি সিস্টেমের মধ্যে সব সময় একই থাকে– নিজেদের মধ্যে এদের যা কিছুই লেনদেন ঘটুক না কেন। এগুলোই নিত্যতার নিয়ম। বৈদ্যুতিক চার্জের নিত্যতাও এই নিয়মে পড়ে। এখন যেখানে শূন্য অবস্থা তখন তো এসবের সব কিছুই শূন্য। সেই শূন্যের মধ্যে যদি কোন কণিকার সৃষ্টি হয় তার ক্ষেত্রেও নিত্যতার কারণে এসব শূন্যই থাকতে হবে। একটি কণিকা সৃষ্টি হলে এই নিত্য জিনিসগুলোর কিছু না কিছু নিয়েই তা জন্মাবার কথা, শূন্য থাকার কথা নয়। সে কারণেই একটি উল্‌টো দোসর একই সঙ্গে সৃষ্টি হওয়া চাই যাতে কাটাকুটি হয়ে এখনো সে সব শূন্যই থাকতে পারে– নিত্যতার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম যেন না ঘটে। তাই দোসরকে হতে হয় উল্‌টো ও সমান বৈদ্যুতিক চার্জের, উল্‌টো ও সমান ভরবেগের ইত্যাদি। যেমন একটি ইলেকট্রন সৃষ্টি হবার সময় তার প্রতিকণিকা পজিট্রনও সৃষ্টি হতে হয়; পজিট্রনের সব ভর হুবহু ইলেকট্রনের মত কিন্তু বৈদ্যুতিক চার্জ ইলেকট্রনের উল্‌টো ও সমান ধনাত্মক। এভাবে সব কণিকার একটির সঙ্গে তার একটি প্রতিকণিকাও মিলে জোড়া-কণিকা হিসেবে সৃষ্টি হয় সম্পূর্ণ শূন্য থেকে।

এ ভাবে চিরায়ত দৃষ্টিতে আমরা যেখানে নেহাতই শূন্য দেখছি, কোয়ান্টাম দৃষ্টিতে যেখানে সারাক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি হচ্ছে নানা কণিকা-প্রতিকণিকার জোড়া আর সেই ক্ষণেই সেগুলো বিলুপ্ত হয়ে চলেছে। আমাদের সেই কাল্পনিক প্রচণ্ড

শক্তিশালী অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে ক্ষুদ্র পর্যায়ে শূন্যকে আরো এমনি কণিকা-জোড়ার সৃষ্টি ও বিলয়ের উতাল পাতালের মধ্যেই সব সময় দেখবো। কিন্তু যেই আপাত কণিকা সৃষ্টির ক্ষণেই বিলুপ্ত হয় তাদের সঙ্গে স্থায়ী মহাবিশ্বের কী সম্পর্ক? মহাবিশ্বের কথায় যদি একটু পরেও আসি ওই ক্ষণস্থায়ী কণিকাই কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্পষ্ট ও পরিমাপযোগ্য কিছু ঘটনা ঘটাতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যায় যে ওই একেবারে শূন্য স্থানেও যদি অত্যন্ত কাছাকাছি মুখামুখি দুটি আয়না রাখা যায় অনেক সংখ্যক ক্ষণস্থায়ী কণিকা প্রতিকণিকার জোড়া দুই আয়নার মাঝখানে যেমন সৃষ্টি হবে তেমনি দুই আয়নার বাইরের দিকেও সৃষ্টি হবে। কিন্তু দুই আয়নার মাঝখানের কণিকাগুলো ওই সময়ের মধ্যেই দুই আয়নায় এক বার এটিতে এবং আবার ওটিতে বারবার প্রতিফলিত হয়ে হয়ে কিছু বিশেষ গুণ লাভ করে – যার ফলে আয়না দুটির ওপর তাদের গড়পড়তা চাপ বাইরের কণিকা-জোড়াগুলোর চাপের থেকে বেশি হয়। ফলে মোটের ওপর দুটি আয়না যেন পরস্পরকে বিকর্ষণই করে, এবং পরস্পর থেকে সরে যায়। তাত্ত্বিক ভাবে এই ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হবার পর পরীক্ষায়ও এর বাস্তব পরিমাপযোগ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর অর্থ এই আপাত কণিকাই ক্ষণস্থায়ী আপাত হওয়া সত্ত্বেও এমন পরিমাপযোগ্য ঘটনার জন্ম দিতে পারে।

আপাত কণিকা যে মহাবিশ্বের সৃষ্টির সময় স্থায়ী মহাবিশ্বে স্থায়ী স্থান পেয়েছে তা সম্ভব হয়েছে বৈপ্লবিক সেই অন্য তত্ত্বটির কারণে– আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। যদিও কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতার তত্ত্ব এই দুটি বৈপ্লবিক তত্ত্বকে এখনো একেবারে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে এক করে দেখা সম্ভব হয়নি, তবুও আসন্ন অনুমানে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এদের একত্র প্রয়োগ সম্ভব হয়েছে। ফলে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মতেও ওই মহাশক্তিশালী অণুবীক্ষণে একেবারে ক্ষুদ্র পর্যায়ে গিয়ে শূন্যকে একেবারে স্থানহীন, সময়হীন নিস্তরঙ্গ ডাঁহা শূন্য হিসেবে দেখা যায়না; বরং দেখা যায় ওর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের ও সময়ের 'বুদবুদ' সৃষ্টি হতে পারছে, আর পরক্ষণই ওগুলো চুপসে গিয়ে আবার যেই শূন্য সেই শূন্য হয়ে পড়ছে। এমনি ভাবে অসংখ্য বুদবুদ সৃষ্টি হওয়া এবং চুপসে যাওয়ার মধ্য দিয়ে ওখানে যেন সব সময় লেগে আছে এক রকম বুদবুদ ফেনার উতাল পাতাল। এগুলোরও কোন বুদবুদের স্থায়ী হবার কথা নয়। কিন্তু এমনি এক স্থান-কালের বুদবুদ এবং তার মধ্যে সৃষ্ট ক্ষণস্থায়ী কণিকা হঠাৎ অন্য কারণে ওই ক্ষণস্থায়ী সময়ের মধ্যে বা তারো থেকে ক্ষুদ্র সময়ের মধ্যে দ্রুত বেড়ে গিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মত হতে পারে। সেই বুদবুদ ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তাই হঠাৎ ওভাবে ক্ষণিকের মধ্যে অসম্ভব উচ্চ বেগে ফুলে ওঠে আমাদের পরিচিত সাইজের– যেমন একটি পূঁতির

দানার সাইজে চলে আসতে পারে। ওই হঠাৎ ফুলে যাওয়াটিকে বলা হয়েছে 'মহাস্ফীতি (ইন্‌ফ্ল্যাশন)। ক্ষণিকের জন্য সৃষ্ট অনেক কণিকা-জোড়া ওই বুদবুদের মধ্যেও ছিল, যাদের ক্ষণিকের মধ্যে বিলুপ্ত হবার কথা। কিন্তু সেই ক্ষণিকের থেকেও ক্ষুদ্র ক্ষণিকের মধ্যে বুদবুদ ফুলে গিয়ে আমাদের চিরায়ত সাইজে এসে যাওয়ার ফলে বিলুপ্তি আর ঘটতে পারেনি, শূন্য থেকে আসলেও মহাবিশ্ব কণিকা জোড়াগুলোর শক্তি নিয়েই এসেছে। এভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষণস্থায়ী হওয়াটাকে ফাঁকি দিয়ে আসার পর সেই পুঁতির দানার সাইজের মহাবিশ্ব আরো স্বাভাবিক অপেক্ষাকৃত কম বেগে ক্রমে প্রসারিত হয়ে আজকের আয়তনে চলে এসছে, এবং এখনো প্রসারিত হচ্ছে। এভাবে কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তা এবং মহাজাগতিক মহাস্ফীতি মহাবিশ্ব সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে একেবারে শূন্য থেকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মহাস্ফীতি যেহেতু নেহাতই স্থান-কালের প্রসারণ সেটি আপেক্ষিক তত্ত্বের সীমার অধীন নয়। আলোর থেকেও বেশি বেগে এটি ঘটতে পেরেছিলো। মহাস্ফীতির ধারণা এখনো তাত্ত্বিক পর্যায়ে থাকলেও এটি অনেক কিছু ব্যাখ্যার সুযোগ করে দিয়েছে।

ওই হঠাৎ ফুলে যাওয়া মহাবিশ্বে আরো একটি ঘটনা ঘটেছে। যদিও সব সময় যতগুলো কণিকা ততগুলো প্রতিকণিকা সৃষ্টির কথা, ওর মধ্যে কণিকা ও প্রতিকণিকার প্রতিসাম্যে একটু ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। যার ফলে কণিকা ও প্রতিকণিকার মিলে উভয়ের বিলুপ্তি ঘটার পরও কিছু কণিকা বাড়তি থেকে গেছে। এই বাড়তি কণিকার সংখ্যাও এত বেশি যে তাই দিয়ে আজকের মহাবিশ্বের সব বস্তু-শক্তি গঠিত হতে পেরেছে; প্রতিকণিকা দিয়ে নয়।

অনিশ্চয়তাকে অন্যদিক থেকে দেখা

অবস্থান-ভরবেগ অনিশ্চয়তাটিকে আমরা একটু অন্য ভাবেও দেখতে পারি। ওপরে আমরা একে যেভাবে দেখেছি কোন কোন বিজ্ঞানী সেরকম পরিমাপের অনিবার্য সমস্যা হিসেবে না দেখে একে তরঙ্গ-ফাংশান হিসেবে দেখাটাই বেশি যথার্থ মনে করেন। আমরা এজন্য একটি ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ফাংশানের কথায় ফিরে যাই এবং স্থানের সঙ্গে তরঙ্গ-ফাংশানের লেখচিত্রের কথাটি স্মরণ করি। এখানেও দেখার সুবিধার জন্য শুধু একমাত্রিক স্থানের কথা চিন্তা করি। মনে করি ওই কম্‌প্লেক্স নাম্বারে গড়া তরঙ্গ-ফাংশান ψকে শুধু একটি স্থানাঙ্ক x এর বিপরীতে লেখচিত্রে আঁকছি। এখন এর একটি হার্মোনিককে শুধু নিলে এবং আগের মত x ছাড়া অন্য দুটি মাত্রাকে (yএবং z) কম্‌প্লেক্স নাম্বার আঁকার জন্য

ব্যবহার করলে স্প্রিঙের আকৃতির প্যাঁচানো একটি লেখচিত্র পাব। যেহেতু এটি একটি হার্মোনিক, এর তরঙ্গ-দৈর্ঘ (যা কণিকার ভরবেগ নির্ধারণ করে) সব সময় এক; কাজেই স্প্রিঙের প্যাঁচের রিংগুলোর পরস্পর দূরত্ব সব সময় এক। রিঙের ব্যাসার্ধটি ψএর উচ্চতার মধ্যে এই হার্মোনিকের অবদানটি নির্ধারণ করে দেয়। মনে করি কণিকাটির ভরবেগ একেবারে নিশ্চিত, একটিই তার মান (তরঙ্গ-দৈর্ঘ একেবারেই নিশ্চিত বলে)। কাজেই এটিই হবে একমাত্র হার্মোনিক। ফলে ψ এর ছবিটিও হবে শুধু এর দ্বারাই নির্ধারিত, একমাত্র এরই অবদান রয়েছে। সেক্ষেত্রে $|\psi(x)|^2$ থেকে যে প্রকৃত অবস্থান-সম্ভাবনা পাব তা সব x এর জন্য সমান মান দেবে– লেখচিত্রে এই সম্ভাবনার কোন ওঠানামা না থেকে সর্বত্র সমান ভাবে দেখাবে। কণিকাটির অবস্থানের সম্ভাবনা এভাবে সব জায়গায় সমান হবার মানে হলো এর অবস্থান একেবারেই অনিশ্চিত হওয়া। কাজেই আমরা দেখলাম ভরবেগ (p) যখন একেবারেই নিশ্চিত, অবস্থান (x) তখন একেবারেই অনিশ্চিত। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতির এই দিকটি এভাবে স্পষ্ট হলো।

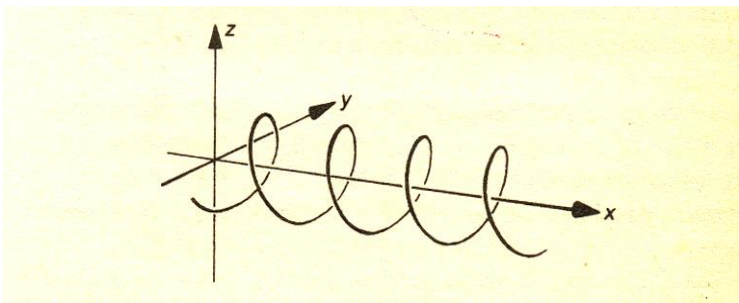

ψ এর হারমোনিকের লেখচিত্রটি আবার দেখি। এবার ধরা যাক একটিমাত্র হারমোনিক রয়েছে; তাই ভরবেগ একেবারে সুনির্দিষ্ট (নিশ্চিত) এবং অবস্থানের সম্ভাবনা (রিঙের ব্যাসার্ধ) সর্বত্র একই। তাই অবস্থান একেবারেই অনিশ্চিত। একে $\overline{\Psi}$এর লেখচিত্র হিসেবেও দেখা যায়, সেক্ষেত্রে ছবিতে x অক্ষটি p অক্ষ হবে। এখানেও একটি মাত্র হার্মোনিক, তাই এক্ষেত্রে অবস্থান একেবারে সুনির্দিষ্ট (নিশ্চিত) আর ভরবেগের সম্ভাবনা (রিঙের ব্যাসার্ধ) সব রকম (সব p এর সমান সম্ভাবনা)। তাই ভরবেগ একেবারেই অনিশ্চিত।

এখন উল্টো অন্য দিকটিকেও দেখতে পারি। লেখাচিত্রে ψকে স্থানের বিপরীতে না দেখিয়ে ভরবেগের বিপরীতে যদি দেখাই এবং ψ যদি এখন ভরবেগের ফাংশান হয় $\psi(p)$ রূপে, তাহলে তাকে স্থানের ψ না বলে ভরবেগের ψ বলতে পারি। এর জন্য আলাদা একটি চিহ্ন $\overline{\Psi}$ (রেখা ওয়ালা ψ) ব্যবহার

করতে পারি সেটিও কম্প্লেক্স নাম্বারে গড়া। $\psi(x)$ এবং $\overline{\Psi}(p)$ গাণিতিক ভাবে সম্পর্কিত: এদের একটিকে অন্যটি থেকে গাণিতিক ভাবে নির্ণয় করা যায়। $\overline{\Psi}(p)$ এর হার্মোনিকের লেখচিত্র আঁকলে p বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এও স্প্রিঙের আকারে এগোবে, এবার কিন্তু স্প্রিঙের রিং এর পরস্পর দূরত্ব দেবে অবস্থানের সম্ভাবনা-উচ্চতার মাপ, আর স্প্রিঙের ব্যাসার্ধ দেবে $\overline{\Psi}(p)$ এর মধ্যে এই হার্মোনিকের অবদান। এক এক হার্মোনিকে এই অবস্থানের উচ্চতা এক এক রকম হবার কথা। কিন্তু যদি কণিকার অবস্থান একেবারে নিশ্চিত হয় তা হলে একটি মাত্র হার্মোনিকই তার হবে সেই নিশ্চিত অবস্থানের সম্ভাবনা-উচ্চতাটি দেখিয়ে। রিঙের ব্যাসার্ধটিও এই হার্মোনিকেরই শুধু হবে এবং তাই $\overline{\Psi}(p)$ এর লেখচিত্রে সব p এর জন্য একই উচ্চতা হবে– এই ব্যাসার্ধের সমান। ভরবেগের প্রকৃত সম্ভাবনা $|\psi(p)|^2$ থেকে যা পাব তাও সব p এর জন্য একই থাকবে। অর্থাৎ সব রকম ভরবেগ হবার সম্ভাবনা সমান– ভরবেগ একেবারেই অনিশ্চিত। এভাবে দেখলাম অবস্থান একেবারে নিশ্চিত হলে ভরবেগ একেবারেই অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অনিশ্চয়তা নীতির অন্য চরম দিকটিও এতে স্পষ্ট হলো।

এই চরম অবস্থাগুলো কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব। সাধারণত যা হবে অবস্থান বা ভরবেগ উভয়েরই কিছু অনিশ্চয়তা থাকায় x এর সঙ্গে $\psi(x)$ এর চিত্রে এক জায়গায় কিছু x জুড়ে ψ উঁচুতে থাকবে এবং এর থেকে কম x এবং বেশি x এর জায়গায় উচ্চতা কমে গিয়ে ছোট হয়ে যাবে। ওই উঁচু জায়গায় কণিকাটির অবস্থানের সম্ভাবনা বেশি বটে তবে অন্য জায়গায়ও সম্ভাবনা কিছু থাকবে (অন্য হার্মোনিকে), যাদের প্রত্যেকের ভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ অর্থাৎ ভিন্ন ভরবেগ থাকবে। এই সব হার্মোনিকে গড়া $\psi(x)$ এর ভরবেগেও তাই কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকবে।

x এর সঙ্গে $\psi(x)$ এর চিত্র না দেখে যদি p এর সঙ্গে $\overline{\Psi}(p)$ এর চিত্রটি দেখি সেখানেও একই রকম আচরণ পাব। $\overline{\Psi}(p)$ এর মান এক জায়গায় কিছু p এর জন্য উঁচু পাব, এর থেকে কম p বা বেশি p এর জন্য সেটি কমে গিয়ে খুব ছোট হয়ে যাবে। ওই উঁচু জায়গার যে ভরবেগ সে সব ভরবেগ হবার সম্ভাবনাই বেশি তবে উঁচু জায়গাটি কিছুটা ছড়ানো বলে সেই ভরবেগেও কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকছে। এরও বিভিন্ন কিছু হার্মোনিক থাকবে এবং বিভিন্ন হার্মোনিকের বিভিন্ন অবস্থান সম্ভাবনা থাকায় $\overline{\Psi}(p)$ এর মধ্যে এসব বিভিন্ন অবস্থানের কিছু অবদান থাকবে– অর্থাৎ অবস্থানেরও কিছুটা অনিশ্চয়তা থাকবে।

এভাবে x এর বিপরীতে $\psi(x)$ এবং p এর বিপরীতে $\overline{\Psi}(p)$ এর লেখচিত্র উভয়টি থেকে আমরা দেখলাম কণিকার অবস্থান এবং ভরবেগ দুইয়েই অবশ্যম্ভাবী ভাবে কিছু অনিশ্চয়তা থাকবেই। কোয়ান্টাম তত্ত্বের তরঙ্গ ফাংশান থেকে সরাসরি এই অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হতে আমরা দেখলাম। $\psi(x)$ এর এবং $\overline{\Psi}(p)$ এর বিস্তারিত হিসেব করলে অবস্থানের অনিশ্চয়তা ও ভরবেগের অনিশ্চয়তার গুণফলকে আমরা h এর থেকে বড় বা সমান হিসেবে পাব উভয় লেখচিত্রে ব্যাপারটিকে আমরা আমাদের পূর্বপরিচিত তরঙ্গ-প্যাকেটের আকৃতিতেই পেলাম; প্রথমটিতে অবস্থানের তরঙ্গ-ফাংশানে সম্ভাবনা উচ্চতা আমরা অল্প স্থানে প্যাকেটের মত ফুলে থাকতে দেখলাম, অন্যটিতে ভরবেগের তরঙ্গ ফাংশানের সম্ভাবনা উচ্চতা অল্প ভরবেগের আওতায় প্যাকেটের মত ফুলে থাকতে দেখালাম। তরঙ্গ-প্যাকেটের মধ্যেই ওই অনিশ্চয়তার প্রকাশকে আমরা আগের একটি অধ্যায়ের আলোচনাতেই কিছুটা দেখেছি।

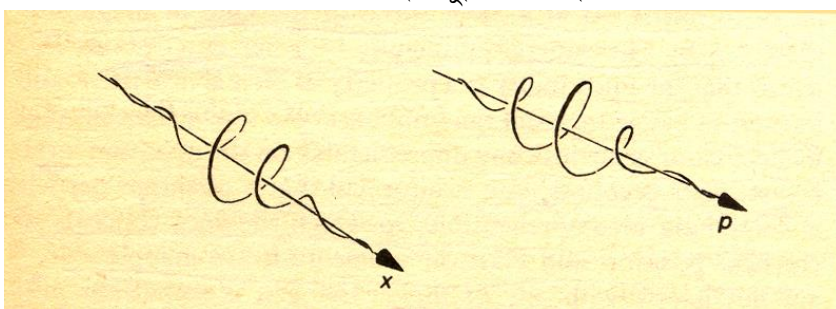

বাস্তব ক্ষেত্রে যেমনটি থাকে সম্পূর্ণ ψ এর সেরকম লেখচিত্র। বিভিন্ন হার্মোনিকের (বিভিন্ন ভরবেগের) অবদানে এক জায়গায় অবস্থান-সম্ভাবনা বেশি (রিঙের ব্যাসার্ধ), অন্যান্য জায়গায় কম। ভরবেগ ও অবস্থান উভয়টিতেই কিছু অনিশ্চয়তা অবশ্যই থাকে।

বাস্তব ক্ষেত্রে $\overline{\Psi}$ এর লেখচিত্র। বিভিন্ন হার্মোনিকের (বিভিন্ন অবস্থান-সম্ভাবনার) অবদানে একটি ভরবেগের সম্ভাবনা বেশি, অন্য ভরবেগের সম্ভাবনা কম (রিঙের ব্যাসার্ধ)। অবস্থান ও ভরবেগ উভয়টিতেই কিছু অনিশ্চয়তা অবশ্যই থাকে।

$\psi(x)$ কে x এর বিপরীতে এবং $\overline{\Psi}(p)$ কে p এর বিপরীতে চিত্রিত করতে গিয়ে আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের আরেকটু সাধারণ প্রযোজ্য ও উচ্চতর পর্যায়ের একটুখানি পরিচয় আমরা পেলাম। এখানে $\overline{\Psi}(p)$ এর কিছুটা উল্লেখ বাদ দিলে এই বইয়ে আমরা শুধু $\psi(x)$ বা অবস্থান তরঙ্গ ফাংশানের কথাই আলোচনা করেছি। একে দেখা হয় আমাদের পরিচিত স্থানের মধ্যে– যা প্রকৃত পক্ষে তিন মাত্রার, তবে আমরা মাঝে মাঝে সহজ করার জন্য এক মাত্রার হিসেবে কল্পনা

করেছি, যেখানে ওপরে করেছি $\psi(x)$ রূপে। ψ এখানে x এর গাণিতিক ফাংশান, কিন্তু এখানে আমরা আরো এক রকম তরঙ্গ ফাংশান $\overline{\Psi}$ কে এনেছি যা অবস্থান তরঙ্গ ফাংশানের বদলে ভরবেগ তরঙ্গ ফাংশান– যেই $\overline{\Psi}(p)$ কে চিত্রিত করতে হয় p এর বিপরীতে। $\overline{\Psi}$ এখানে p এর গাণিতিক ফাংশান বলা যায় একে আমরা দেখছি আমাদের বাস্তবে পরিচিত সাধারণ স্থানের মধ্যে নয় বরং 'ভরবেগের স্থান' বলে কথিত একটি কাল্পনিক 'স্থানের' মধ্যে। সাধারণ স্থানের সঙ্গে এই ভরবেগের স্থানের মিলটুকু নেহাতই গাণিতিক মিল। কিন্তু সে কারণেই একেও এক রকম বিমূর্ত 'স্থান' হিসেবে দেখলে গাণিতিক দিক থেকে সুবিধা হয়। এই ভরবেগ স্থানের এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে গেলে অবস্থান পরিবর্তন হয়না, বরং ভরবেগ পরিবর্তন হয়। এভাবে নানা রকম বিমূর্ত 'স্থানের' পরিপ্রেক্ষিতেই সাধারণ ভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে প্রকাশ করা হয়; আর যে কারণে তা আমাদের পরিচিত স্থানের মত তিন মাত্রাতেও সীমাবদ্ধ থাকেনা, তিনের অধিক নানা মাত্রাতেও থাকতে পারে। তবে এই বইয়ে আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্বকে সে ভাবে গাণিতিক ভাবে দেখ্ছিনা বলে একে প্রধানত আমাদের সাধারণ পরিচিত স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছি। শুধু এখানেই 'ভরবেগের স্থান'কে একটু খানি আনা হলো। যাঁরা সহজ গণিতে হলেও একটু গাণিতিক ভাবে দেখতে চান তাঁরা যাতে তরঙ্গ ফাংশানের লেখচিত্র কল্পনা করেই অনিশ্চয়তা নীতিকে বুঝতে পারেন, সে জন্যই অনিশ্চয়তাকে অন্যদিক থেকে দেখার এই চেষ্টাটুকু করা হলো।

কোয়ান্টাম জগত

কোয়ান্টাম তত্ত্ব কী বলে তার কিছু পরিচয় আমরা পেয়েছি। কীভাবে প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা একটু একটু করে 'আরামপ্রদ' চিরায়ত বিজ্ঞান ছেড়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আজব জগতে এসে পড়েছেন তাও আমরা দেখেছি। কোয়ান্টাম তত্ত্বের মৌলিক কাঠামোটি খাড়া হয়ে যাওয়ার পর নতুন ও পুরানো অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা এর দ্বারাই করা সম্ভব হয়েছে; এর মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা আছে যার আবিষ্কারই কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়া সম্ভব হতো না।

আমরা দেখেছি কোয়ান্টাম তত্ত্ব শুধু ক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য হলেও নীতিগত ভাবে বড় জিনিসও এর আওতামুক্ত নয়। তবে বড় জিনিসের ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম প্রভাবটি খুবই নগণ্য, তাই চিরায়ত বিজ্ঞানের বিবেচনাটিই সেখানে যথেষ্ট; কোয়ান্টাম তত্ত্বের জটিলতর গাণিতিক সমাধান তাতে কোন বাড়তি অন্তর্দৃষ্টি দেয়না বলেই তাকে বরাবরের মত চিরায়ত বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র জিনিস না হয়েও আরো বহু কিছুতে কোয়ান্টাম তত্ত্ব চলে এসেছে কারণ নিজেরা ক্ষুদ্র না হলেও যে ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুতে তারা গড়া, সেগুলোই তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। কাজেই সেই বড় পর্যায়ের আচরণেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যবহার প্রয়োজন। ফলে দেখা যাচ্ছে এই নতুন বাতাবরনের অধীনেই বিজ্ঞানকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে– সেটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের বাতাবরণ। এই অধ্যায়ে নানা ক্ষেত্রের কিছু কিছু উদাহরণ নিয়ে সেখানে কোয়ান্টাম তত্ত্বে কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা আমরা দেখার চেষ্টা করবো।

এটম, অণু, এবং কঠিন বস্তুর বড় টুকরায় কোয়ান্টাম জগত

আলোর খেলার কোয়ান্টাম তত্ত্বঃ

কোয়ান্টাম তত্ত্বের শুরু থেকে এতে আলোর বিকিরণের একটি ভূমিকা ছিল সেটি আমরা দেখেছি। কালো-বস্তু বিকিরণের সংকট এবং আলোর বর্ণালী লাইনের সংকট সমাধান দিতে গিয়েই তো কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রাথমিক সূচনা হয়েছিলো। এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী মৌলের উত্তপ্ত গ্যাসের এটম শক্তি শোষণ করলে এর নিম্ন শক্তির অবস্থার ইলেকট্রন উচ্চতর অবস্থায় চলে যায় এবং পরক্ষণে কোয়ান্টাম লাফে আগের অবস্থায় ফিরে এসে সুনির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির আলো নি:সরণ করে – ওটিই একটি উজ্জ্বল বর্ণালী লাইন সৃষ্টি করে। ওই শক্তি অবস্থা, ওই কোয়ান্টাম লাফ, তাতে অনিশ্চয়তা সবই কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক ব্যাপার। অন্তত হাইড্রোজেনের

এটমের বর্ণালী লাইন কোয়ান্টাম তত্ত্বের শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণের সমাধান থেকে হুবহু আগাম বলে দেয়া সম্ভব হয়েছে। এই লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি নির্ভর করে কোয়ান্টাম লাফে উচ্চতর অবস্থা এবং নিম্নতর অবস্থার মধ্যে শক্তির পার্থক্যের ওপর। বলা হয় এর মাধ্যমে উত্তেজিত এটম অবক্ষয়িত হয়ে সাধারণ ভারসাম্যের অবস্থায় চলে আসে– এভাবে চলে আসাকে 'রিল্যাক্স করা' বা শান্ত হওয়াও বলা হয়। অনেক এটমে প্রায় এক সঙ্গে এটি ঘটতে পারে। বিভিন্ন উচ্চতর অবস্থা থেকে এটি ঘটলে নি:সরিত নানা ফ্রিকোয়েন্সির আলো মিশ্র রঙের সৃষ্টি করতে পারে। গ্যাস উত্তপ্ত করেই শুধু নয় এভাবে আলো নি:সরণের জন্য এটমকে উত্তেজিত করার আরো পথ রয়েছে। বাইরে থেকে আসা অন্য আলো শোষণ করে এটম এভাবে উত্তেজিত হতে পারে, তখন এই এটমই আবার নতুন আলো নি:সরণের উপায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। কোন কোন বস্তুর দ্বারা আলো শোষণ করে সেই বস্তুর নিজেই আবার আলো নি:সরণ করার ঘটনাটি ইতোমধ্যেই পরিচিত ছিল– একে বলা হয় ফ্লোরোসেন্স।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব ফ্লোরোসেন্সের এই ব্যাপারটিও ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হলো। বাইরের আলোটির থেকে শক্তি শোষণ করে ফ্লোরোসেন্ট বস্তুর এটম উত্তেজিত হয়; অর্থাৎ ইলেকট্রন নিচের ভারসাম্যের শক্তি অবস্থা থেকে উপরের কোন অবস্থায় চলে যায়। পরক্ষণেই উত্তেজিত এটমটি অবক্ষয়িত হয়ে ইলেকট্রন আবার ভারসাম্যের অবস্থায় ফিরে আসে। বাইরের যে মূল আলোতে স্নাত হয়ে শোষণ ও নিঃসরণ ঘটে তার থেকে কম শক্তি নি:সরিত হয় বলে নিঃসরিত আলোর ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণত মূল আলোর ফ্রিকোয়েন্সি থেকে কম হয়। মূল আলোর কিছু শক্তি ইলেকট্রন থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় বলেই এমনটি ঘটে। উদাহরণ স্বরূপ সচরাচর এই ফ্লোরোসেন্স আমরা বেশি ব্যবহার করি টিউব লাইট বা ফ্লোরোসেন্ট লাইট, অথবা কমপ্যাক্ট ফ্লোরোসেন্ট লাইট (সিএফএল) নামে পরিচিত বাতিতে। এসব বাতিতে গ্যাসের এটমের সঙ্গে ইলেকট্রনের সংঘর্ষে আলট্রা ভায়োলেট অদৃশ্য আলো সৃষ্টি হয়। কিন্তু এর টিউবের গায়ে কিছু ফ্লোরোসেন্ট বস্তুর প্রলেপ মাখা থাকে। আলট্রা ভায়োলেট আলো থেকে শক্তি শোষণ করে তার থেকে কম ফ্রিকোয়েন্সির দৃশ্যমান উজ্জ্বল হলুদ অথবা মিশ্র সাদা আলো নি:সরণ করে ফ্লোরোসেন্সের মাধ্যমে– সেটিই আমরা এসব বাতিতে দেখি। আমাদের পরিচিত এল ই ডি বাতিতেও মূল উৎপাদিত নীলচে আলোকে সাদা আলোতে পরিণত করে ওরকম ফ্লোরোসেন্ট প্রলেপ। বাতিতে ব্যবহার ছাড়াও অনেক প্রাকৃতিক শিলা যার মধ্যে কিছু কিছু রত্ন পাথর রয়েছে, তাদেরকে সনাক্ত করার জন্য ফ্লোরোসেন্সকে ব্যবহার করা হয়। এমনকি ওষুধ শিল্পে

ওষুধের সঠিক মিশ্রণ ট্যাবলেট আছে কিনা পরীক্ষা করতেও অন্ধকারে এর ওপর অদৃশ্য আলট্রা ভায়োলেট আলো ফেলে দেখা হয় এটি নির্দিষ্ট রঙের দৃশ্যমান আলোতে মৃদু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কিনা। সঠিক ওষুধের ফ্লোরোসেন্ট গুণ জানা থাকলে এটি করা যায়।

যদিও সাধারণত নি:সরিত আলোর ফ্রিকোয়েন্সি মূল আলোর থেকে কম হয়, মূল আলোটি অত্যন্ত বেশি জোরালো হলে একটি ফোটনের বদলে দুটি ফোটন ইলেকট্রনের দ্বারা শোষিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে এটমের ইলেকট্রন আরো বেশি উচ্চ শক্তির অবস্থায় গিয়ে তারপর ফেরার কারণে নি:সরিত আলোর ফ্রিকোয়েন্সি মূল আলোর থেকে বেশিও হতে পারে। আরো বিরল কোন কোন ক্ষেত্রে মূল আলোটির শক্তি পুরাটা ব্যবহৃত হয়ে নি:সরণে প্রাসঙ্গিক দুটি শক্তি-অবস্থার পার্থক্য এমন সুন্দরভাবে তার সঙ্গে মিলে যায় যে হুবহু একই ফ্রিকোয়েন্সির আলোই নি:সরিত হয়। এতে যেন মূল আলোর সঙ্গে এটমের শক্তি-অবস্থার এক ধরণের বিজোন্যান্স বা অনুরণন ঘটে।

ফ্লোরোসেন্সের ক্ষেত্রে আলোর শোষণ ও নি:সরণ একেবারে পর পরই ঘটে বলে শোষিত হবার মত আলো যতক্ষণ আছে ততক্ষণই শুধু ফ্লোরোসেন্ট আলো নি:সরিত হয়। তবে কোন কোন বস্তুর ক্ষেত্রে একটি ভিন্ন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে যাকে বলা হয় ফসফরেসেন্স। এতে আলো শোষিত হবার অনেক্ষণ পরও এটি নি:সরিত হতে পারে, ওই মূল আলো সে সময় আর উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও। কাজেই অন্য কোন আলোর অনুপস্থিতিতেও এই বস্তুগুলোকে অন্ধকারে মৃদু প্রভায় জ্বলতে দেখা যায়। এর ব্যাখ্যা এখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের মাধ্যমে করা যায়: এতে ওপরের অবস্থা থেকে কোয়ান্টাম লাফ দেবার সময় তা সরাসরি 'অনুমোদিত' নিয়মে করতে পারেনা, বরং অননুমোদিত কিছু নিয়মের ঘোরাপথেই তাকে এটি করতে হয়। তা একটি কারণ হতে পারে ইলেকট্রনের স্পিন অবস্থায় পরিবর্তন ঘটার ফলে। ভিন্ন স্পিনে গিয়ে ইলেকট্রনকে ঘোরাপথে কোয়ান্টাম লাফ দিতে হয় বলে তাতে অনেক্ষণ সময় লেগে যেতে পারে– এক এক এটমে এক এক রকম সময়। কাজেই বাইরের আলো সরিয়ে নেবার অনেক্ষণ পরেও ধীরে ধীরে এই সব এটম মৃদু আলো নি:সরণ করতে পারে। আমরা যে অনেক রকম গলার মালা, খেলনা, ঘড়ির ডায়াল ইত্যাদিকে অন্ধকারে একটি বিশেষ রঙের মৃদু আলোতে জ্বলতে দেখি এটি এমনি ফসফরেসেন্স। কিছু ফসফরেসেন্ট বস্তু মেশানো থাকে বলে সাধারণ আলোতে থাকার সময় এগুলো শক্তি শোষণ করে। দীর্ঘ সময় পরে ওই আলো না থাকলেও অন্ধকারে এর

নি:সরিত আলো দেখা যায়। একমাত্র কোয়ান্টাম তত্ত্বই একে ব্যাখ্যা করতে পারে।

এটমের দ্বারা আলোর শোষণ ও নি:সরণ যে দৃশ্যমান আলোর থেকে বেশি ফ্রিকোয়েন্সির আলোতেও ঘটে সেটি আমরা দেখেছি। এটি আরো অনেক বেশি ফ্রিকোয়েন্সির এক্স রে' 'আলোর' নি:সরণের ক্ষেত্রেও সত্য। সেক্ষেত্রে এটমের একেবারে ভেতরের দিকের নিম্নতম শক্তি অবস্থাকে কোয়ান্টাম লাফে জড়িত হতে হয় যাতে কোয়ান্টাম লাফে শুরুর এবং শেষের অবস্থার মধ্যে শক্তি পার্থক্য অনেক বেশি হতে পারে। এক্সরে টিউব নামে পরিচিত বায়ুশূন্য নলে খুবই উচ্চশক্তিতে (উচ্চ বেগে) নিয়ে যাওয়া ইলেকট্রন রশ্মি বিশেষ বিশেষ ধাতুতে তৈরি টার্গেটের ওপর সজোরে গিয়ে আঘাত করলে সেখান থেকে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট খুবই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির এক্সরে আলো পাওয়া যায়। এক একটি ধাতুর বৈশিষ্ট নিয়ে এরকম কয়েকটি ফ্রিকোয়েন্সির এক্সরে প্যাটার্ন পাওয়া যায়, যা ওই ধাতুর পরিচয় বহন করে। ইলেকট্রন যখন ওভাবে সজোরে আঘাত করে তখন তার খুবই উচ্চ শক্তি এটমের মধ্যে জোরালো বন্ধনে থাকা একেবারে ভেতরের দিকের ইলেকট্রনকেও সেখান থেকে উৎখাত করতে পারে। এমনটি ঘটলে সেই নিম্নতম শক্তি অবস্থাতে একটি শূন্যতা সৃষ্টি হয়। ভারসাম্যের প্রয়োজনে ওপরের শক্তি অবস্থায় ইলেকট্রনকে রেখে এই নিম্ন শক্তি অবস্থায় শূন্যতা থাকতে পারেনা, নিচের অবস্থায় অনুমোদিত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকা জরুরি। তাই অনেক ওপরের অবস্থার ইলেকট্রন এই নিচে স্থানান্তরিত হয়ে এই শূন্যতা পুরণ করে এবং ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে। এই দুই অবস্থার মধ্যে শক্তি পার্থক্য অনেক বেশি বলেই নি:সরিত আলোর ফ্রিকোয়েন্সি অনেক বেশি– সেটি এক্সরে। এভাবে টার্গেট ধাতুর ইলেকট্রনগুলোর কোয়ান্টাম বিন্যাস অনুযায়ী কয়েকটি ফ্রিকোয়েন্সি এক্সরে এর নানা এটম থেকে নি:সরিত হয়ে থাকে– যা ওই ধাতুর জন্য একটি নিজস্ব প্যাটার্ন সৃষ্টি করে। এই যে ফ্লোরোসেন্স, ফসফরেসেন্স, এক্সরে এসব আলোর খেলা– এসবের আবিষ্কার ও ব্যবহার অনেকদিন আগে থেকে হলেও এর ব্যাখ্যা আমরা করতে পারছি কোয়ান্টাম তত্ত্বের কল্যাণে।

কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি:

কেমিস্ট্রির কাজ হলো এটমের সমন্বয়ে অণু গঠন এবং নানা অণুর মধ্যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটানো। কিন্তু খুব নিখুঁত ভাবে হুবহু কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক পরিচয় দেয়ার কাজটি শুধু এটমের পর্যায়েই সম্ভব হয়েছে, তাও সবচেয়ে সবল এটম হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রেই শুধু। আমরা দেখেছি মাত্র একটি প্রোটনের নিউক্লিয়াস

এবং তার বাইরে মাত্র একটি ইলেকট্রন নিয়ে গঠিত হাইড্রোজেন এটমের হুবহু পরিস্থিতির জন্য শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ খাড়া করা গিয়েছে, এবং তার পূর্ণ সমাধানের মাধ্যমে এর তরঙ্গ-ফাংশান পাওয়া গিয়েছে। সেখান থেকে এসেছে এই এটমের নানা অরবিটাল এবং তাদের থেকে নি:সরিত বর্ণালী লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদির হিসেব– যা হুবহু বাস্তবের সঙ্গে মিলে গেছে। কিন্তু সমস্যা হলো এমন সাফল্য হাইড্রোজেন এটম থেকে সামান্য জটিল এটমের ক্ষেত্রে আর সম্ভব হয়না, এটমে গড়া অণুর ক্ষেত্রে তো নয়ই। কোয়ান্টাম তত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ গণিত এতে কণিকা সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়াতেই এই সমস্যা। কিন্তু তাই বলে যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগ হাইড্রোজেন এটমেই আট্‌কে গেছে তা মোটেই নয়– এই তত্ত্ব জটিল এটম, নানা অণু, এমন কি সুশৃঙ্খল বড় কঠিন পদার্থের কৃষ্টালের মধ্যেও চমৎকার ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং তার মাধ্যমে প্রকৃতির অনেক রহস্য উদ্ঘাটনও করা গেছে। এই সব ক্ষেত্রে ব্যবহারের কৌশলটি হচ্ছে সরলীকরণ– হুবহু পরিস্থিতির শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ পাওয়ার চেষ্টা না করে এর মধ্যে বৈজ্ঞানিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলোই শুধু রেখে সরলতর পরিস্থিতি কল্পনা করা। এর ফলে সরল সমীকরণ যেমন খুঁজে পাওয়া গেছে, তার সমাধানও খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। সরলীকরণ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রগুলো যদি বজায় থাকে তা হলে এমনি সরলীকৃত হিসেব থেকে বাস্তব ঘটনাগুলোকে অনেকটা নিখুঁতভাবেই ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ খাড়া করার সময় মূলত যেটি দরকার হয় তা হলো সিস্টেমটির মধ্যে কণিকার শক্তির জমে থাকা অংশ (পোটেনশিয়াল এনার্জি) কোথায় কীরকম তা জানা। যেমন একটি এটমের ক্ষেত্রে এর কেন্দ্রের ধনাত্মক নিউক্লিয়াসটির এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য ইলেকট্রনগুলোর প্রভাবে একটি ইলেকট্রনের জমে থাকা শক্তি নিউক্লিয়াস থেকে কতদূরে থাকলে কী রকম হয় তা জানা। হাইড্রোজেনের থেকে জটিলতর এটমের জন্য এ কাজটি করতে সরলীকরণের আশ্রয় নিতে হয়েছে, অণুর ক্ষেত্রে এবং কেমিস্ট্রির অন্যান্য সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে। এই সরলীকরণটি ঠিক মত করে এসব ক্ষেত্রে ও খুব সাফল্যের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে। কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি বস্তুর রাসায়নিক আচরণ ব্যাখ্যায় একটি যুগান্তর এনে দিয়েছে।

হাইড্রোজেন এটমের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভাবে হুবহু পরিস্থিতির জন্য যে তরঙ্গ-ফাংশান পাওয়া গেছে তাতে এর ইলেকট্রনের সর্বনিম্ন শক্তির অরবিটালকে আমরা বলেছি 1s। 1 সংখ্যাটি এখানে প্রধান কোয়ান্টাম নাম্বারের সর্বনিম্ন মান এবং s অক্ষরটি ব্যবহৃত হয় উপ-কোয়ান্টাম নাম্বারেরও সর্বনিম্নটি বোঝাতে।

এই উপ-কোয়ান্টাম নম্বরের উচ্চতর মাত্রাগুলোকে বলা হয় যথাক্রমে p, d, f ইত্যাদি। এখন অরবিটাল জিনিসটির মানে কি তা স্মরণ করলে আমরা বুঝতে পারি যে ইলেকট্রনটি সর্বনিম্ন শক্তির অবস্থায় থাকার সময় এই অরবিটালের অঞ্চলে তার থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশি। আরো জানি নিউক্লিয়াসের কিনারা থেকে শুরু করে এই অঞ্চলটি একটি গোলকের আকারের। আর এটিই কিনা ইলেকট্রনের ভারসাম্যের অবস্থা। এর ওপরের উত্তেজিত অবস্থার p, d ইত্যাদি অরবিটালগুলো গোলকের আকারের হয়না, যেমন 2p নামের অরবিটালটি ডাম্বেলের আকৃতির – তার অক্ষের একটি দিক থাকে, ডাম্বেলের লম্বালম্বি হবার দিকের মত, এখন হাইড্রোজেনের থেকে জটিলতর এটমের ক্ষেত্রে সরলীকরণ করার প্রক্রিয়ায় আমরা হাইড্রোজেনের উত্তেজিত অরবিটালগুলোকেই ওই অন্য এটমের স্বাভাবিক ও উত্তেজিত অরবিটাল হিসেবে পেতে পারি, তাদেরকে কিছুটা বদলে নেবার মাধ্যমে। তাদের নাম ওই 1s, 2s, 2p ইত্যাদির হাইড্রোজেনের মত একই থাকে, আকৃতিও প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে একই রকম থাকে; শুধু কোন্‌টি এই নতুন এটমে কত বড় এলাকা জুড়ে আসবে, তার শক্তির পরিমাণ কত হবে সে সব নতুন এটমের কিছুটা ভিন্ন তরঙ্গ ফাংশান সমাধান থেকে ভিন্ন ভাবে আসবে। যেমন কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি কিছু এটমের ক্ষেত্রে হাইড্রোজেনের এক একটি উত্তেজিত অবস্থার অরবিটাল এই এটমটির নিম্নতম ভারসাম্যের অবস্থার সমতুল্য হতে পারে– তাই হাইড্রোজেনের ওই অরবিটালের আদলে এই নতুন এটমের জন্য সরলীকৃত তরঙ্গ ফাংশান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। তখন এসব এটমের বাড়তি ইলেকট্রনগুলোর কতটি কোথায় যাবে তার সম্ভাবনাগুলোও সেখান থেকে স্পষ্ট হয়। যখন দুটি এটম মিলে একটি অণু গঠিত হয় তখন সেই অণু গঠন কতটা সম্ভব, গঠিত হলে তার প্রকৃতি কেমন হবে তা নির্ভর করে ওই এটম দুটির সব থেকে বাইরের অরবিটালগুলোর মিলিত আচরণের ওপর। কাজেই অরবিটালগুলো নিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় হিসেবগুলো অণু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে চমৎকার কাজে লাগে।

এ প্রসঙ্গে আমরা এটমে এটমে রাসায়নিক বন্ধনের মধ্যে বেশ সুপরিচিত এক প্রকারের বন্ধনের উদাহরণ নিতে পারি যাকে বলা হয় কোভ্যালেন্ট বন্ধন। এরকম বন্ধনে সাধারণত সব থেকে বাইরের অরবিটালে থাকা ইলেকট্রন একই সঙ্গে অন্য এটমের বাইরের অরবিটালেও থাকতে পারে– যাকে বলা যায় উভয় এটম এই ইলেকট্রনকে 'শেয়ার' করছে (একত্রে ব্যবহার করছে)। শুধু নিজের ইলেকট্রনটি মূল এটমের ওই সবচেয়ে বাইরের অরবিটালে থাকলে অরবিটালটি কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় ভাবে সম্পূর্ণ হতে পারেনা– আমরা জানি সে রকম সম্পূর্ণ

হতে অন্তত দুটি ইলেকট্রন লাগে। একই পরিস্থিতি যদি অণুর উভয় এটমের ক্ষেত্রে থাকে তা হলে উভয়ের ইলেকট্রন দুটিকে উভয়ে শেয়ার করলে ওভাবে উভয়ে বাইরের অরিবিটালটি পূর্ণতা পেতে পারে। ওভাবে শেয়ার করা অবস্থায় উভয় এটমের মোট শক্তি, যার যার ইলেকট্রন নিয়ে থাকা অবস্থায় উভয়ের মোট শক্তি থেকে কম হয় বলেই অণু গঠনটি তাদের পক্ষে শক্তির দিক থেকে বেশি উপযোগী হবে। কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক হিসেব আমাদেরকে বলে দেবে যে ওই বন্ধনের জায়গাটিতে যেখানে দুই এটমের সবার বাইরের অরবিটাল দুটি একের ওপর অন্যটি উপরিপাতিত হয় সেখানে মিলিত অরবিটালটি একক অরবিটালের থেকে অপেক্ষাকৃত বড় জায়গায় ছড়িয়ে থাকে। ফলে ইলেকট্রনের অবস্থানের অনিশ্চয়তা কিছু বেড়ে গিয়ে তার বেগের অনিশ্চয়তা কিছু কমে যায়, বেগের ব্যাপ্তি কমে যায় বলে ইলেকট্রনের গতীয় শক্তিও কমে। একারণে একা থাকার চেয়ে বন্ধনে থাকা অবস্থাতেই মোট শক্তি কম হয় বলে ওই বন্ধনটিই হয় দুই এটমের ভারসাম্যের অবস্থা। তাছাড়া দুই এটমের দুই s অরবিটাল অথবা দুই p অরবিটালের মধ্যে উপারপাতনে সেই ভাঙ্গাগড়া বা ইন্টারফেরেন্স ঘটে তাতে হিসেব অনুযায়ী ভাঙ্গা নয় বরং গড়াটাই বেশি হওয়ার কথা। এমন গঠনমূলক ইন্টারফেরেন্সেও অণুর মোট শক্তি হ্রাস পায়। এভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্বই বলে দিচ্ছে কেন কোন্ ক্ষেত্রে কোভ্যালেন্ট বন্ধনে অণু গঠিত হচ্ছে।

কোভ্যালেন্ট বন্ধনকে যদি ওপরের মত ভাবে হিসেব করি তাহলে দেখা যায় বন্ধনের ব্যাপারটি দুই এটমের মাঝামাঝি একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকে–ঠিক ওখানটাতেই দুই এটমের সবার বাইরের অরবিটাল দুটি পরস্পরের সঙ্গে উপরিপাতিত হয়ে বন্ধন সৃষ্টি করে। এ যেন দুটি এটম পরস্পরের সংলগ্ন হয়ে শুধু সংলগ্ন হবার জায়গাটিতে আঠার মত একটি বন্ধনে জোড়া থাকা। কিন্তু ব্যাপারটিকে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকেও হিসেব করা যায় যা কোভ্যালেন্ট বন্ধনের জন্য কিছুটা ভিন্ন একটি তত্ত্ব দেয়। সেক্ষেত্রে আমরা ওই মিলিত অরবিটালটিকে পুরো অণুর একটি অরবিটাল হিসেবে বিবেচনা করতে পারি তাতে গাণিতিক হিসেবটা কিছুটা ভিন্ন রকমের হয়। এর বড় ফলটি হবে বন্ধনের ব্যাপারটি দুই এটমের মাঝখানের নির্দিষ্ট জায়গায় না থেকে পুরো অণু জুড়েই রয়েছে এমন কল্পনা করতে হবে। দুই এটমের মাঝখানে নির্দিষ্ট একটি বন্ধনকে কল্পনা করা যতটা বাস্তবের মত, এই দ্বিতীয় কল্পনাটি সেরকম না হলেও অণুটি সম্পর্কে অধিক তথ্য পাওয়ার জন্য দ্বিতীয়টিই বেশি সুবিধাজনক। আর এজন্য সেটিই সাধারণত ব্যবহৃত হয়। এভাবে পুরো অণুর অরবিটাল থেকে আমরা দেখতে পাই কোন কোন অণু তার দুই প্রান্তে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুতের

'মেরু' সৃষ্টি করে– যা রাসায়নিক ভাবে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরও দেখতে পাই এক একটি অণু অনেক সময় একটি স্প্রিংঙের মত কিছু নির্দিষ্ট স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সিতে কাঁপতে পারে। বাইরের থেকে শক্তি শোষণ করে এরা এটি করতে পারে এবং এই কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি সাধারণত ইনফ্রোরেড তরঙ্গ-দৈর্ঘের মত হতে পারে যা কিনা আমাদের অনুভূত উত্তাপের তরঙ্গ-দৈর্ঘের পর্যায়ের। উদাহরণ স্বরূপ দেখা গেছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড অণুর এমনি কম্পনের স্বাভাবিক ফ্রিকোয়েন্সি সূর্যতাপে গরম ভূপৃষ্ঠের ছেড়ে দেয়া উত্তাপ তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে এমন মিলে যায় যে তা এই উত্তাপের শক্তি শোষণ করে ওভাবে কাঁপতে পারে। বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই অক্সাইড ওই বিকীর্ণ উত্তাপকে তাই মহাকাশে চলে যেতে বাধ সাধে এবং তা আবার পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিয়ে ভূপৃষ্ঠের গড় উত্তাপকে ক্রমাগত বাড়িয়ে ফেলতে পারে। এটিই গ্রীন হাউস এফেক্ট। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড যেতে না দেয়াটাই এর একমাত্র সমাধান। এভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক ঘটনার হদিশ আমরা পাই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি থেকে।

দুটি এটমের মধ্যে কো-ভ্যালেন্ট বন্ধনও অনেক সময় ওরকম সোজা-সাপটা না হয়ে একটু মিশ্র প্রকৃতির হয়ে থাকে– কোয়ান্টাম তত্ত্বে যার ব্যাখ্যাও সম্ভব হয়েছে। যেমন মিথেন একটি বেশ সরল অণু যাতে একটি কার্বন এটমের সঙ্গে চারটি হাইড্রোজেন এটম কো-ভ্যালেন্ট বন্ধনে থাকে। এর আচরণ থেকে আমরা জানি যে এই অণুটি একটি নিয়মিত টেট্রাহেড্রন (সমান চারটি সমবাহু ত্রিভুজাকার তলে গঠিত) সলিডের আকার ধারণ করে যাতে কার্বন এটমটি থাকে টেট্রাহেড্রনের ভেতরের স্থানটিতে আর চারটি হাইড্রোজেন এটম থাকে টেট্রাহেড্রনের চারটি কোনার বিন্দুতে। এভাবে কার্বন এটম থেকে চারদিকে বিস্তৃত হয়ে কার্বন-হাইড্রেজেনের চারটি সমান বন্ধান-রেখা পরস্পরের সঙ্গে সমকোণ করে থাকে। প্রত্যেকটি বন্ধন যথেষ্ট জোরালো বন্ধন হয়। কিন্তু সরলীকৃত কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক হিসেবে যা পাওয়া যায় তা কিন্তু কিছুটা ভিন্ন কথা বলে। এতে দেখা যায় কার্বন এটমটির s অরবিটালের একটি ইলেক্ট্রন একটি হাইড্রোজেন এটমের ইলেকট্রনের সঙ্গে শেয়ার করে মিথেনের একটি বন্ধন তৈরি হয়। আর অন্য তিনটি বন্ধন তৈরি হয় কার্বন এটমের তিনটি p অরবিটালের তিনটি ইলেকট্রনের প্রত্যেকটি একটি করে হাইড্রোজেন এটমের ইলেকট্রনের সঙ্গে শেয়ার করে। এখন p অরবিটাল যেহেতু লম্বাটে ডাম্বেল আকৃতির, এবং তুলনামূলক ভাবে বেশি শক্তির ওই শেষের তিনটি বন্ধন তিনটি পরস্পর সমকোণে থাকা সরল রৈখিক বন্ধন গঠন করবে এবং বেশ সবলও হবে। কিন্তু s

অরবিটাল গোলকাকার তার কোন রৈখিক দিক নেই, আর তার শক্তিও কম; কাজেই তার দ্বারা তৈরি বন্ধনটি সব দিকে বিস্তৃত দুর্বল প্রকৃতির হবে। স্পষ্টত কোয়ান্টাম তত্ত্বের এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবের সঙ্গে মেলেনা। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বেই তার সমাধান পাওয়া গেল– মিশ্র বন্ধনের (হাইব্রিড বন্ড) ধারণাটি এনে। এতে আগের হিসেবে যেমনটি পাওয়া গিয়েছিলো সেই তিনটি p বন্ধন ও একটি s বন্ধনের বদলে বরং চারটি সমান মিশ্র sp^3 বন্ধন খুঁজে পাওয়া গেলো– যেগুলোর প্রত্যেকটি কিনা s ও p বন্ধনের এক রকম উপরিপাতন। এই উপরিপাতনে এক ভাগ s এর সঙ্গে তিন ভাগ p থাকে। চারটি বন্ধনই সমান শক্তিশালী হয় এবং পরস্পরের সঙ্গে সমকোণ করে থাকে– যা কিনা বাস্তবের সঙ্গে সুন্দর মিলে যায়। চিরায়ত কেমিস্ট্রিতে এরকম ব্যাখ্যা পাওয়া এবং সমকোণে সমান শক্তিতে থাকা চারটি বন্ধনের রহস্যের সমাধান কখনোই সম্ভব হতো না।

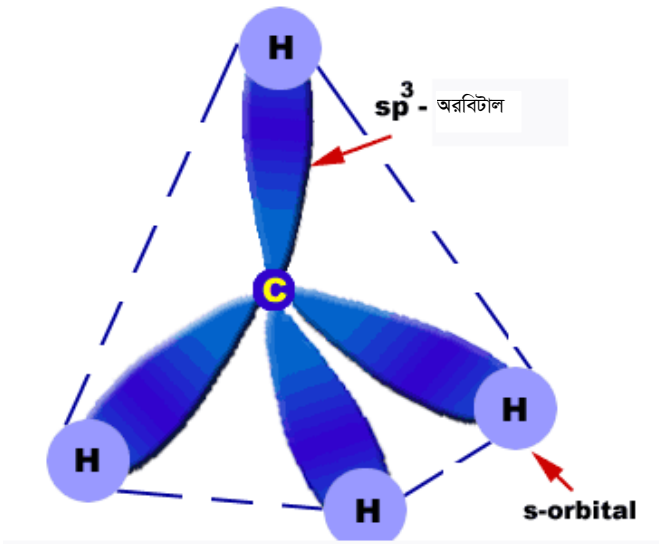

একটি কার্বন এটম ও চারটি হাইড্রোজেন
এটমের গড়া মিথেন অণুর অরবিটাল গঠন

সেমিকন্ডাক্টর বস্তুর ব্যাখ্যাঃ

কঠিন পদার্থের নানা গুণের ব্যাখ্যা করতে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যবহারটি খুব উপযোগী, কোন কোন ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ছাড়া কোন ব্যাখ্যা করাই যায় না। সেমিকন্ডাক্টর বস্তুর বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার ব্যাখ্যা তেমনি একটি জিনিস।

আধুনিক ইলেকট্রনিক্স এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিতে সেমিকন্ডাক্টরের কাজের এই ব্যাখ্যাটি পাওয়া জরুরি। আগেই দেখেছি হাইড্রোজেন এটমের থেকে সামান্য জটিলতর এটমেই সরলীকরণ ছাড়া কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যবহার সম্ভব হয়না। কেমিস্ট্রিতে যখন একাধিক এটম নিয়ে কাজ করতে হয় তখন শুধু সরলীকরণের সুযোগ নিয়েই কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রির হিসেব নিকেশ চলে। কঠিন পদার্থের টুকরার এমন অসংখ্য এটম নিয়ে যেখানে কারবার, সেখানে সমস্যাটি আরো জটিল হওয়ার কথা। কিন্তু অধিকাংশ কঠিন পদার্থ কৃস্টালের আকারে থাকে– যাতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর একই এটম অথবা অণু সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত থাকে, সাধারণত পাশাপাশি, সামনে-পেছনে, ওপরে-নিচে সব দিকে এভাবে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। এটম ইত্যাদির এই সুশৃঙ্খল বিন্যাস কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগে সরলীকরণের একটি বিরাট সুযোগ এনে দেয়।

কঠিন পদার্থের কৃস্টালে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগটি সহজ ভাবে দেখার জন্য তিনমাত্রার বদলে এক মাত্রার একটি কৃস্টালকে কল্পনা করে নিই। ধরা যাক পাশাপাশি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর একটি করে এটম এতে রয়েছে। এর জন্য শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ খাড়া করতে গেলে পুরো এই কৃস্টালটির জন্য জমে থাকা শক্তির পরিস্থিতি জানা দরকার। এর ঠিক যেখানটিতে একটি এটমের নিউক্লিয়াস এবং ভেতরের ইলেকট্রনগুলো রয়েছে, ধরে নিতে পারি এটমটির এই কেন্দ্রীয় ধনাত্মক অংশটি ওখানে স্থির রয়েছে। এর ধনাত্মক চার্জের প্রভাবে ওখানটিতে জমে থাকা শক্তিকে স্থানের বিপরীতে শক্তি লেখচিত্রে একটি গভীর কূয়ার আকৃতির মত দেখাবে যা নিচের দিকে সরু হয়ে নেমেছে, আর ওপরের দিকে ফানেলের মত একটু প্রশস্ত হয়ে কূয়ার মুখ লেখচিত্রের শূন্য-রেখায় রয়েছে। কূয়ার এই প্রশস্ত মুখটি একটু দূর প্রায় সমতল ভাবে গিয়ে পরের এটমের সৃষ্ট ঠিক একই রকম পরের কূয়ার মুখের সঙ্গে মিলিত হয়: এভাবে পর পর এটমের কূয়াগুলোর মুখগুলো সংযুক্ত হয়। এই সারিবদ্ধ শক্তি-কূয়াগুলোই ওখানে জমে থাকা শক্তির চিত্র, এটি পুরো কৃষ্টালেরই জমে থাকা শক্তির একটি সরলীকৃত রূপ। প্রত্যেকটি এটমের নিউক্লিয়াস থেকে দূরে বাইরের দিকের ইলেকট্রনগুলো কেন্দ্রীয় অংশের সঙ্গে দুর্বল বন্ধনে রয়েছে বলে সেগুলো প্রায় স্বাধীন ভাবে পুরো কৃস্টালে বিচরণ করতে পারে, কোন বিশেষ এটমের সঙ্গে আবদ্ধ না থেকে। তাই বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার জন্য এই ইলেকট্রনগুলোই দায়ী, এবং ওপরে বর্ণিত ওই জমে থাকা শক্তির দ্বারা এদের গতিবিধি প্রভাবিত হয়। জমে থাকা শক্তির এই চিত্রের ভিত্তিতে শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ খাড়া করা যায়। তবে এই সরলীকৃত চিত্রকে আরো সরলীকৃত করার সুযোগ আছে।

এমনি একটি সরলীকৃত চিত্রে পর পর ফানেলের মত কূয়াগুলোকে আরো সরল সোজা আয়তাকার বাক্সের আকারের গর্তের মত ধরে নেয়া হয়েছে। পর পর এই আয়তাকার গর্তের আকৃতির জমা শক্তির গাণিতিক রূপ অনেক সরল বলে এর ভিত্তিতে সহজেই সরল প্রকৃতির শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। অথচ ওই কঠিন পদার্থের কৃস্টালের বাস্তব যেই পরিস্থিতি তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো এই সরল চিত্রেও ঠিকই প্রতিফলিত হয়েছে, কাজেই এই সমীকরণ থেকেই সেগুলো ধরা পড়া উচিত। এই সমীকরণের সমাধান করতে গিয়েও এই গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর কথা মনে রেখে সমাধানের আদলটি আগে থেকেই আন্দাজ করা হলো। বোঝা গেল আদলটি হবে দুটি অংশের গুণফল। একটি অংশ গাণিতিক ভাবে প্রতিনিধিত্ব করবে সর্বত্র সমান ভাবে বিস্তৃত সমান্তরাল সম্ভাবনা-তরঙ্গের প্রবাহকে; এবং অন্য অংশটি হবে পর পর এটমের দূরত্বের সমান নির্দিষ্ট দূরত্বে পুনরাবৃত্ত হবার মত একটি ফাংশান। বাস্তব পরিস্থিতির কারণেই এই দুটি অংশ যৌক্তিক ভাবে এতে আসে। পরিবাহী ইলেকট্রনগুলো কৃস্টালের সর্বত্র সমান ভাবে বিরাজ করে বলে ধরে নেয়া যায়– সে কারণে প্রথম অংশ। কিন্তু ওই পরিবহন ইলেকট্রনগুলো ওপরে কল্পিত ওই আয়তাকার গর্তের কাছে এলে এর দ্বারা খানিকটা হলেও আকৃষ্ট হয়, কিন্তু দুই গর্তের মাঝামাঝি শূন্য জমা-শক্তি অঞ্চলে থাকা কালে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায় কাজেই এটি ওই নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর পুনরাবৃত্ত একটি ফাংশান। এই আন্দাজকৃত সমাধানটি সমীকরণের মধ্যে দিয়ে আসল সমাধানটি অর্থাৎ ওই কৃস্টালের তরঙ্গ-ফাংশানটি সহজেই পাওয়া যায়। এটি প্রকৃত অবস্থাকে গ্রহণযোগ্য ভাবেই প্রকাশ করতে পারে।

এই তরঙ্গ-ফাংশান থেকেই আমরা পেয়ে যাই কৃস্টালটিতে বিদ্যুৎ পরিবাহিতার অবস্থা। দেখা যায় যে এতে ইলেকট্রনগুলো খুবই সামান্য শক্তি ব্যবধানে বিভিন্ন শক্তিতে থাকতে পারে একটি নিম্নতম ও একটি উচ্চতম শক্তির মাঝখানে। এই দুই শক্তিসীমা এতে শক্তির একটি ব্যান্ডের রূপ দেয় যাকে বলা হয় শক্তি ব্যান্ড (শক্তি ফিতা)। পর পর গায়ে গায়ে লাগা অনেক শক্তি মাত্রা প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে থেকেই এই শক্তি ব্যান্ড সৃষ্টি হয়েছে। একেবারে সর্ব নিম্ন শক্তি ব্যান্ড থেকে সর্বোচ্চ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি ব্যান্ড থাকে। আর দুই ব্যান্ডের মাঝখানের যে শক্তি থাকার কথা সেগুলো কিন্তু অনুমোদিত নয়, অর্থাৎ ওই শক্তির কোন ইলেকট্রন থাকতে পারেনা। তাই একটি ব্যান্ডের ওপরের সীমা থেকে পরের ব্যান্ডের নিচের সীমা পর্যন্ত এই অননুমোদিত অংশকে বলা হয় শক্তি গ্যাপ (এনার্জি গ্যাপ)। কোয়ান্টাম তত্ত্বে এরকম অননুমোদিত শক্তি মাত্রা আমরা আগে এটমের মধ্যে থাকতে দেখেছি। এখন একটি এটমের বদলে বহু এটমের সারি রয়েছে বলে

ওরা একসঙ্গে সরু শক্তি মাত্রার বদলে প্রশস্ত শক্তি ব্যান্ডের রূপ ধারণ করেছে। এভাবে সর্বোচ্চ শক্তির যে ব্যান্ডটি পাওয়া যায় তাকে বলা হয় পরিবহন ব্যান্ড, কারণ পরিবহন ইলেকট্রনগুলো এই ব্যান্ডের শক্তিতেই থাকে।

যদি ওই ব্যান্ডের নিচের অংশে পরিবহন ইলেকট্রন থাকার পর ওপরের অংশটি খালি থাকে তা হলে ওই কৃস্টালের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা গুণ থাকে। বিদ্যুৎ পরিবাহী কঠিন বস্তুগুলোর ব্যান্ড এমনটিই হয়ে থাকে। বস্তুটিতে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে এর শক্তিতে এই ব্যান্ডের ইলেকট্রনগুলো বাড়তি শক্তি পেয়ে ব্যান্ডের খালি অংশগুলোতে উন্নীত হতে পারে। এ কারণেই এতে বিদ্যুৎ পরিবহন সম্ভব হয়। বিভিন্ন ধাতু এবং অন্যান্য কিছু বস্তু যার ভেতর দিয়ে খুব সহজে বৈদ্যুতিক কারেন্ট যেতে পারে তাদের পরিবহন ব্যান্ড এরকম। এই পরিবহন ব্যান্ডটির নিচের ব্যান্ডটির পুরোটাই ইলেকট্রনে পূর্ণ থাকে– ওকে বলা হয় ভ্যালেন্স ব্যান্ড। এই ইলেকট্রনগুলো নানা এটমে আটকা থাকে বলেই এই নাম। পরিবহন ব্যান্ড আর ভ্যালেন্স ব্যান্ডের মাঝের শক্তি আমাদের কাছে প্রাসঙ্গিক 'শক্তি গ্যাপ'।

কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যেখানে পরিবহন ব্যান্ডে কোন ইলেকট্রনই থাকেনা। তার সঙ্গে ওই এনার্জি গ্যাপটি যদি এত বড় হয় যে এতে অন্য ভাবে শক্তি দেয়া হলেও নিচের ভ্যালেন্স ব্যান্ডের কোন ইলেকট্রন ওই গ্যাপ অতিক্রম করে পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারেনা। কাজেই এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পরিবহণের কোন সুযোগ থাকেনা। প্লাস্টিক, সিরামিক, কাঠ ইত্যাদি সে সব বস্তুর ভেতর দিয়ে বৈদ্যুতিক কারেন্ট যায়না সেগুলো এই দলে। কিন্তু এনার্জি গ্যাপটি যদি ছোট হয়, তা হলে পরিবহন ব্যান্ডে কোন ইলেকট্রন না থাকলেও ভ্যালেন্স ব্যান্ডের ওপরের দিকের ইলেকট্রনগুলো এই গ্যাপ অতিক্রম করে পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারে। যদি আলো ফেলার মাধ্যমে তার ফোটনের শক্তি পেয়ে অথবা উত্তাপের কারণে শক্তি কোয়ান্টাম লাভ করে– একটি ইলেকট্রন ওই গ্যাপ অতিক্রম করে পরিবহন ব্যান্ডে যেতে পারে, তখন ওই ইলেকট্রনটি সেখানে বিদ্যুৎ পরিবহনের কাজে লাগে। একই সঙ্গে ইলেকট্রনটি চলে যাওয়ার ফলে একেবারে পরিপূর্ণ ভ্যালেন্স ব্যান্ডে যে খালি জায়গা বা গর্ত (হোল) রেখে যায় পূর্ণ ঋণাত্মক চার্জে একটি চার্জের অভাব ঘটাতে ওই হোলটি একটি ধনাত্মক চার্জের মত কাজ করতে পারে, এবং পূর্ণ ব্যান্ডের মধ্যে খালি জায়গাটি এক শক্তি থেকে অন্য শক্তিতে অর্থাৎ ওই ব্যান্ডের ভেতরে চলাচল করতে পারে। কাজেই হোলটি ভ্যালেন্স ব্যান্ডে বিদ্যুৎ পরিবহনের কাজ করতে পারে। এভাবে ফোটন শোষণ করে এই যে একটি ইলেকট্রন ও একটি হোলের জোড়া তৈরি হলো উভয়ে একই সঙ্গে

কৃস্টালটির মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবহনের কাজ করবে। এর ফলে এই বস্তুও বিদ্যুৎ পরিবাহী হতে পারবে এবং তা নির্ভর করবে আলো বা উত্তাপের মাধ্যমে শক্তি দেয়া হচ্ছে কিনা তার ওপর। এটি আগের সেই পরিবাহীর মত সব পরিস্থিতিতে পরিবাহী নয় বলে একে বলা হয় আধা পরিবাহী বা সেমিকন্ডাক্টর। সিলিকন, জার্মেনিয়াম এরকম কিছু বস্তুর এই সেমিকন্ডাক্টর বা আধাপরিবাহী হবার গুণ রয়েছে।

কখনো কখনো এই সেমিকন্ডাক্টরের সঙ্গে বিশেষ রকম ভিন্ন বস্তু মেশালে তাতে পরিবহন ব্যান্ডে আরো সহজে ইলেকট্রন আসতে পারে সেই ভিন্ন বস্তু থেকে। এই ক্ষেত্রে পরিবহন শুধু ইলেকট্রন দিয়ে ঘটে বলে একে বলা হয় n টাইপ (নেগেটিভ টাইপ) সেমিকন্ডাক্টর। আবার অন্য রকম ভিন্ন বস্তু মেশালে সেই ভিন্ন বস্তু থেকে সেমিকন্ডাক্টরটির ভ্যালেন্স ব্যান্ডে সহজে হোল সৃষ্টি হতে পারে। এই ক্ষেত্রে শুধু হোল দিয়ে পরিবহন ঘটে বলে একে বলা হয় p টাইপ (পজিটিভ টাইপ) সেমি কন্ডাক্টর। n টাইপ ও p টাইপ সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে সংযোগ স্থল বা জাংশান সৃষ্টি করে আমরা ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি ডিভাইস তৈরি করি যার ভিত্তিতে গড়ে ওঠেছে আধুনিক ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার প্রযুক্তি ইত্যাদি। এতে সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সিলিকন সেমি-কন্ডাক্টরটি। এর এনার্জি গ্যাপের পরিমাণটি ওপরের কাজগুলো করার জন্য ভাল উপযোগী হওয়াটাই তার বড় সুবিধা। কোয়ান্টাম তত্ত্বের নানা হিসেব নিকেশ অনুযায়ী গবেষণা চালাতে না পারলে এই অনবদ্য সেমিকন্ডাক্টর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গড়ে ওঠা সম্ভব হতো না, কারণ চিরায়ত বিজ্ঞান দিয়ে একে বোঝা সম্ভব হতো না।

ব্যতিক্রমী আলোর কোয়ান্টাম কৌশল: লেজার

এটম থেকে কীভাবে আলো নি:সরিত হয় সেটি আমরা দেখেছি। প্রায় একই সঙ্গে অসংখ্য এটম থেকে নি:সরিত হয়ে আলোটি আমাদের কাছে দৃশ্যমান হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি এটমের নি:সরণে মধ্যে কোন সমন্বয় না থাকাতে প্রত্যেকটি নিজ নিজ তালে নি:সরণ করে; ফলে সামগ্রিক আলোর সূক্ষ্ম ভাবে একই ফ্রিকোয়েন্সি হয়না, তাছাড়া এ আলো একই সমান্তরালে না গিয়ে তার বরং ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা থাকে, তীব্রতায়ও ঘাট্তি থাকে। আমাদের পরিচিত সাধারণ সব আলো এসব দোষে দুষ্ট। তবে এসব থেকে মুক্ত ব্যতিক্রমী এক আলো কোয়ান্টাম কৌশলের কারণে উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে– সেটি লেজার।

সাধারণভাবে আমরা দেখেছি শক্তি শোষণ করে উত্তেজিত এটমে নিচের শক্তি অবস্থা থেকে ওপরের শক্তি অবস্থায় যখন ইলেকট্রন যায়, তখনই এটি আবার নিচের অবস্থায় ফিরে আসার সময় আলো নি:সরণ করে। উদাহরণ স্বরূপ ফ্লোরোসেন্ট আলোর ক্ষেত্রে এটি দেখেছি। উত্তেজিত হবার পর পর এই আগের জায়গার ফিরে আসার মাধ্যমে 'অবক্ষয়ের' ঘটনাটি ঘটে একেবারে স্বত:প্রণোদিত ভাবেই কোন্ এটমে কোন্ ক্ষণে কোন্ দিকে এই নি:সরণ ঘটবে তা দৈবক্রমেই (চান্স) ঠিক হয়– এর জন্য অন্য কিছুর ইঙ্গিত বা উৎসাহের প্রয়োজন হয়না। এ কারণে এমনি সব নি:সরণকে বলা হয় স্বত:নি:সরণ (স্পনট্যানিয়াস এমিশন)। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বের উচ্চতর গাণিতিক বিবেচনায় আরো এক রকমের নি:সরণের সন্ধান পাওয়া গেছে যাকে বলা যায় উৎসাহিত নিঃসরণ (স্টিম্যুলেটেড এমিশন)। লেজার সম্ভব হয়েছে এই উৎসাহিত নিঃসরণের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে।

ধরা যাক্ বাইরের শক্তি শোষণ করে একটি ইলেকট্রন ইতোমধ্যে ওপরের কোন অবস্থায় চলে গিয়েছে, এবং এটমটি তাই উত্তেজিত অবস্থায় আছে। এটি অবক্ষয়িত হবার আগেই ঠিক ওই উত্তেজিত হবার শক্তি ও ভরবেগের অনুরূপ শক্তি ও ভরবেগ নিয়ে যদি একটি আলোর ফোটন ওই বস্তুতে প্রবেশ করে আগের এটমটিকে আঘাত করে তাহলে কী হবে? এর ফলে যে এটমটির ইলেকট্রন এই আঘাতের শক্তি শোষণ করে ওপরের ওই একই অবস্থায় যাবে সেই উপায় নেই, কারণ ওই অবস্থাটি ইতোমধ্যে দখল হয়ে আছে। কিন্তু কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক কিছু গাণিতিক বিশ্লেষণ বলে দিচ্ছে আগন্তক ফোটনটি অন্য রকমের একটি প্রভাব ওই এটমটির ওপর রাখবে– তক্ষুণি এটমটিকে অবক্ষয়িত হতে বাধ্য করবে অর্থাৎ ইতোমধ্যে ওপরের অবস্থায় থাকা ইলেকট্রনটিকে নিচে নামিয়ে এনে ঠিক নিজের সমান শক্তি ও ভরবেগের একটি নতুন ফোটনের নি:সরণ ঘটাবে। আগন্তুক ফোটনটির সৃষ্ট উৎসাহে ঘট্লো বলে এটি একটি উৎসাহিত নি:সরণ। এর ফলে ওই বস্তুটির মধ্যে চলমান আগন্তুক ফোটনটির সঙ্গে একই সঙ্গে চলার মত একই রকম আর একটি ফোটন যোগ হলো, আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি পেলো। এই দুটি ফোটনের একটি হলো আগন্তুক ফোটন, আর অন্যটি তার উৎসাহে নিঃসরিত ফোটনটি। একটির জায়গায় দুটি ফোটন সৃষ্টি হওয়াতে ঘটনাটিকে আমরা বলতে পারি বিবর্ধন (অ্যাম্প্লিফিকেশ্যান)। উভয়ের একই সঙ্গে চলা মানে হলো একই তালেও চলা– এই দুইয়ের মধ্যে তরঙ্গের দশার (ফেইজ) পার্থক্য সব সময় একই থাকা, অর্থাৎ একের তরঙ্গের থেকে অন্যের তরঙ্গের যেটুকু আগে পিছে থাকা তা একই থাকা। এমনি যদি হয় তবে

ফোটন দুটিকে বলা হয়ে পরস্পর কোহেরেন্ট অর্থাৎ সুসমঞ্জস। সাধারণ আলোতে একটি ফোটন অন্যটির সঙ্গে এরকম সুমঞ্জস থাকেনা। এখানে একটি লেজারের প্রাথমিক সূচনা হলো, আর এর মধ্যেই লেজার নামের উৎপত্তিটা আমরা পেয়ে গেলাম যা কিনা 'লাইট অ্যাম্প্লিফিকেশ্যান বাই স্টিম্যুলেটেড এমিশন অফ র‍্যাডিয়েশন' এই কথাটির আদ্যাক্ষর নিয়ে তৈরি। উৎসাহিত নি:সরণের মাধ্যমে আলোর বিবর্ধন ঘট্ছে বলেই এই নাম।

কিন্তু একটি ফোটন থেকে দুটি হয়ে ব্যাপারটি থেমে গেলে এর থেকে কোন লাভ নেই। লাভ পেতে গেলে বিবর্ধনের এই প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে, আর এটি সম্ভব হয়েছে ওপরে সংখ্যা বৃদ্ধি (পপুল্যাশন ইনভারশন) নামের একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এটমে ভারসাম্যের অবস্থায় নিচের শক্তি অবস্থাগুলো ইলেকট্রনে পূর্ণ থাকে, উত্তেজিত হলে কিছু কিছু ইলেকট্রন ওপরের অবস্থায় যায় বটে, কিন্তু নিচের অবস্থার ইলেকট্রন সংখ্যা সব সময় ওপরে অবস্থার ইলেকট্রন সংখ্যার থেকে বেশি থাকে। এমন পরিস্থিতিতে খুব বেশি 'উৎসাহিত নি:সরণের' আশা করা যায় না, বিবর্ধনেরও না। কিন্তু এই ব্যাপারটিকে উল্টিয়ে দিয়ে ওপরের অবস্থায় অর্থাৎ কোয়ান্টাম লাফের শুরুর অবস্থায় লাফ দেয়ার মত বেশি ইলেকট্রনের ব্যবস্থা করা যায় যার সংখ্যা নিচের অবস্থায় থাকা ইলেকট্রনের থেকে বেশি থাকে। এতে নিচের অবস্থায় খালি জায়গা বেশি থাকায় লাফ দিয়ে ওপরের ওই বেশি ইলেকট্রন নিচের খালি অবস্থায় যেতে পারবে। এভাবে দ্রুত প্রচুর বিবর্ধনের ব্যবস্থা করা সম্ভব। এটিই 'ওপরে সংখ্যা বৃদ্ধি'। এটি স্বাভাবিক ভাবে হবার কথা নয়। তবে এমন কিছু বিশেষ বস্তু বেছে নেয়া সম্ভব যেখানে বাইরের শক্তি শোষণ করে কিছু ইলেকট্রন উচ্চ শক্তির অবস্থায় যাওয়ার পর স্বত:নি:সরণে একেবারে নিচের অবস্থায় ফিরে না এসে আগের উচ্চ অবস্থার কাছাকাছি একটি মধ্যবর্তী অবস্থায় নেমে আসে। শুধু তাই নয়, এভাবে নেমে এসে এই মধ্যবর্তী অবস্থায় ইলেকট্রন অধিক্ষণ থেকেও যেতে পারে। ওই অধিক সময়ের মধ্যে আরো বহু এটমের মধ্যে এই মধ্যবর্তী অবস্থায় ইলেকট্রন নেমে এসে থাকতে পারে– যেন অনেক এটম তার ইলেকট্রনগুলোকে এই মধ্যবর্তী অবস্থায় তুলে রাখে, যা সাময়িক ভাবে ওপরে সংখ্যা বৃদ্ধির অবস্থা সৃষ্টি করে। লেজার সৃষ্টির জন্য এরকম বিশেষ কিছু বস্তু বেছে নিতে হয়, অনেক সময় দুটি বস্তু একসঙ্গে– যেমন খুবই পরিচিত অপেক্ষাকৃত সরল হিলিয়াম-নিওন লেজারে এই দুটি গ্যাসকে একসঙ্গে নিতে হয় যেন ওই মধ্যবর্তী অবস্থাটি সৃষ্টি করা যায়।

সাধরণত লেজার প্রক্রিয়াটি শুরু করে দেয়ার জন্য এমন একটি আলো উৎস ব্যবহার করা হয় যা খুব অল্পক্ষণের জন্য ফ্ল্যাশের মত জ্বলে ওঠে তীব্র আলো

সৃষ্টি করে। অবশ্য আরো সাধারণ বৈদ্যুতিক আলো উৎসও এতে ব্যবহার করা যায়। এই আলোর কারণে ওই বিশেষ লেজার বস্তুতে এটমগুলোর ভূমি অবস্থা থেকে খুব দ্রুত ইলেকট্রন একটি উচ্চ অবস্থায় স্থানান্তরিত হয় এবং পরক্ষণেই ওই মধ্যবর্তী অবস্থায় নেমে আসে। এমনি নেমে আসার প্রক্রিয়ায় নি:সৃত শক্তি সাধারণত উত্তাপ হিসেবেই নির্গত হয়ে যায়। ওই মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকায় সময়টি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হওয়াতে ইলেকট্রনগুলো ওখানে একটি ওপরে সংখ্যা বৃদ্ধির পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। ওই সময়ের মধ্যে যথাযথ শক্তি ও ভরবেগের ফোটনের আলো ওই লেজার বস্তুর ওপর ফেল্‌লে সেই ফোটন মধ্যবর্তী অবস্থার ওই ইলেকট্রনগুলোর কোয়ান্টাম লাফ এবং উৎসাহিত নি:সরণের সৃষ্টি করতে পারে। ধরা যাক ওভাবে আগন্তুক একটি ফোটন মধ্যবর্তী অবস্থা থেকে উৎসাহিত নি:সরণে হুবহু আরেকটি ফোটনের সৃষ্টি করলো এবং উভয়ে এক সঙ্গে একই লয়ে চল্‌তে লাগলো। আগন্তুক একটি ফোটনের জায়গায় তখন একই রকম দুটি ফোটন হলো। বিবর্ধন যাতে চল্‌তেই পারে এজন্য লেজার বস্তুগুলোর মধ্যে পরস্পর কিছু দূরে মুখোমুখি দুটি আয়না রাখা হলো। এর ফলে ফোটন দুটি একবার এই আয়নায় আবার ওই আয়নায় বার বার প্রতিফলিত হয়ে ওখানেই আসা যাওয়া করতে থাকে আর একই ভাবে বাকি এটমে উৎসাহিত নি:সরণ ঘটাতেই থাকে। দুটি ফোটন এমনটি ঘটিয়ে চারটি ফোটন সৃষ্টি করে, ওরা আবার করে আটটি ফোটন এমনি ভাবে খুব দ্রুত অসংখ্য একই রকম, একই লয়ের কোহেরেন্ট ফোটনের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ওভাবে নি:সরিত সব ফোটন দুই আয়নার মাঝখানে ভ্রমণশীল মূল ফোটনগুলোর সঙ্গে একই ফ্রিকোয়েন্সির হবে বলে এই লেজার আলোর ফ্রিকোয়েন্সিও খুব সূক্ষ্মভাবে একই থাকে। আয়না দুটির মধ্যে পেছনেরটি থেকে ১০০% আলো প্রতিফলিত হলেও সামনেরটির থেকে প্রতিফলিত হয় শুধু ৯৯%, বাকি ১% আলো আয়নার ভেতর দিয়ে সামনের দিকে রশ্মির আকারে চলে যায়। কাজেই খুব দ্রুত অসংখ্য কোহেরেন্ট ফোটনে গড়া তীব্র লেজার রশ্মি এভাবে আয়না থেকে বেরিয়ে আসে।

এই লেজার আলো শুধু তীব্র নয়, দুই সম্পূর্ণ সমান্তরাল ও পালিশ করা আয়নার মধ্যে আসা যাওয়া করে করে সৃষ্ট এর রশ্মি একেবারে নিখুঁত সমান্তরাল। সমান্তরালের সামান্যতম ব্যতিক্রম যদি কোন একটি আলোর রেখা করে তা লেজার বস্তুর মধ্যেই ছিটকে হারিয়ে যাবে, ফলে নিখুঁত সমান্তরাল এই রশ্মি বহু দূর চলে যাবার পরও একটুও ছড়িয়ে পড়েনা। সমলয় থাকা, একটুও ছড়িয়ে না পড়া, খুবই সূক্ষ্ম ভাবে নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকা– এসব গুণের কারণে তীব্র লেজার আলো একই ক্ষুদ্র জায়গায় নিবদ্ধ করে ধাতু গলানো, শরীরে অস্ত্রোপচার

করার মত কাজ করা যায়, অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে সিগন্যাল আদান প্রদান করাতে ব্যবহার করা যায়। এই লেজার আলোর পুরো ব্যাপারটিই সম্পূর্ণরূপে কোয়ান্টাম তত্ত্বেরই আওতাধীন।

আমাদের সাইজের জিনিসে কোয়ান্টাম তত্ত্ব

অতিপরিবহিতার পেছনে রয়েছে কোয়ান্টাম তত্ত্বঃ

কোয়ান্টাম তত্ত্ব সরাসরি কাজ করে ক্ষুদ্র জিনিসের ওপর; তার প্রভাবগুলো অবশ্য আমরা বড় জিনিসেও দেখি– যেমন উপরে দেয়া বিভিন্ন উদাহরণে ওভাবেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের ব্যবহার আমরা দেখতে পেরেছি। কিন্তু কিছু কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্ব সরাসরি বড় জিনিসের ক্ষেত্রেও কাজ করে, আমরা দেখছি, নড়াচড়া করছি এমন জিনিসের ক্ষেত্রেও। এমনি একটি ব্যাপার হলো বিদ্যুতের অতিপরিবাহিতা (সুপার-কন্ডাক্টিভিটি)। এই ব্যাপারটি আবিষ্কৃত হয়েছে গত শতাব্দীর শুরুর দিকে, কিন্তু একে তাত্ত্বিক ভাবে বুঝতে বহু বহু সময় লেগেছে– অবশেষে কোয়ান্টাম তত্ত্বেই এর ব্যাখ্যা মিলেছে। সেই ব্যাখ্যাটিতে অনুযায়ী অতিপরিবাহী পুরো কঠিন বস্তুর টুকরাটি একযোগে কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় বলেই অতিপরিবহিতা দেখা দিতে পেরেছে। এই টুক্‌রাটি আমাদের দৃষ্টিগোচর কঠিন বস্তু হয়েও আগাগোড়া কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক কাজ করছে।

১৯১১ সালে হল্যান্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ক্যামেরলিং ওনেস অদ্ভুত এই ঘটনাটি আবিষ্কার করেছিলেন। উত্তাপ কমালে পরিবাহী বস্তুর বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বাড়ে সেটি জানা ছিল, কারণ বস্তুটির অণুগুলোর কম্পনই বিদ্যুৎ পরিবহনকারী ইলেকট্রনকে ধাক্কা দিয়ে প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করে। উত্তাপ কমলে অণুগুলোর কম্পন কমে, তাই বাধাও কমে। ওনেস অত্যন্ত শীতল উত্তাপে কঠিন হয়ে যাওয়া পারদের মধ্যে এই ব্যাপারটি মাপছিলেন। কিন্তু উত্তাপ যখন পরম স্কেলের মাত্র ৪.২ ডিগ্রিতে নেমে এলো (যা কিনা বরফের উত্তাপের থেকে প্রায় ২৬৯ ডিগ্রি কম!) এখন তিনি অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে বাধা শুধু কম্‌লোইনা বরং বাধা একেবারে শূন্য হয়ে গেলো। অর্থাৎ এই উত্তাপে নেমে যাবার পর বিদ্যুৎ প্রবাহ কোন রকম ভোল্টেজ বা শক্তি ব্যবহার ছাড়াই একইভাবে বজায় থাক্‌ছে, একটুকুও না কমে গিয়ে– যা অসম্ভব একটি ব্যাপার। একেই বলা হলো সুপার-কন্ডাক্টিভিটি বা অতিপরিবাহিতা। পরে অন্যান্য জিনিসেও এটি দেখা গেলো, তবে সবই ও ধরনের অতিশীতল উত্তাপে। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারটির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো বহুদিন পর ১৯৫৭ সালে।

বারডীন, কুপার ও শ্রাইফার– এই তিন বিজ্ঞানী এর একটি চমৎকার কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হলেন, যাকে বলা হয় বিসিএস থিওরি, তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে।

বিসিএস থিওরিতে অতিপরিবাহিতা ঘটার ভিত্তি হলো ওই অতি শীতল উত্তাপটিতে পৌঁছলেই পুরো বস্তুটিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম একটি কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার মধ্যে। এতে পরিবহন ইলেকট্রনগুলো একা একা না থেকে দুটি মিলে একটি জোড়া গঠন করে এবং পরিবহনে তাদের সব কাজে এই জোড়া এক সঙ্গে একই কণিকার মতোই কাজ করে। সাধারণত দুটি ইলেকট্রনের জন্য এমনটি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার– দুটি ইলেকট্রন পরস্পরের কাছাকাছিই আসার কথা নয় উভয়ের একই ঋণাত্মক চার্জের পরস্পর বিকর্ষণের কারণে। ওই অতি শীতল পরিস্থিতে পৌঁছলে ইলেকট্রনের সঙ্গে কঠিন কৃস্টাল বস্তুটির বাকি অংশের এমন কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়া হঠাৎ করে শুরু হয় যার ফলে ইলকট্রনের ওই জোড় বাঁধা সম্ভব হয়। পরিবহন ইলেকট্রন বাদ দিলে কৃস্টালের এটমগুলোর বাকি অংশ ধনাত্মক হওয়াতে ওই কৃস্টালে এটমের পুরো বিন্যাসটিই ধনাত্মক। প্রত্যেকটি পরিবহন ইলেকট্রন তার যাত্রাপথে একটুখানি হলেও এই বিন্যাসটিকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, কাজেই চলার সময় তাকে এক ভাবে আন্দোলিত করতে করতে চলে। আন্দেলিত হবার ফলে স্থানীয়ভাবে কোথাও ওই এটমের বিন্যাসে ধনাত্মক চার্জের সামান্য বেশি ঘনত্বের সৃষ্টি হয় যার ফলে আর একটি ইলেকট্রনকে তা কিছুটা আকর্ষণ করে। এর মোট ফল যা হয় কৃস্টালের বিন্যাসের দূতিয়ালির মাধ্যমে প্রথম ইলেকট্রনটির সঙ্গে দ্বিতীয় ইলেকট্রনের একটি বন্ধন সৃষ্টি হয়। কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক ভাবে কৃস্টালের ওই আন্দোলনের কোয়ান্টায়িত রূপটি আমরা বিবেচনা করতে পারি। আলোর (ফটো) কোয়ান্টায়িত রূপ যেমন ফোটন তেমনি ওই আন্দোলন যা শব্দ তরঙ্গেরই (ফোন) একটি রূপ তার কোয়ান্টায়িত রূপ হলো ফোনন। ওপরের বিক্রিয়াটিকে ইলেকট্রন-ফোনন- ইলেকট্রন বিক্রিয়া হিসেবে কোয়ান্টাম তত্ত্বে দেখা যায়। এর ফলে ইলেকট্রন-ইলেকট্রন যে বন্ধন সৃষ্টি হয় তার বন্ধন শক্তি খুব ছোট– তাই ওই অতিশীতল উত্তাপের পরিস্থিতিতেই শুধু এ বন্ধন বজায় রাখা সম্ভব হয়।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের দৃষ্টিতে একটি ইলেকট্রন যে রকম কণিকা, দুটি ইলেকট্রনের জোড়কে কিন্তু তার থেকে খুবই আলাদা একটি কণিকা হিসেবে প্রকাশ করা যায়। ইলেকট্রনের $\frac{1}{2}$ সংখ্যক স্পিনের কারণে এটি যে বর্জন নীতি মেনে চলে এবং একই শক্তি অবস্থায় দুটির বেশি থাকতে পারেনা তা আমরা দেখেছি। কিন্তু

জোড়-ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে স্পিন আধা সংখ্যা নয় পূর্ণ সংখ্যা, তাকে বর্জন নীতি মানতে হয় না; এগুলো তাই একই নিম্নতম অবস্থায় যে কোন সংখ্যায় থাকতে পারে দু'টার বেশি হলে ওপরের অবস্থায় যাওয়ার প্রয়োজন হয়না। ফলে এখানে যখন সেই সেমিকন্ডাক্টরের মত শক্তির ব্যান্ড সৃষ্টি হয় তাতে সব ইলেকট্রন জোড়া সব থেকে নিচের ব্যান্ডেই থাকতে পারে– জোড়ার সংখ্যা যত বেশিই হোক না কেন। সেখানে থাকা কালে এগুলোর নিজেদের সঙ্গে বা কৃস্টালের বাকি অংশের সঙ্গে কোন রকম সংঘর্ষ ঘটানোর বা কোন ভাবে বিক্ষিপ্ত হবার কোন সুযোগ নেই। কারণ তাদের ব্যান্ডের ও তার ওপরের ব্যান্ডের মাঝখানে একটি ছোট শক্তি গ্যাপ রয়েছে। উত্তাপের ওই পরিস্থিতিতে এই গ্যাপ অতিক্রম অসম্ভব বলে পরিবহন ইলেকট্রন জোড়াগুলোকে কোন বাধার সম্মূখীন হতে হয়না। অন্যভাবে দেখলে আমরা বলতে পারি জোড়ায় থাকার কারণে জোড়ার একটি যদি কোন বাধার সম্মূখীন হতে যায়ও জোড়ার অন্যটি ওটিকে টেনে বাধার থেকে দূরে রাখে। যেহেতু বাধা নেই, তাই অতিপরিবাহিতা সৃষ্টি হয়।

ক্ষুদ্র জিনিসে কোয়ান্টাম তত্ত্ব কাজ করতে আমরা দেখেছি। ক্ষুদ্র জিনিস মিলে বড় জিনিসে পরিণত হলে সেখানেও আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রভাবটি দেখেছি– যেমন সেমিকন্ডাক্টরে অথবা লেজারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ওই বড় জিনিস পুরোটার ওপর কোয়ান্টাম তত্ত্ব কাজ করেনি। তবে এখানে অতিপারবাহিতার ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে– পুরো কৃস্টালটির ওপর কোয়ান্টাম তত্ত্ব কাজ করেছে, অর্থাৎ কিনা আমাদের সাইজের জিনিসের ওপর! কৃস্টাল জুড়ে সব এটমের বিন্যাস আর সব পরিবহন ইলেকট্রন এক লয়ে, একযোগে কাজ করেছে বলেই অতিপরিবাহিতা সম্ভব হয়েছে। আমাদের সাইজের জিনিসে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কাজ আরো নাটকীয় ভাবে ঘটে আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়ে– বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবনে।

বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবনঃ

১৯২৪ সালে তখনকার বৃটিশ ভারতের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (বর্তমানে বাংলাদেশে) একজন তরুণ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর একটি আবিষ্কার নিয়ে ছোট প্রবন্ধ আইনস্টাইনের কাছে পাঠিয়েছিলেন। আইনস্টাইন প্রবন্ধটি প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে বিষয়টি সম্পর্কে নিজেরও একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। বসুর প্রবন্ধে আলোক কণিকা ফোটনের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন কিছু অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দেয়া হয়েছে, আর আইনস্টাইন তাঁর প্রবন্ধে বসুর প্রবন্ধকে ভিত্তি করে অতি কম উত্তাপে ব্যতিক্রমী ঘনীভবনের সম্পূর্ণ নতুন

একটি অবস্থার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই দুই প্রবন্ধ থেকে বোস-আইনস্টাইন কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্ব এবং বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন নামের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সূত্রপাত হয়েছে। বোস নামটি বসুরই ইংরেজীকৃত রূপ এবং পরবর্তী সময়ে শুধু ফোটন নয়, এর মত একই কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্ব মেনে চলা সকল কণিকাকেই তাঁর নামে 'বোসন' বলে অভিহিত করা হয়।

তাঁর ১৯২৪ সালের প্রবন্ধে বসু প্ল্যাঙ্কের যেই কালো-বস্তু বিকিরণ সমীকরণ ১৯০০ সালে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সূচনা করেছিলো তার দিকে নতুন ভাবে তাকিয়েছিলেন। প্ল্যাঙ্ক নিজে সমীকরণটিকে বাস্তবের সঙ্গে তত্ত্বের মেলাবার একটি কৌশল হিসেবে আবিষ্কার করেছিলেন, বসু চাচ্ছিলেন একে একটি আরো যৌক্তিক মৌলিক রূপ দিতে। এজন্য তিনি ফোটনকে একটি কাল্পনিক গ্যাসের অণু হিসেবে নিয়ে সেগুলোর গাণিতিক আচরণ পরীক্ষা করেছিলেন। এটি করতে গিয়ে তিনি দেখালেন যে কণিকা হিসেবে ফোটনের আচরণ ইলেকট্রন ইত্যাদি বস্তু কণিকার থেকে আলাদা। সেই ভিন্ন আচরণের ভিত্তিতে ফোটন এবং ফোটন সদৃশ কণিকার শক্তি বন্টনের প্রকৃতি নিয়ে বোস-আইনস্টাইন কোয়ান্টাম সংখ্যাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বসুর ব্যাখ্যায় এরকম কণিকা সর্বনিম্ন শক্তি অবস্থায় যে কোন সংখ্যায় জমা হতে পারে– সেখানে এদের একটিকে অন্যটি থেকে আলাদা করার কোন উপায় নেই। এ কারণে এ ধরনের কণিকা পরে একটি সাধারণ নাম 'বোসন' বলে পরিচিত হয়েছে, আর আধা সংখ্যার বাকি কণিকাগুলো 'ফার্মিয়ন' নাম বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মির নামানুসারে।

তাঁর ১৯২৪ সালের প্রবন্ধে আইনস্টাইন বসুর সংখাতত্ত্বের ভিত্তিতে দেখিয়েছিলেন যে অত্যন্ত শীতল উত্তাপে বোসনগুলো নিম্নতম শক্তি মাত্রায় জমে একটি নতুন ধরনের ঘনীভবনের (কনডেনসেশন) সৃষ্টি করে, একটি গ্যাসকে শীতল করলে তার জমে যাওয়াটি যেমন একটি ঘনীভবন, এই নতুন ঘনীভবন সেরকমই কিছু। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন আচরণ হবে এই ঘনীভবনের– এতে পদার্থের চটচটে ভাব একেবারে শূন্যে পরিণত হয়ে এর প্রবহমানতা একেবারে অসীমে কোঠায় পৌঁছে যায়। এদিক থেকে একে অতি শীতল অবস্থায় সংঘটিত অতিপরিবাহিতার সঙ্গে তুলনা করা যায়, সেটি আমরা এ অধ্যায়ে আগে দেখেছি। অতিপরিবাহিতার ব্যাখ্যায় যে ইলেকট্রন জোড়ার কথা বলা হয়েছে তাও কিন্তু একটি বোসনের মত কাজ করে। ইলেকট্রন ফার্মিয়ন হলেও এইভাবে সৃষ্টি হওয়া ইলেকট্রন জোড়া কিন্তু বোসন। আর সে কারণেই অতিপরিবাহিতা সম্ভব হয়।

আর অতি-প্রবহমানতার এই নতুন ঘটনাকে বলা হলো বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন। তাত্ত্বিক ভাবে ভবিষ্যদ্বাণীর ১০ বছর পর অত্যন্ত শীতল করা তরল হিলিয়ামকে পরম শূন্যের একেবারে কাছাকাছি পরম স্কেলে মাত্র ২.১৭ ডিগ্রিতে নামিয়ে আনা সম্ভব হলে দেখা গেলো তা তার চটচটে ভাব অর্থাৎ তার অণুর পরস্পর ঘর্ষণ একেবারে শূন্যে নেমে গিয়ে এটি একটি অতিপ্রবহমান তরলে (সুপার ফ্লুইড) পরিণত হয়েছে, এবং তার পাত্র থেকে নিজে নিজেই প্রবাহিত হয়ে উপচে পড়ছে। তবে বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবনের তত্ত্বে আইনস্টাইন যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তার সবকিছু অতিপ্রবহমান ওই হিলিয়ামের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব ছিলনা, কারণ তেমনটি ঘটার কথা আরো নিচের উত্তাপে– একেবারে পরম শূন্যের অত্যন্ত কাছের শীতলতায়। এই রকম উত্তাপ আদৌ কোনদিন বাস্তবে পাওয়া যাবে আর সত্যিকার অর্থে তাঁদের কথিত ঘনীভবন দেখা যাবে এটি খুব সম্ভব আইনস্টাইনও চিন্তা করেননি। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়েছে ১৯৯০ এর দশকে কিছু দুর্দান্ত এক্সপেরিমেন্টের সাফল্যের মাধ্যমে। এরপর থেকে বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন কোয়ান্টাম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বড় গবেষণা ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা ইতোমধ্যে বড় বড় সাফল্য অর্জন করেছে।

১৯৯০ এর দশকে এসে এটি সত্যিকার অর্থে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে প্রয়োজনীয় অতি শীতল উত্তাপ সৃষ্টিতে সাফল্যের কারণে। এর মূলে রয়েছে দুটি কৌশল– একটি হলো 'লেজার শীতলীকরণ' এবং অন্যটি 'চৌম্বক ফাঁদের' মাধ্যমে শীতলীকরণ। এসময় নরম ধাতু রুবিডিয়ামকে এই দুই কৌশলে পরম শূন্যের অতি কাছাকাছি উত্তাপে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হওয়াতে তার সকল পরিপূর্ণতায় বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবনের বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। লেজার শীতলীকরণটি সম্ভব হয় ইতোমধ্যে শীতল রুবিডিয়াম এটমকে লেজার ফোটনের আঘাতে আরো ধীরগতির করে তুলে। এর জন্য রুবিডিয়াম এটমের প্রধান বর্ণালী লাইনের ফ্রিকোয়েন্সির সামান্য নিচের ফ্রিকোয়েন্সির লেজার আলো সৃষ্টি করা হয়। রুবিডিয়াম এটমগুলো এই লেজারের মধ্য দিয়ে গেলে লেজার ফোটনের সঙ্গে সেগুলোর সংঘর্ষ ঘটে। প্রত্যেকটি সংঘর্ষে এই ফোটনের ভরবেগের সমান ভরবেগ ওই এটম হারিয়ে ফেলে। এটি খুব সামান্য হলেও বিপুল সংখ্যক ফোটন যখন একযোগে এক একটি এটমের ভরবেগ কমায় তখন এর যথেষ্ট উত্তাপ কেড়ে নেয়– একে প্রায় পরম শূন্য উত্তাপে নামিয়ে আনতে পারে। এ যেন দ্রুতগামী অনেকগুলো ছোট ছোট বন্দুকের গুলির আঘাতে একটি ট্রাকের গতি কমিয়ে ফেলা। লেজারে কোহেরেন্ট আলোর এও আরেক গুণ। কিন্তু তারপরও শীতল করার করার আরো কিছু বাকি থাকে। যেটি করা হয় ওই দ্বিতীয়

কৌশলে– চৌম্বক ফাঁদের মাধ্যমে। চৌম্বক ফাঁদ আসলে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা একটি বাধা সৃষ্টি করে রুবিডিয়াম এটমগুলো তার মধ্যে আট্‌কে রাখা। বাধাটি যেন চৌম্বক ক্ষেত্রের একটি দেয়াল চারিদিকে তোলা– এর মধ্যে শুরু থেকে শক্তিমান এটমগুলো সবার ওপরে থাকে। ওই দেয়ালটি কিছুটা নামিয়ে নিলে রুবিডিয়াম এটমের সংগ্রহ থেকে সব চেয়ে শক্তিমানগুলো হারিয়ে যায়– যেগুলো বাকি থাকে সেগুলোর শক্তি কম অর্থাৎ বেশি শীতল। এ যেন কাপের চা পিরিচে ঢেলে ফু দিয়ে তা ঠান্ডা করা। চায়ের সব থেকে গরম অণুগুলো ওপরে থাকে বলে ফু এর বাতাসে ওগুলো সরে যায়, থাকে শুধু অপেক্ষাকৃত ঠান্ডাগুলো। এভাবে বার বার চৌম্বক ফাঁদের দেয়াল খানিকটা করে নামিয়ে এনে রুবিডিয়াম এটমকে সেই প্রয়োজনীয় শীতলতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

কতটা ঠান্ডা সেটি? পরম শূন্যের থেকে এক ডিগ্রির এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ মাত্র ওপরের উত্তাপ। শূন্যের সঙ্গে এর কীই বা তফাত? এমনি শীতলতাতেই শুধু ঘটতে পারলো সত্যিকারের বোস-আইনস্টাইন ঘনীভবন। কণিকা হিসেবে এই এটমের চরিত্র বোসনের– এটি একটি বোসন। এর সবই সর্বনিম্ন শক্তি অবস্থায় জমে জমে একের ওপর এক ধসে পড়ে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করলো যেন এগুলো আর আলাদা আলাদা এটম নয়, বরং সব মিলে একটি অনেক বড় এটম– আমাদের সাইজের এটম যাকে ইচ্ছে করলেই অণুবীক্ষণে দেখা যায়।

রুবিডিয়ামের ওপর এই এক্সপেরিমেন্টের পর সোডিয়াম এটমের ওপর একই রকম প্রক্রিয়ায় আরো বেশি সংখ্যক এটমকে ঘনীভবনের মাধ্যমে আরো বড় সাইজের একটি এটমে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। বড় সাইজের হলেও পুরো জিনিসটি সরাসরি একটি 'কোয়ান্টাম জিনিস' , কোয়ান্টাম জগতের নিয়মের অধীন। যেমন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তার নীতি শুধু ইলেকট্রন ইত্যাদি ক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও এই ক্ষেত্রে এই নীতি আমাদের সাইজের এই জিনিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই বড় এটমটি একেবারে পরম শূন্যের মত উত্তাপ অবস্থায় আছে তার মানে এর ভরবেগ বলতে গেলে শূন্য– প্রায় নিশ্চিত ভাবেই জানা। অনিশ্চয়তার নীতি অনুযায়ী এর অবস্থান তাই একেবারেই অনিশ্চিত। ফলে এই 'বড়' এটমটির অবস্থান দ্রুত ফুলে ফেঁপে কোথায় গিয়ে ঠেকবে বলা মুশকিল! যে পরিস্থিতিতে ক্ষণিকের জন্য ঠান্ডা করে এটি সম্ভব হয়েছে তার অবস্থাটি খুবই নাজুক ও ভঙ্গুর হওয়াতে নিজের মধ্য দিয়ে নিজে চলে গিয়ে ওই ফুলে ফেঁপে এটি কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো তা দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে

এর সব আচরণকে চাক্ষুষ করার মত অধিক্ষণ স্থায়ী করে তাকে ধরে রাখা যাবে তা আশা করা যায়।

আশা করা যায় এই ঘনীভবন আমাদেরকে লেজারের মত সমলয়ে কোহেরেন্ট অন্য রকম কিছু দেবে যা ফোটনে নয় বরং বস্তু এটমে গড়া– এ যেন একটি 'বস্তু লেজার'! তখন ঘনীভবনকৃত এটম হয়তো আগাগোড়া সমান্তরাল থেকে, একটুকুও না ছড়িয়ে অনেকদূর চলে যেতে পারবে– শক্তির পরিবহনে কিংবা তথ্যের পরিবহনে দারুণ কাজ দেবে। বস্তুর লেজার এখনো সম্ভব না হলেও– সেই ঘনীভূত 'বড়' এটম একাধিক সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে উপরিপাতন ও ইন্টারফেরেন্স সৃষ্টির চেষ্টা ইতোমধ্যে সফল হয়েছে। বোঝা গেছে স্পষ্টত এই 'বড়' জিনিস আদ্যোপান্ত একটি কোয়ান্টাম জিনিস; অন্তত এই ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগ করার জন্য ক্ষুদ্র জিনিসের প্রয়োজন হচ্ছেনা। এটি 'বস্তু-লেজারের' সম্ভাব্যতার ক্ষেত্রেও কিছুটা আশাবাদ সৃষ্টি করেছে।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে নতুন প্রযুক্তি

কোয়ান্টাম তত্ত্বের কারণে যে সব বৈজ্ঞানিক ঘটনা ঘট্‌তে পারছে তার অনেকগুলোর চমৎকার প্রযুক্তিগত ব্যবহার রয়েছে। যেমন লেজার, সেমিকন্ডাক্টর, অতিপরিবাহিতা ইত্যাদি প্রত্যেকটি থেকে অপূর্ব সব নতুন প্রযুক্তির সূচনা হয়েছে। কিন্তু আগের প্রযুক্তির মধ্যে নতুন দিগন্ত আন্‌তে সরাসরি পুরানো ওসব প্রযুক্তির মধ্যেও আমরা কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করতে পারছি। এমনি কয়েকটির পরিচয় এখানে দেয়া যায়।

কোয়ান্টাম ঘড়িঃ

কোয়ান্টাম ঘড়ি আসলে এটমিক ঘড়ি হিসেবেই বেশি পরিচিত, এবং এই নামেই বহুদিন যাবত খুবই নিখুঁত সময় পাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সাম্প্রতিক কালে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আরো দারুণ কিছু ফলাফল ব্যবহার করে এই ঘড়ির সঠিকতাকে আরো তুঙ্গে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। তবে এটমিক ঘড়ির মূল নীতিটাও এটম থেকে আলো নি:সরণের কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপরেই নির্ভর করে। যেহেতু একটি মৌলের এটমের থেকে নি:সরিত আলোর ক্ষেত্রে বিশেষ কোন বর্ণালী লাইনের ফ্রিকোয়েন্সি সে এটমের দুটি শক্তি অবস্থার শক্তি পার্থক্যের দ্বারা হুবহু নির্ধারিত তাই এই ফ্রিকোয়েন্সি থেকে ঘড়ির সময় নির্ধারিত হলে তা খুব নিখুঁত হয়। এভাবে ৫ বিলিয়ন বছরেও এক সেকেণ্ড নড়চড় হয়না এমন ঘড়ি তৈরি সম্ভব হয়েছে। যদিও আমাদের সাধারণ ব্যবহারে এতখানি নিখুঁত ঘড়ি না

হলেও চলে, কিন্তু যেমন ধরা যাক জিপিএস দিয়ে পৃথিবীতে যে কোন জায়গায় কোন কিছুর অবস্থান খুব নির্দিষ্ট করে নির্ণয় করতে হলে এমন সূক্ষ্ম সময়ের হিসেবের প্রয়োজন রয়েছে। নানা উপগ্রহ থেকে জিনিসটির কাছে সিগ্‌ন্যাল যেতে ও আসতে কত সময় লাগে তার উপরেই জিপিএস এর কাজ নির্ভর করে। সময়ে সামান্যতম ভুল হলেও অবস্থান নির্ণয়ে তার প্রভাব গড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সার্বজনীন বিশ্ব-কাল নিখুঁত ভাবে রক্ষার প্রয়োজনে এমন ঘড়িরই প্রয়োজন।

এমন কোয়ান্টাম ঘড়ির কার্যকারিতার দুটি দিক রয়েছে– এর সময় দান প্রক্রিয়া যথেষ্ট 'টেকসই' কিনা এবং এটি যথেষ্ট সঠিক সময় দেয় কিনা। টেকসই হবার ব্যাপারটি একটু বোঝা যাক। এটমের দুই শক্তি অবস্থার তারতম্যটি তাত্ত্বিক ভাবে নির্ণিত খুব সুনির্দিষ্ট একটি জিনিস। সেই আলোর ফ্রিকোয়েন্সির মাপ থেকে ঘড়ির সময় নির্ধারিত হয় সেটি কিন্তু একটি এটম থেকে নি:সরিত নয়– নানা এটমের থেকে নি:সরিত ফ্রিকোয়েন্সিতে খুব সামান্য তারতম্য থাকে; শুধু গড়পড়তাতে গিয়েই এটি তাত্ত্বিক ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে মেলে। ঘড়ি যত টেকসই হয় তত কম সময়ের ওপর গড় নিয়েই এই তাত্ত্বিক ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে মেলানো যায়। এই সময় যত দীর্ঘ হয় ঘড়ির কার্যকারিতা তত কম হয়। প্রথম দিকের এটমিক ঘড়িতে এই সময় বহু ঘন্টা এমনকি কয়েক দিন পর্যন্ত হতো বলে সময় নির্ধারণে এগুলো কম 'টেকসই' হতো। সর্বাধুনিক ঘড়িতে এই গড় নেবার সময়টি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চলে এসেছে। অন্যদিকে ৫ বিলিয়ন বছরে এক সেকেন্ডের বেশি স্লো বা ফার্স্ট না হওয়ার যে রেকর্ড পরিমাণ সঠিক সময় সেটি অর্জন করার জন্য প্রাসঙ্গিক এটমের সংখ্য বাড়াতে হয়। সময় নির্ধারণের জন্য যে সব এটমের কোয়ান্টাম লাফের ফ্রিকোয়েন্সির ওপর নির্ভর করতে হয় সেই এটমের সংখ্যা যত বেশি হবে এ ঘড়ির সময় দান তত নিখুঁত হবে। ঘড়িতে বায়ুশূন্য পাত্রে এরকম এটম থাকতে হয়। প্রত্যেকটির নিজের কোয়ান্টাম লাফের প্রকৃতি এখানে যেরকম গুরুত্বপূর্ণ তেমনি প্রতিবেশী এটমের কোয়ান্টাম লাফের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য স্থাপন গুরুত্বপূর্ণ। এভাবে কতটি এটমকে রাখা যাবে তার কিছু বাস্তব সীমা রয়েছে। এটিই ঘড়ির নিখুঁত হবার পরিমাণটি ঠিক করে দেয়। এই পরিমাণ ১০ গুণ বাড়াতে হলে এটমের সংখ্যা এর বর্গ অর্থাৎ ১০০ গুণ বাড়াতে হয় যেটি ওই বাস্তব সীমাগুলোর কারণে কঠিন কাজ। এর সমাধানে এগিয়ে এসেছে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আর একটি আশ্চর্যজনক গুণ যাকে বলা হয় 'কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থা' (কোয়ান্টাম এনটেঙ্গেলমেন্ট)। এই বৈশিষ্টটির কিছুটা বিস্তারিত আমরা পরের অধ্যায়ে দেখবো। কিন্তু এখানে প্রয়োগটি বোঝার খাতিরে এইটুকু

বলা যথেষ্ট হবে যে কোয়ান্টাম তত্ত্বে অনেক সময় দুটি কণিকা পরস্পরের সঙ্গে একটি বৈশিষ্টে এমন ভাবে বিজড়িত হয়ে থাকে যে একটির মধ্যে ওটির মান যা হয় অন্যটিতে তার ঠিক বিপরীত হয়। প্রথমটি বদ্‌লালে স্বয়ংক্রিয় ভাবে দ্বিতীয়টিও বদ্‌লে যায়– এমনকি দুটাকে যদি পরস্পর থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখা হয় তাও একটি বদ্‌লালে অন্যটি সেখানেই বদ্‌লে যাবে। তাই একটিকে মেপে বলা যাবে দূরের অন্যটি কী অবস্থায় আছে– ওইটিকে আদৌ না মেপেই। এর সুযোগ নিয়ে এটমিক ঘড়িতে প্রাসঙ্গিক সব এটম ওই ঘড়ির মধ্যে না রাখলেও চলে– বিজড়িত এটম হিসেবে অনেকগুলো বহু দূরে নানা জায়গায়ও থাকতে পারে। এভাবে এক সঙ্গে রাখার বাস্তব সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়েই অনেক বেশি এটমে গড়া ঘড়ি সম্ভব হয়েছে বলেই ৫ বিলিয়ন বছরে মাত্র ১ সেকেন্ড নড়চড় হওয়ার মত রেকর্ড পরিমাণ নিখুঁত ঘড়ি বাস্তবায়িত হতে পেরেছে।

কোয়ান্টাম অণুবীক্ষণঃ

কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগ করে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে নানা রকম উন্নয়ন আনা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে স্ক্যানিং টানেলিং মাইক্রোস্কোপকে (এসটিএম) অনিশ্চয়তার নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে আগেই দেখেছি– যেটি দিয়ে বস্তুর পৃষ্ঠদেশের এক একটি এটমকে পর্যন্ত অণুবীক্ষণের ইমেজে স্পষ্ট করা সম্ভব হয়েছে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগে অণুবীক্ষণের আর একটি বড় উন্নয়ন এসেছে আলোর ইন্টারফেরেন্সের ওপর নির্ভরশীল অণুবীক্ষণের ক্ষেত্রে। এ ধরনের অণুবীক্ষণে আলোর এমন দুটি রশ্মি ক্ষুদ্র বস্তুটির ওপর ফেলা হয়– যাতে ওখানে পৌঁছে রশ্মি দুটি পরস্পরের সঙ্গে ইন্টারফেরেন্স বা ভাঙ্গাগড়া করতে পারে। কোন বিন্দুতে ভাঙ্গা হবে, না গড়া হবে, না অন্য কিছু হবে তা নির্ভর করবে আলোর উৎস থেকে বিন্দুটির দূরত্বের ওপর। কাজেই বিন্দুটি খানিকটা নিচুতে থাকলে যা হবে, খুব সামান্য খানিকটা উঁচুতে থাকলেও কিন্তু তা হবেনা, ইন্টারফেরেন্সের প্যাটার্ন বদলে যাবে। পরে এখান থেকে ফিরে আসা রশ্মিদ্বয়কে ফোকাস করে পাওয়া ইমেজে ক্ষুদ্র বস্তুর ওই উঁচু-নিচু অবয়বটি ধরা পড়বে। সাধারণ অণুবীক্ষণের তুলনায় এই ইন্টারফেরেন্স অণুবীক্ষণ অনেক বেশি সংবেদী– ওই উঁচুনিচু হওয়াটি যদি এক মিলিমিটারের এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগও হয় তবুও তা ইমেজে ফুটে ওঠে।

কিন্তু এতে আলোর পরিমাণটিকে বেশি রাখা প্রয়োজন হয়, খুবই নাজুক জৈব কোষকলাকে এভাবে অণুবীক্ষণে দেখতে খুব জোরালো আলো ব্যবহার করা যায়না– কারণ তা কোষকলাকে নষ্ট করে বা বদলে দিয়ে ভুল ইমেজ দেবে। তাই

সে ক্ষেত্রে খুব মৃদু আলোর ইন্টারফেরেন্স ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে প্রত্যাশিত ইমেজের সঙ্গে তার পটভূমিতে থাকা আলো-ছায়ার যে 'নয়েজ' বা অপ্রাসঙ্গিক অংশের যে অনুপাত তা ছোট হয়ে প্রকৃত ইমেজ উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর কারণ হলো এই অনুপাতটি বাড়ে আলোর ফোটনের সংখ্যার সঙ্গে।

ফোটনের সংখ্যা যত বেশি হবে নয়েজের তুলনায় ইমেজ তত স্পষ্ট হয়ে অনুপাতটি বাড়ে। ফোটনের সংখ্যা যদি N হয় তাহলো নয়েজের তুলনায় ইমেজের দৃশ্যমানতার পরিমাপটি সমানুপাতিক হয় $\sqrt{N}$ এর সঙ্গে। কাজেই ইমেজের দৃশ্যমানতা অল্প বাড়াতে হলেও ফোটনের সংখ্যা অনেক বাড়াতে হয়– যা আলোকে জোরালো করে জৈব কোষকলাকে নষ্ট করবে। এখন এর আধুনিকতম ক্ষেত্রে ওপরে ঘড়ির ক্ষেত্রে উল্লেখিত 'কোয়ান্টাম বিজড়িত' হবার গুণটি ব্যবহার করে এই সমস্যাটি এড়ানো যাচ্ছে। এতে এমন ফোটন ব্যবহার করা হয় যাতে ফোটনের দুটি রশ্মি পরস্পরের সঙ্গে কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থায় থাকে। যেমন এতে যদি একটির ফোটনের সঙ্গে অন্যটির ফোটন পোলারাইজেশনের দিক বিজড়িত থাকে, একটির গোলারাইজেশন ডান-মুখী হলে অন্যটির বাম-মুখী হয়ে। যেহেতু এতে একটি দেখে অন্যটি সম্পর্কে এমনিতেই জানা যায়। একটি রশ্মির ফোটন শুধু নিজের সম্পর্কে নয়, তার সঙ্গে বিজড়িত অন্য রশ্মির ফোটনের সম্পর্কেও তথ্য দিতে পারে। এর ফলে ইমেজের মধ্যে ইন্টারফেরেন্স থেকে পাওয়া তথ্যের পরিমাণ বেড়ে যায়। সেক্ষেত্রে ইমেজের দৃশ্যমানতার পরিমাণ $\sqrt{N}$ এর সঙ্গে সমানুপাতী না হয়ে তার থেকে অনেক বড় সংখ্যার সমানুপাতী হয়। এভাবে কম সংখ্যক ফোটন ব্যবহার করেও নয়েজের তুলনায় ভাল ইমেজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে। জীব কোষকলার মত নাজুক জিনিস দেখ্‌তে দারুণ কাজে আসছে এই 'কোয়ান্টাম অণুবীক্ষণ'।

কোয়ান্টাম কম্পিউটার:

সেমিকন্ডাক্টর ভিত্তিক যে কম্পিউটার আমরা অনেকদিন ধরে ব্যবহার করছি তা ক্রমাগত উন্নত হয়েছে, বেড়েছে তার তথ্য ধারণের এবং তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা। সেটি প্রধানত এসেছে ক্রমাগত অল্প থেকে অল্প জায়গার মধ্যে অধিক থেকে অধিকতর ট্রানজিস্টর তৈরির সক্ষমতা। এই ট্রানজিস্টর কম্পিউটারের মূল উপাদান হওয়াতে তার সংখ্যা ঘনত্বটির ওপর কম্পিউটারের কার্যক্ষমতার পরিমাণ নির্ভর করে। কিন্তু এখন ক্রমে তাতে সমস্যা বাড়ছে; এই সক্ষমতা আর বেশিদূর নাও এগুতে পারে। অন্য দিকে অত্যন্ত বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন

কম্পিউটারের চাহিদা বাড়ছে। কাজেই সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং কিছু কিছু নতুন আইডিয়া ইতোমধ্যেই আশা দেখাচ্ছে; কোয়ান্টাম কম্পিউটার তার মধ্যে একটি।

সাধারণ কম্পিউটারের তথ্য থাকে ০ এবং ১ এই দুটি কোড এর ভিত্তিতে এর প্রত্যেকটিকে একটি বিট্ বলা হয, এবং কয়েকটি বিটের সমাহার এক একটি তথ্যের প্রতিনিধিত্ব করে। তথ্য ওভাবেই মেমোরিতে থাকে, ওভাবেই তথ্যের প্রক্রিয়াকরণ ঘটে, ফলাফল ওভাবেই আসে যাকে আবার সাধারণ তথ্যে পরিণত করা হয়। ওসবকে বাস্তবায়িত করার জন্য ০ এবং ১ কে কোন ভাবে বাস্তবে রূপ দিতে হয় যেমন ০ হতে পারে একটি বিদ্যুৎ প্রবাহ 'অফ্' রাখা, ১ হতে পারে সেটি অন্ রাখা; অথবা হতে পারে চুম্বকত্ব না থাকা বা থাকা ইত্যাদি। এই দুই অবস্থার ওপর নির্ভর করেই গাণিতিক সব কাজ সহ সবকিছু সম্পাদন করতে হয় বলে এদের মধ্যে ধাপের সংখ্যা অনেক বেশি হয়; সাধারণ ০ থেকে ৯ পর্যন্ত দশটি সংখ্যার বদলে ০ ও ১ এই দুটি সংখ্যা দিয়ে সব অংক করতে গেলেই (বাইনারি নাম্বার সিস্টেম) আমরা সেটি টের পাব। কম্পিউটারে তাই করা হয়। সব কিছু বিদ্যুৎ গতিতে হয় বলে অবশ্য তাতেও সময় বেশি লাগেনা। কিন্তু এর জন্য ট্রানজিস্টর অনেক বেশি লাগে, এই কারণে অত্যন্ত বেশি তথ্য নিয়ে কাজ দ্রুত হয়না। তা ছাড়া এই সাধারণ কম্পিউটারে একটি ধাপের পর একটি ধাপ এভাবে কাজ এগুতে হয়, এক সঙ্গে একাধিক সমস্যা নিয়ে সমান্তরালে কাজ করা সম্ভব হয়না। অথচ আজকের যে সব সমস্যা, যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সমস্যা, ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত বেশি তথ্য নিয়ে কাজ করা, একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে বহু সমস্যা নিয়ে কাজ করতে পারা কম্পিউটারের জন্য প্রয়োজন। কোয়ান্টাম কম্পিউটার তাই করতে পারে। কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মৌলিক উপাদান হলো ক্ষুদ্র কোয়ান্টাম কণিকা যার প্রত্যেকটি পরিমাপের সময় ০ এবং ১ এই দুই অবস্থার যে কোন একটিতে থাকতে পারে– সাধারণ কম্পিউটারের বিটের মত (সাধারণ কম্পিউটারে মৌলিক উপাদান যে রকম ট্রানজিস্টর ইত্যাদি)। কিন্তু যেহেতু এটি কোয়ান্টাম কণিকা তাই এর আচরণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের দ্বারাই নির্ধারিত– ওই দুই অবস্থার উপরিপাতনে যেখানে ০ এবং ১ ছাড়াও আরো কিছু বিটের মত অবস্থা সৃষ্টি হবে। এই ক্ষেত্রে বিটগুলোর নতুন নাম দেয়া হয়েছে 'কিউবিট' অর্থাৎ কোয়ান্টাম বিট।

সাধারণ কম্পিউটারে যেভাবে দুটি বিটের ভিত্তিতে আলগরিদম বা প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সব কাজ সম্পন্ন হয়, কোয়ান্টাম কম্পিউটারে বহু কিউবিটের ভিন্ন কিছু আলগরিদমে তা সম্পন্ন হয়। কিউবিটের সংখ্যা বেশি হওয়াতে তা অনেক

অনেক বেশি তথ্য ধারণ করতে পারে এবং সেগুলোর প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। তাছাড়া অনেকগুলো প্রক্রিয়াকরণ এক সঙ্গে চল্‌তে পারে, আমাদের মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াকরণের সঙ্গে তার মিল অনেক বেশি। কিন্তু একটি বড় সমস্যা এতে থেকে যায়। যেই মাত্র আমরা এই প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল জানতে চাইবো তখন ওই কোয়ান্টাম অবস্থাগুলোর ওপর পরিমাপ চালাতে হবে সেগুলোকে দেখতে হবে– আর ঠিক তখনই পুরো কোয়ান্টাম ব্যবস্থাটি চুপসে গিয়ে ০ আর ১ এ গড়া সাধারণ ব্যবস্থায় পরিণত হবে। অর্থাৎ কোয়ান্টাম কম্পিউটারের অবসান না ঘটিয়ে তার ফলাফল পড়া সম্ভব হবেনা, আর সেই ফলাফল সব কিউবিটে প্রকাশিত না হয়ে প্রচলিত কম্পিউটারের মতই হবে। এটি কোয়ান্টাম কম্পিউটারের একটি বড় সমস্যা; তবে তারও আগে বাস্তব সমস্যাটি হলো কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মৌলিক উপাদান কোয়ান্টাম কণিকাকে কীভাবে সন্নিবেশ করা যায় এবং সেখানে উপরিপাতিত নানা অবস্থার কিউবিটে ধরে রেখে তাদেরকে কাজ করতে দেয়া যায়। স্পষ্টত এগুলো হবে এটম, আয়োন (চার্জযুক্ত এটম), ইলেকট্রন, ফোটন ইত্যাদি কোন না কোন কোয়ান্টাম কণিকা। এগুলোকে ধরে রাখার জন্য একই সঙ্গে যদি কোয়ান্টাম জগতের না হয়ে চিরায়ত জগতের কিছু ব্যবহার করা হয় তাহলে ওগুলোর সঙ্গে একই সিস্টেমে থাকতে ওই কণিকার কোয়ান্টাম চরিত্র আর বজায় থাকবেনা, যেমন চিরায়ত জগতের যন্ত্রপাতি দিয়ে পরিমাপ করতে গেলে কোয়ান্টাম চরিত্র বজায় থাকেনা অনেকটা সেরকম। কাজেই ওই ধরে রাখার ব্যাপারটি সহজসাধ্য নয়। প্রাথমিক ভাবে এ সমস্যা সমাধানের যে চেষ্টা হয়েছে বা পরিকল্পনা করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আমাদের সেই আগে আলোচিত 'চৌম্বক ফাঁদ' যেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের ভেতর ওই কোয়ান্টাম কণিকাগুলোকে বাইরের সংস্পর্শহীন ভাবে রাখা যাবে। এমনি আরেকটি কৌশল হতে পারে 'আলোর ফাঁদ' যেখানে লেজার আলোর কোহেরেন্ট তরঙ্গের দ্বারা একই কাজ করা যেতে পারে। আগেই দেখেছি চৌম্বক ফাঁদ এবং লেজার নিজেরাও কোয়ান্টাম তাত্ত্বিক আয়োজন বলে তা কণিকার কোয়ান্টাম চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রাখে। এমনি আরেকটি কৌশলকে বলা হয় 'কোয়ান্টাম ডট' (কোয়ান্টাম ফোটা)– এতে অতি ক্ষুদ্র সেমিকন্ডাক্টর বস্তুকে সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম অবস্থায় বাইরের সংস্পর্শহীন অবস্থায় রাখা সম্ভব। একই কাজ করা যায় অতি নিম্ন উত্তাপে অতিপরিবহনের অবস্থায় কোয়ান্টাম কণিকাকে রেখে। আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি অতিপরিবাহী অবস্থায় পরিবহন ইলেকট্রনগুলো জোড়া গঠন করে এমন পরিস্থিতিতে চলে যায় যে তাদের পক্ষে বাইরের কোন বাধার সঙ্গে

বিক্রিয়া করা সম্ভব হয়না। এগুলোর কোনটাই নিয়মিত ভাবে করার জন্য সহজ নয় এবং এক্ষেত্রে সাফল্যগুলো এখনো প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে।

কোয়ান্টাম কম্পিউটারে ফলাফল মাপতে গিয়ে পুরো কোয়ান্টাম অবস্থাটিকে চুপসে দেবার যে সমস্যা সেটিও বেশি প্রকট। ফলাফল পাওয়ার জন্য কিউবিটগুলোকে সরাসরি উদ্ঘাটনের চেষ্টা করলে সেটি কিউবিটই থাকবেনা– সাধারণ বিট ০ বা ১ এ পরিণত হবে। সেক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হলো সরাসরি না দেখে বা না মেপে এর অবস্থাটি পরোক্ষভাবে জানা যায় কিনা। এক্ষেত্রেও একটি উপায় হতে পারে সেই কোয়ান্টাম বিজড়িত দুই কণিকা যার একটিকে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ব্যবহার করে অন্যটিকে দূরে অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করা যায়। কোয়ান্টাম বিজড়িত থাকার নিয়মে কম্পিউটারে একটি কণিকা তার যেই কিউবিটের অবস্থায় যাবে তার সঙ্গে বিজড়িত দূরের দোসর কণিকাটি তার ঠিক উল্টো অবস্থায় যাবে। সেখানে দোসর কণিকাটি অবস্থা মেপে তার উল্টোটা নিয়ে কম্পিউটারের কিউবিটটির মান জানা সম্ভব, অথচ এর ফলে কম্পিউটারের কিউবিটটির কোয়ান্টাম চরিত্র চুপসে যাবার কোন ভয় থাকবেনা– ওটি যথারীতি তার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে।

এভাবে নীতিগত ভাবে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের নানা সমস্যার সমাধান করে তার বাস্তবায়নের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে। তবে এর ভিত্তিতে বাস্তবে যে দু'একটি নমুনা কম্পিউটার তৈরি সম্ভব হয়েছে সেগুলো অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের; কোয়ান্টাম কম্পিউটারে সম্ভাব্য বড় বড় বৈপ্লবিক সুবিধাগুলো তাতে খুব একটা দৃশ্যমান নয়। কিন্তু ভবিষ্যতের কম্পিউটার যে এমনিতরো অভিনব কৌশলের ওপর নির্ভর করবে তা নিশ্চিত।

বাকি ইতিহাস

কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আপেক্ষিতার তত্ত্বের সঙ্গে মেলানো

এই দুই বৈপ্লবিক তত্ত্বঃ

এ পর্যন্ত কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আমরা তার মূল ধারাটি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি। শ্রোয়েডিঙ্গারের সমীকরণ ও তরঙ্গ-ফাংশান রয়েছে এর মূলে; সব কিছুর ব্যাখ্যা হিসেবে ম্যাক্স বর্নের সম্ভাবনার ধারণাকে মেনে নিয়েই যার পাখা মেলা। এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে কিছু দার্শনিক-বিজ্ঞানীর মৃদু অস্বস্থি থাকলেও এর অগ্রগতিতে তা বাধা হয়নি। এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের বিপুল সাফল্য একে নতুন পদার্থবিদ্যার কেন্দ্রে এনে দিতে পেরেছিলো। এর অনেক বক্তব্য প্রচলিত পদার্থবিদ্যার নিরিখে একেবারেই আজব মনে হওয়া সত্ত্বেও এটিই প্রকৃতির ব্যাখ্যায় প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, বিশেষ করে অণু-পরমাণুর ভিত্তিতে যেই প্রকৃতিকে দেখতে হয়।

কিন্তু একেবারে শুরু থেকেই কোয়ান্টাম তত্ত্বের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে আবিষ্কৃত আর একটি অভিনব তত্ত্ব আপেক্ষিকতার (রিলেটিভিটি) মিলমিশ হচ্ছিলোনা। দুটি তত্ত্বই চিরায়ত পদার্থবিদ্যাকে অনেক মৌলিক বিষয়ে অগ্রাহ্য করে আসা বৈপ্লবিক আবিষ্কার। অথচ কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করার সময় আপেক্ষিকতা তত্ত্বের নিয়মগুলো সেখানে অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হচ্ছিলোনা। ফলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রয়োগ সীমাবদ্ধ থাকছিলো শুধু সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে আপক্ষিকতাকে বিবেচনা না করলেও চলে। বড় জিনিসের ক্ষেত্রে যে রকম কোয়ান্টাম তত্ত্বকে তুচ্ছ করা যায়, তেমনি আলোর গতির তুলনায় কম বেগ সম্পন্ন জিনিসের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাকে তুচ্ছ করা যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা করে পার পাওয়া গেলেও, ক্ষুদ্র জিনিসের জগতে অনেক কিছুই তো বিপুল বেগে ছোটে, এ সেক্ষেত্রে কী হবে? এখানে সমস্যাটি আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এক করার। আইনষ্টাইন আপেক্ষিকতা তত্ত্বটি প্রথমে দিয়েছিলেন সরল রেখায় সমবেগে চলা নানা কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা কোন ঘটনার ভিন্ন ফল নিয়ে (আপেক্ষিকতা নিয়ে)– যাকে বলা হয় 'বিশেষ তত্ত্ব'। পরে তিনি বল প্রয়োগে গতি পরিবর্তিত কাঠামোগুলোর আপেক্ষিকতাকেও এতে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছিলেন 'সাধারণ তত্ত্ব'।

বিশেষ তত্ত্বের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এক করার চেষ্টাটি কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা গোড়া থেকে চিন্তা করেছেন, সে সময় না হলেও তাঁরা পরে সফলও হয়েছেন। এখানে সেই চেষ্টা ও সেই সাফল্যের কিছুটা দেখবো, সাধারণ তত্ত্বের সঙ্গে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে মেলাবার চেষ্টা এখনো চল্‌ছে। এই সাধারণ তত্ত্ব মাধ্যাকর্ষণের সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে মহাবিশ্বের মধ্যে সব বস্তুপুঞ্জের ভরের নিরিখে মহাবিশ্বের আকৃতি, বিকাশ ইত্যাদির ভবিষ্যদ্বাণী করছে। অথচ কোয়ান্টাম তত্ত্বকে এখনো পরীক্ষিত ভাবে এ তত্ত্বের সঙ্গে মেলানো সম্ভব হয়নি।

আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব অনুসারে কোন কিছুর সঙ্গে আপেক্ষিক গতিতে থাকা কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ওই গতিবেগ অনুযায়ী সংকুচিত হবে, তার কাছে থাকা ঘড়ি স্লো হবে, তার ভর বেড়ে যাবে। সাধারণ বস্তু যে গতি বেগে চলাচল করতে পারে সে ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনগুলো এত সামান্য হবে যে তাকে গ্রাহ্যই করা যাবেনা। কিন্তু কোন কিছু যদি আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে চলে তখন পরিবর্তনগুলো যথেষ্ট বড় হয়ে উঠতে পারে, আর আলোর গতিতে গিয়ে এ পরিবর্তন অসীম হয়ে পড়ে; তাই আলোর গতিই সর্বোচ্চ গতি, কোন বস্তু এই গতিতে চল্‌তে পারেনা। তাছাড়া বিশেষ তত্ত্ব অনুযায়ী স্থান আর কাল উভয়েই আপেক্ষিক, এবং এদের একটিকে আরেকটি দিয়ে বিনিময় করা চলে; তাই উভয়কে আলাদাভাবে ভাবার প্রয়োজন নেই স্থান-কাল বলে একাকার করে ভাবা যায়। শক্তি আর ভর এই দুই জিনিসও আলাদা কিছু নয়, এদের একটিকে অন্যটিতে রূপান্তরিত করা যায়, আইনস্টাইনের বিখ্যাত সমীকরণ $E = mc^2$ অনুসারে (যেখানে E শক্তি, m ভর, এবং c আলোর বেগ)।

কোয়ান্টাম তত্ত্বে এটম ইত্যাদির মধ্যে আবদ্ধ থাকা কালে ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র কণিকা স্থির তরঙ্গের রূপে থাকলেও মুক্ত অবস্থায় এদের পক্ষে আলোর গতির খুব কাছাকাছি গতিতে সমবেগে সরল রেখায় ছুটে চলা খুবই স্বাভাবিক। তা হলে এদের বর্ণনাতে আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের প্রভাবটি বিবেচনায় আনাটি খুবই যুক্তিযুক্ত।

ডিরাক সমীকরণঃ

আলোর কাছাকাছি গতিতে চলা কণিকাকে কোয়ান্টাম তত্ত্বের সমীকরণে না আন্‌তে পারার অস্বস্থিতো ছিলই, এর সঙ্গে সম্পর্কিত আরো একটি বিষয় বিজ্ঞানীদেরকে ভাবছিলো। ইতোমধ্যে এটমের ইলেকট্রনগুলোতে স্পিন নামে একটি অতিরিক্ত কৌণিক ভরবেগের অস্থিত্ব প্রমাণিত হয়েছিলো। এর জন্য যোগ করতে হয়েছে আর একটি কোয়ান্টাম নাম্বার স্পিন চৌম্বক কোয়ান্টাম নাম্বার যার

মান হতে পারে শুধু $+\frac{1}{2}$ অথবা $-\frac{1}{2}$; এই অনুযায়ী ইলেকট্রন থাকতে পারে স্পিন আপ ও স্পিন ডাউন এই দুই অবস্থার এর উপর ভিত্তি করে এটমের অবস্থায় কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারবে সেটির সীমা টেনে দেয়া বর্জননীতিও চমৎকার কাজ করতে দেখা গেছে। অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছিলো যে কোয়ান্টাম সমীকরণের মধ্য আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করতে না পারলে স্পিন জিনিসটি স্বাভাবিক ভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্বে দেখা দিতে পারেনা, একে অনেকটা কৃত্রিম ভাবে আনতে হয়।

কোন সমস্যায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের চর্চায় যে প্রথম বড় পদক্ষেপ তা হলো শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণটিকে সেক্ষেত্রে খাড়া করা। শ্রোয়েডিঙ্গারের যে কাঠামোটি এর আগে আমরা দেখেছি সেটি আবার স্মরণ করি। এর একদিকে রয়েছে স্থানের সঙ্গে ফাংশানের পরিবর্তন হারের পরিবর্তন হার অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তন হার। আবার এর অন্যদিকে রয়েছে সময়ের সঙ্গে এর পরিবর্তন হার– অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের পরিবর্তন হার। সমীকরণটির বাম ও ডান এই দুটি দিকের মধ্যে– একদিকে স্থানের ব্যাপার, অন্যদিকে সময়ের– দু'দিকের পরিবর্তন হারের পর্যায়ে দুই রকম হওয়াটি বলে দিচ্ছে যে শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ স্থান আর কালকে একই রকম সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেনি; যদি আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বকে বিবেচনায় আনতো তা হলে ব্যাপারটি দুদিকে একই রকম হতো। বিবেচনায় যে আসেনি তা স্থান ও কালের প্রতিসাম্যের এই অভাব থেকে বোঝা যাচ্ছে। শ্রোয়েডিঙ্গার যে তা চাননি তা নয়, তিনি আসলে শুরুতে উভয় দিকেই দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তনের হার ব্যবহার করেছিলেন– একদিকে স্থানের সঙ্গে পরিবর্তনের হারের পরিবর্তন হার, অন্যদিকে একই ভাবে সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন হারের পরিবর্তন হার। কিন্তু তাতে বিষয়টি অসম্ভব রকমের জটিল হয়ে পড়াতে তিনি এ চেষ্টা বাদ দেন, এবং আপেক্ষিক তত্ত্বের বাইরেই তাঁর বিখ্যাত শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করেন।

পরে অন্যদের কেউ কেউ শ্রোয়েডিঙ্গারের দেখা অতটা জটিলতা এড়িয়েই উভয় দিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিবর্তন হার রেখে সমীকরণটি দাঁড় করাতে পেরেছিলেন। কিন্তু দেখা গেছে যে এর সমাধানের মধ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্বের পরিচিত সব ফলাফলগুলোকে ধরা সম্ভব হচ্ছিলোনা। শ্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ ও ম্যাক্স বর্নের ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে এসব ফলাফল যুৎসই ভাবে পেতে সবাই এতো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে এসব সাফল্যের কোন দিক বিসর্জন দিয়ে বিকল্প কোন সমীকরণ গ্রহণযোগ্য হওয়া কঠিন ছিল, হোক্না তা আপেক্ষিকতা

তত্ত্বকে অন্তর্ভুক্ত করার মত সমীকরণ। অবশেষে বৃটিশ বিজ্ঞানী পল ডিরাক এসব সাফল্যের কোন কিছুকে বিসর্জন না দিয়েই, বরং আরো কিছু দারুণ নতুন সাফল্য সৃষ্টি করেই কোয়ান্টাম তত্ত্বে আপেক্ষিকতাকে আনতে পেরেছিলেন ইলেকট্রনের জন্য তাঁর নতুন সমীকরণের মাধ্যমে। এটি ডিরাক সমীকরণ নামে পরিচিতি।

ডিরাক তাঁর সমীকরণটির উভয় দিককেই প্রথম পর্যায়ের রেখে এগুলেন– একদিকে স্থানের সঙ্গে তরঙ্গ ফাংশানের পরিবর্তনের হার, অন্যদিকে সময়ের সঙ্গে তার পরিবর্তনের হার। এভাবে স্থান ও কাল উভয়ের মধ্যে প্রতিসাম্য ঘট্‌লো– আপেক্ষিকতা যা চায়। শুধু তাই নয় সমীকরণটি এখন স্থান-কালের চার মাত্রায় আসে; আপেক্ষিকতা তত্ত্বে স্থানের তিনমাত্রা (ডান-বাম, সামনে-পেছন, ওপর-নিচ) আর কালের এক মাত্রাকে (অতীত-ভবিষ্যত) একাকার করে এমনি চার মাত্রার স্থান-কাল রয়েছে। সমীকরণে তাই চার মাত্রার চারটি উপাংশ– যার ধরণটিই এমন যে তার চারটি বিভিন্ন সমাধান হতে পারে। $x^2=4$ এ সমীকরণটি সমাধান করলে যেমন x এর দুটি মান $+2$ এবং -2 পাওয়া যায়, এরও অনেকটা সেভাবে চারটি সমাধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুটি ধনাত্মক ও দুটি ঋণাত্মক। এখন ধনাত্মক দুটি সমাধান ইলেকট্রনের দুই স্পিন অবস্থাকে একেবারে মূল কোয়ান্টাম তত্ত্বের নিরিখে প্রকাশ করতে পারলো। শুধু তাই নয় সমাধানগুলো এও বলে দিতে পারলো যে কোয়ান্টাম স্পিনের কৌণিক ভরবেগের সঙ্গে জড়িত চৌম্বক শক্তির পরিমাপটি এই স্পিন জিনিসটিকে নেহাত চিরায়ত বিজ্ঞানের ঘূর্ণনের হিসেবে নিলে যা হবার কথা তার দ্বিগুণ। অন্যভাবেও এমনটিই পাওয়া যাচ্ছিল। ডিরাক সমীকরণ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো কোয়ান্টাম তত্ত্বে আবিষ্কৃত ইলেকট্রনের এই স্পিন নিজের অক্ষের ওপর ইলেকট্রনের মামুলি ঘূর্ণন নয় (যেভাবে চিরায়ত বিজ্ঞান লাটিমের ঘূর্ণনের মত করে একে দেখা যায়), বরং ইলেকট্রনের অন্তর্নিহিত একটি কোয়ান্টাম গুণ যা চিরায়ত বিজ্ঞানে বর্ণনা করা যায়না। কণিকা হিসেবে এটি ইলেকট্রনের একটি চির-পরিচয়, এর মান যে $+\frac{1}{2}$ অথবা $-\frac{1}{2}$ সেটির কোন নড়চড় সম্ভব নয়– ডিরাক সমীকরণ মৌলিক ভাবে এর চূড়ান্ত ফয়সালা করে দিয়েছে যেটি তার আগে হতে পারছিলোনা, নেহাত ধরে নিতে হচ্ছিলো। একটি বিমূর্ত গাণিতিক ঘূর্ণনে ইলেকট্রন হয় স্পিন আপ অবস্থায় থাকবে অথবা স্পিন ডাউন অবস্থায় থাকবে।

ডিরাক সমীকরণের বাকি দুটি সমাধান ঋণাত্মক হওয়াতে তাদের ব্যাখ্যা করাটি মোটেই সহজ হলোনা। স্পষ্টত এগুলো এমন ধারণা দিচ্ছে যে ইলেকট্রনের যে দুটি অবস্থার প্রতিনিধিত্ব তারা করছে তা ঋণাত্মক শক্তির। এমন কথার কোন

অর্থ হয়না কারণ এমন ঋণাত্মক শক্তির বাস্তবিক অর্থ করলে দাঁড়ায় যে কোন বস্তুর মধ্যে বল প্রয়োগ করলে সেটি বলের দিকে বেশি সচল না হয়ে বরং নিজের গতি কমিয়ে ফেল্‌ছে! বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক সময় সমীকরণের একাধিক সমাধান পাওয়া যায় যার কোন একটি বিজ্ঞানের দিক থেকে অর্থহীন হতে পারে। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানী সাধারণত অর্থপূর্ণ সমাধানগুলো রেখে অর্থহীনগুলোকে নেহাৎ বাস্তব অস্থিত্বহীন গাণিতিক ফল বলে বাদ দেন। ডিরাক সেটি করেননি। তিনি এমন অর্থহীন সমাধান যেন না আসে তার জন্য বিকল্প ধরণের সমীকরণের জন্য চেষ্টা করেন, তাতে সফলও হয়েছেন; কিন্তু তিনি দেখলেন তাতে তাঁর সমীকরণের পুরো সৌন্দর্যটাই মাটি হয়ে যায়। অনেক গণিতমুখী বিজ্ঞানীর মত ডিরাক বিজ্ঞানের গাণিতিক সৌন্দর্যের ওপর দারুণ গুরুত্ব দিতেন; এই বিজ্ঞানীরা মনে করেন অসুন্দর তত্ত্ব কখনো সত্যি হতে পারেনা ওই বিকল্প সমীকরণকে ডিরাকের কাছে তাই মনে হয়েছে। ডিরাক সমীকরণের এই সৌন্দর্যটি এতটাই মুগ্ধকর যে তিনি এর সব ক'টি সমাধানের মধ্য দিয়েই প্রকৃতি কিছু বলার চেষ্টা করছে এমনটিই ধরে নিলেন। ওই আপাত অর্থহীন দুটি সমাধানের মধ্যেও তিনি অর্থ দেখতে পেলেন।

ডিরাক ভাল করেই জানতেন যে চিরায়ত বিজ্ঞানে শক্তি নিরবিচ্ছিন্ন জিনিস, এটি হঠাৎ করে ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকে চলে যেতে পারেনা। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে এক অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় তাৎক্ষণিক ভাবে চলে যাওয়া সম্ভব– যে রকম নতুন অবস্থাটি ঋণাত্মক অবস্থা হতে দোষ কী? শক্তি ঋণাত্মক হওয়াটি সাধারণ ভাবে অকল্পনীয় হলেও ডিরাক এর জন্য একটি অদ্ভুত পরিস্থিতি কল্পনা করলেন। তিনি ধরে নিলে পুরো মহাবিশ্বটি জুড়েই রয়েছে ঋণাত্মক শক্তির অবস্থার যেন একটি মহাসমুদ্র– যাকে সবকিছুর জন্য একটি অফুরন্ত পটভূমির কাজ করছে মনে করা যায়। ধরে নেয়া হলো এই অবস্থাটি সম্পূর্ণ ভাবে ইলেকট্রনে ঠাসা– স্পিন আপ আর স্পিন ডাউন এরকম জোড়া জোড়া ইলেকট্রনে। যেহেতু সর্বত্র জুড়ে অবস্থাটি সম্পূর্ণরূপে ভর্তি আছে, অর্থাৎ নিশ্ছিদ্র ভারসাম্যে রয়েছে– কাজেই এর বাইরের কিছুর সঙ্গে তার কোন ক্রিয়া বিক্রিয়া নেই, যে কারণে পানিতে থাকা মাছের মত আমরা এর সম্পর্কে কিছু জানবনা এর অস্থিত্ব টের পাবনা এ কারণেই। কিন্তু যেই মুহূর্তে ঋণাত্মক শক্তি অবস্থার ইলেকট্রনের মহাসমুদ্র থেকে একটি ইলেকট্রন কোয়ান্টাম-লাফ দিয়ে বাইরের পরিচিত ধনাত্মক শক্তির অবস্থায় চলে আসে তখন কিন্তু এমন বোঝা না যাওয়া পরিস্থিতিটা বদ্‌লে যায়। ওভাবে আমরা একটি সাধারণ ইলেকট্রন পেয়ে যাই যা স্বাভাবিক ইলেকট্রনের মত চলাচলের আচরণ করতে পারে। অন্যদিকে ওই

ইলেকট্রনের না বোঝা যাওয়া মহাসমুদ্রে এটি একটি শূন্যস্থান বা 'হোল' (গর্ত) রেখে যায়। পুরো ঠাসা জায়গায় একটি হোল সৃষ্টি হলে সেটি যেখানে একটি স্বাভাবিক কণিকার মত চলাচল করতে পারে। যেমন ধনাত্মক কিছুর আকর্ষণের কারণে ওখানকার একটি ইলেকট্রন সেই হোলকে ভর্তি করলো। মনে হবে আগের হোলটি ওখানে উল্টো দিকে সরে গেল– অর্থাৎ সেই কণিকাটিই যেন উল্টো দিকে গেল। তা হলে কার্যত ওই হোলটিকে আমরা একটি ধনাত্মক কণিকাই বলতে পারি। অনেকটা এরকম 'হোল' ধনাত্মক বিদ্যুৎ পরিবাহী হিসেবে সেমিকন্ডাক্টরের ভ্যালেন্স ব্যান্ডের মধ্যে আমরা দেখেছি গত অধ্যায়ে।

ডিরাক তাই বল্লেন ওই যে তাঁর দুটি ঋণাত্মক সমাধান এগুলো আসলে ইলেকট্রনটির বিপরীতে ছায়ার মত থাকা এই রকম ধনাত্মক কণিকার খবর দিচ্ছে– এর বৈদ্যুতিক চার্জ ইলেকট্রনের ঠিক সমান ও বিপরীত বলে এমন কণিকার খবর মিল্বে এমনি সমাধানের মধ্যেই– দুটি সমাধানের প্রত্যেকটি ওই কণিকার এক একটি স্পিন অবস্থার। জানা কণিকার মধ্যে এর সঙ্গে মেলে প্রোটন। তাই শুরুতে একে প্রোটন বলে তিনি ধরে নিলেন। কিন্তু শিগ্গির তিনি বুঝলেন ইলেকট্রনের থেকে দু'হাজার গুণ ভারি– প্রোটন ওই 'হোলের' ছদ্মবেশে ইলেকট্রনের ছায়াসঙ্গী হতে পারেনা। ইলেকট্রন আর তার সঙ্গীর ভর সমান হতে হবে– কিন্তু ভর ইলেকট্রনের সমান অথচ চার্জ তার বিপরীত এমন কোন কণিকার কথা তো জানা নেই। ডিরাক এতে দমে গেলেননা– তাঁর অতি সুন্দর সমীকরণের ওপর তাঁর আস্থা অবিচল, এটি ভুল বলতে পারেনা। জানা নেই তো কী হয়েছে, সমীকরণ যখন বল্ছে এমন কণিকা থাকতেই হবে– শিগ্গির এটি আবিষ্কৃত হবে। এর একটি নামও দেয়া হলো অ্যান্টি-ইলেকট্রন (ইলেকট্রনের বিপরীত বা প্রতিইলেকট্রন বোঝাতে), পরে আরো সুনির্দিষ্ট নাম পজিট্রন। এর অল্প কিছুদিন পর ১৯৩২ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী অ্যান্ডারসন মহাশূন্য থেকে আসা কসমিক রে'র মধ্যে ঠিকই এই পজিট্রন দেখতে পেলেন– ঠিক যে সব গুণ ডিরাক সমীকরণ বলে দিয়েছে সেই সব গুণ নিয়ে।

ডিরাক সমীকরণ শুধু ইলেকট্রনের সমীকরণ নয়, স্পিন $\frac{1}{2}$ যে কোন কণিকার জন্যই প্রযোজ্য এবং তারও প্রতিকণিকার জন্য, তারও প্রত্যেকটির প্রতি কণিকা থাকতে হবে এবং তা আছে। এও বোঝা গেছে যে একটি কণিকা ও তার প্রতিকণিকা একত্রিত হলে উভয়ের বিলোপ ঘটে। যেমন ইলেকট্রন যখন পজিট্রনের সঙ্গে মিশে যায় তখন উভয়ের বিলোপ ঘটে। যেমন কোয়ার্ক নামক যে কণিকার কয়েকটি মিলে প্রোটন আর নিউট্রন গঠিত হয় তাদের ক্ষেত্রেও; এবং

সেই সুবাদে প্রোটন ও নিউট্রনের ক্ষেত্রেও। এগুলোর সবেরই স্পিন $\frac{1}{2}$ । যেহেতু প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রন দিয়ে এটম গঠিত হয়, কাজেই অ্যান্টি-প্রোটন, অ্যান্টি-নিউট্রন আর অ্যান্টি-ইলেকট্রন (পজিট্রন) দিয়ে গঠিত হয় অ্যান্টি-এটম। আর অ্যান্টি-এটমে গড়া হয় অ্যান্টি-ম্যাটার (প্রতিবস্তু)। বস্তুর সঙ্গে প্রতিবস্তুর মিলন ঘটলে উভয়েরই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়– মহাবিশ্বের ইতিহাসের শুরুতে এমনটি ঘটছে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা, যদিও প্রতিবস্তুর থেকে বস্তু কিছু বেশি ছিল বলে তারপরও এতটা বস্তু মহাবিশ্বে রয়ে গেছে। তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের এমন সব দুর্দান্ত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে ডিরাক সমীকরণ থেকে; আর এর মধ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বকে এক জায়গায় আনাও সম্ভব হয়েছে।

কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব

এখানে ক্ষেত্রই সবচেয়ে মৌলিকঃ

ডিরাক সমীকরণ কোয়ান্টাম তত্ত্বকে আরো অনেক দূর গিয়েছিলো বটে কিন্তু কিছু সমস্যা এখনো বেশ প্রকট ছিল। প্রকৃতিতে এমন কিছু ঘটনা স্পষ্ট ছিল যেগুলো চিরায়ত বিজ্ঞানে থাকার কথা নয় অথচ কোয়ান্টাম তত্ত্বও তার কোন সুরাহা করতে পারছিলোনা। এরকম ঘটনার একটি উদাহরণ হলো ফোটনের সঙ্গে ফোটনের বিক্রিয়া– আলোর এই কণিকাগুলো কী ভাবে একের সঙ্গে অন্যটি সংঘর্ষ করে তার তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী করা যাচ্ছিলোনা। আরেকটি উদাহরণ হলো শূন্যতার মধ্য থেকে ইলেকট্রন-পজিট্রন জোড়ার সৃষ্টি এবং পরক্ষণেই তার বিনাশের যে ব্যাপারটির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিলো তার তাত্ত্বিক ভবিষ্যদ্বাণী। তাছাড়া এটমের নিউক্লিয়াসের নানা বিষয়ের তাত্ত্বিক দিকগুলো স্পষ্ট হচ্ছিলোনা– যেমন নিউক্লিয়াসের এত ছোট জায়গার মধ্যে ধনাত্মক কণিকা প্রোটন এভাবে জড়াজড়ি করে থাকতে পারে কী ভাবে একই চার্জের পরস্পর বিকর্ষণের নিয়মে তো তা হতে পারার কথা নয়। তাছাড়া তেজস্ক্রিয় এটমের নিউক্লিয়াস থেকে ঋণাত্মক বিটা কণিকা নির্গত হবার ক্ষেত্রেও এমন কথা ওঠে, কারণ ধনাত্মক নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ এড়িয়ে এটি আসতে পারার কথা তো নয়ই, তা ছাড়া আগাগোড়া ধনাত্মক প্রোটন ও নিরপেক্ষ নিউট্রনে গড়া নিউক্লিয়াসে ঋণাত্মক বিটা কণিকা আসলোই বা কোথা থেকে। মনে হচ্ছিলো এসব প্রশ্নের সুরাহা হতে সুবিধা হতো যদি পদার্থবিদ্যার একটি অপরিহার্য ধারণা 'ক্ষেত্রকে' (ফিল্ড) যদি কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হতো; সেটি এখন পর্যন্ত এ তত্ত্বের বাইরেই থেকে গিয়েছিলো।

বিদ্যুৎ-চৌম্বক তত্ত্বের একেবারেই শুরু থেকেই বিদ্যুৎ ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের বিষয়টি কল্পনা করা হয়েছে এবং তাতে ওই তত্ত্বে একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র দেয়া হয়েছে। তা ছাড়া মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মাধ্যমে অন্য রকম বলের ক্ষেত্রেও তা সম্প্রসারিত হয়ছে। এ যেন যে কোন ভরের (মহাকর্ষ ক্ষেত্রের জন্য), যে কোন চার্জের (বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের জন্য) এবং যে কোন চৌম্বক মেরুর (চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য) উপস্থিতি এর ফলে তার চারদিকের স্থানে একটি বিশেষ প্রভাব বলয় তৈরি করে যেখানে এলে অন্য ভর, অন্য চার্জ, বা অন্য চুম্বক মেরু একটি বল অনুভব করে প্রতি বিন্দুতে যার পরিমাণ, দিক ইত্যাদি সৃষ্টি করা যায়। এটিই ফিল্ড বা ক্ষেত্র যার নিরিখে চিরায়ত পদার্থবিদ্যার অনেক কিছুকেই বর্ণনা করা হয়। এর কোন কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় রূপ না থাকাটিকেই অনেকে নতুন সমস্যাগুলোর সমাধানের পথে বাধা হিসেবে দেখছিলেন। ক্ষেত্রকে কোয়ান্টাম তত্ত্বে এনে বিদ্যুৎ গতিবিদ্যার একটি পূর্ণাঙ্গ কোয়ান্টাম তত্ত্বীয় বর্ণনা না পাওয়ার অভাবটি বিশেষ ভাবে অনুভূত হচ্ছিলো। এও বেশ মজার ব্যাপার। শুরুতে অনেকে বিজ্ঞানে আজব রকম আচরণকারী কোয়ান্টাম তত্ত্বকে পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি উট্‌কো ঝামেলা বা আপদ বলে মনে করে এর আজব কথাগুলো এড়ানো যায় কিনা সে চেষ্টা করছিলেন। আর এখন পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে এতে এতই অপরিহার্য মনে হচ্ছিলো যে কেন এটি আরো পূর্ণাঙ্গ ভাবে সব কিছুকে তার ডানার তলে আনছেনা সেটিই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এই চাহিদায় সাড়া দিয়ে চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে কয়েক জন বিভিন্ন বিজ্ঞানীর হাত দিয়ে এলো প্রত্যেকের থেকে কিছুটা ভিন্ন রূপে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব (কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি)।

এর সহজতম প্রকাশ কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স – ইলেকট্রন আর বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র নিয়ে। চিরায়ত তত্ত্বে ক্ষেত্রের ধারণায় মনে হয়েছে স্থানের মধ্যে ক্ষেত্রের একটি নিজস্ব সত্তা রয়েছে– যেমন বিজ্ঞানী ফ্যারাডে যিনি প্রথম এর কথা বলেছেন তাঁর কাছে মনে হয়েছে এ যেন কিছু অদৃশ্য দড়িদড়া যা চার্জকে টানছে বা ঠেলছে, ম্যাক্সওয়েলের কাছে তা কিছুটা ভিন্ন রকম জিনিস। কিন্তু কোয়ান্টাম তত্ত্বে শুরুতেই যেটি ধরে নিতে হয় যে এটি কোন জিনিসই নয়, বরং এটি জিনিস সৃষ্টি করতে পারে– যেমন কণিকাকে; ওটাই তার গুরুত্ব ওটাই তার সত্তা। কোয়ান্টাম তত্ত্বে ক্ষেত্র কোন জিনিস না হলেও তার মধ্যে টান বা ঠেলার ওই বলগুলো ঠিকই আছে, আর প্রতি বিন্দুতে তার প্রকাশ আছে। এই প্রকাশটি যেন আমাদের কাছে বোধগম্য হয় সে জন্য মনে মনে কিছু জিনিস আমরা কল্পনা করতে পারি, পরে যাকে বাদ দিতে পারি। ধরা যাক্ এই কল্পনার জিনিসগুলো হলো প্রতিটি বিন্দুতে একটি স্প্রিঙের প্রান্তে একটি বল। স্প্রিংটি বল্‌কে সব সময়

কাঁপাচ্ছে। স্প্রিঙের ওপর এ বল ক্রমাগত ওঠানামা করছে। বল্‌টির উচ্চতা ঠিক ওই জায়গায় তীব্রতা সূচিত করবে। এভাবে প্রতিটি স্প্রিং-বল আবার পরস্পরের সঙ্গে পাতলা অন্য স্প্রিং দিয়ে সংযুক্ত রয়েছে, যাতে একটির কাঁপুনি অন্যগুলোতেও সঞ্চারিত হতে পারে। এই সব স্প্রিং-বল ব্যবস্থায় যা ঘটবে তেমনি ঘটনা ক্ষেত্রের মধ্যে ঘটে বলেই এগুলোর অবতারণা, তাছাড়া এগুলোর কোন সত্যতা নেই। ক্ষেত্রের পুরো বিস্তারের মধ্যে এগুলো রয়েছে বলে ধরে নিতে পারি।

এখন এর কোন জায়গায় হাত দিয়ে একটি থাপ্পড় দিলে তা ক্ষেত্রে মধ্যে শক্তি প্রয়োগের মত হবে। থাপ্পড়ের ফলে একটি কাঁপুনি ওই স্প্রিং-বল গুলোর মধ্য দিয়ে চলে যাবে। কোয়ান্টাম তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখতে গেলে একে বলা যায় একটি কণিকা সৃষ্টি হয়ে ক্ষেত্রটির মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছে। কণিকাটি সৃষ্টি হলো কিন্তু ক্ষেত্রের কারণে, ক্ষেত্রটিই এখানে বেশি মৌলিক– কারণ ক্ষেত্রের গুণাগুণের ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। এখন আর একটি থাপ্পড় দিলে দ্বিতীয় আরো যে একটি 'কণিকা' সৃষ্টি হবে তার সঙ্গে প্রথমটির সংঘর্ষ ঘটতে পারে, একটির দ্বারা অন্যটি বিক্ষিপ্ত হতে পারে। আমাদের স্প্রিং-বল ব্যবস্থার মধ্যে দুই কাঁপুনির পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া দেখে আমরা সেটি বুঝতে পারি। এক্ষেত্রে এগুলো নির্ভর করে মূল স্প্রিং এবং এদের সঙ্গে আটকানোর স্প্রিঙের গুণাগুণের ওপর– এরা কত শক্ত, কত টাইট, কতখানি স্থিতিস্থাপক ইত্যাদির ওপরেই তো এদের কাঁপুনি নির্ভর করবে। সত্যিকার ক্ষেত্রেও তাই, ক্ষেত্রের গুণাগুণের ওপরেই ওই কণিকাগুলোর সৃষ্টি, সংঘর্ষ, বিক্ষেপন নির্ভর করছে। আমরা আমাদের ওই স্প্রিং-বল ছবিতে ওকে কাঁপুনি বলেছি, আসলে এটি একটি তরঙ্গ বা ঢেউয়ের মতইতো। যদি দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্ট এর ওপর করা হয় তা হলেও দেখবো এগুলো তরঙ্গ। কোয়ান্টাম তত্ত্বে ক্ষেত্রের কথায় এলে তরঙ্গ-কণিকা দ্বৈততার কথা মনে করা যায় বটে, কিন্তু কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব একে কণিকা হিসেবেই দেখতে চায়।

এই স্প্রিং-বল ব্যবস্থাকে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র হিসেবে দেখতে হলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের আরো মৌলিক বিষয়গুলোও এর ওপর আরোপ করতে হবে। ওই যে স্প্রিং-বল ব্যবস্থা তাতে যে থাপ্পড় দেবার কথা বলা হলো তা যে কোন শক্তির সঙ্গে দিলে কোন কাজ হবেনা, সব রকম থাপ্পড় ওখানে কাঁপুনির (কণিকা) সৃষ্টি করবেনা। সেটি করতে হবে একটি ন্যূনতম শক্তির থাপ্পড়ের গুণিতকে– এর কম হলে চলবেনা, এর কোন রকম ভগ্নাংশ থাকতে পারবেনা। কাজেই বলগুলোর দিকে যদি লক্ষ্য করি দেখবো এই কোয়ান্টাম নিয়ম সেখানে দুটি বাধ্যবাধ্যকতা

এনে দিচ্ছে। প্রথমটি হলো বলটি যে ওঠানামা করছে তা কখনো পুরোপুরি থেমে যেতে পারবেনা। একটি নূন্যতম কাঁপুনির উচ্চতা তার সব সময় থাকতেই হবে। দ্বিতীয় বাধ্যবাধ্যকতা হলো বল কোন্ কোন্ উচ্চতায় থাকতে পারবে তার কিছু অনুমোদিত মান থাকবে, এদের মাঝামাঝি উচ্চতায় কোনটি থাকতে পারবেনা। বলা যায় বলের কাঁপুনিটি এভাবে কোয়ান্টায়িত হলো– অর্থাৎ কিনা ক্ষেত্রটি এভাবে কোয়ান্টায়িত হলো।

ক্ষেত্রের কোয়ান্টায়নের ফলগুলোও অদ্ভুত রকমে হতে বাধ্য। যেমন একটি ফলশ্রুতি হলো আগে যে ভাবে বলা হয়েছে সে রকম অনুমোদিত কোয়ান্টামের শক্তি নিয়ে এক একটি কণিকা সৃষ্টি হতে পারে। যে দর্শক কণিকাটির পরিপ্রেক্ষিতে স্থির রয়েছে তার কাছে এই শক্তিটুকুই কণিকাটির স্থির ভর। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী ভর আর শক্তি একই জিনিস একটিকে অন্যটিতে রূপান্তরিত করা যায়। যে দর্শক কণিকাটির তুলনায় গতিতে রয়েছে তার কাছে অবশ্য কণিকার এই ভর গতি অনুযায়ী বেড়ে যাবে– তাও আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী।

কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্সে যখন আমরা কণিকাটিকে বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে ইলেকট্রন হিসেবে পাই তখন ওই ইলেকট্রন সৃষ্টিকারী ইলেকট্রন ক্ষেত্রটির দিকেই মনোযোগ দিতে হয়। আসলে ইলেকট্রন সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকেই ইলেকট্রন ক্ষেত্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্রের বিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়। ইলেকট্রনের স্থির ভর খুব ছোট। এর বদলে বেশি স্থির ভরের একটি কণিকা হিগ্স বোসনের কথা ভাবা যাক। মাত্র কয়েক বছর আগে জেনেভার অত্যন্ত শক্তিশালী কণিকা ত্বরকে বহু আগে ভবিষ্যদ্বাণী করা হিগ্স বোসনের প্রথম সন্ধান পাওয়া গেছে। সেখানে অন্য কণিকার প্রচণ্ড সংঘর্ষের ঝাপটার ফলেই খুবই বড় শক্তি কোয়ান্টামের হিগ্স ক্ষেত্র থেকে হিগ্স বোসন সৃষ্টি হয়। আর যদি একেবারে শূন্য স্থির ভরের কণিকা ফোটনের কথা চিন্তা করি বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্র নিজের থেকেই তার সৃষ্টি। শক্তিশালী ত্বরকের কণিকা সংঘর্ষের ঝাপটা যে ভাবে হিগ্স বোসন কণিকা সৃষ্টি করেছে, বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গে অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট ঝাপটা ফোটনের সৃষ্টি করতে পারে। এই সব ক্ষেত্রে ক্ষেত্রটিই হচ্ছে মৌলিক, ক্ষেত্র থেকেই কণিকার সৃষ্টি; ক্ষেত্র কোয়ান্টায়িত হওয়ার কারণেই এটি সম্ভব হয়েছে। ইলেকট্রন ক্ষেত্র থেকে ইলেকট্রনের সৃষ্টি হবার কথা দেখেছি। ইলেকট্রনের সঙ্গে ইলেকট্রনের বিক্রিয়া ঘটে বিদ্যুৎ চৌম্বক ক্ষেত্রে– ফোটন নামক বোসনটির মধ্যস্থতায়। যেই কোয়ার্ক কণিকাগুলো প্রোটন আর নিউট্রন গঠন করে সেই কোয়ার্ক সৃষ্টি হয় কোয়ার্ক ক্ষেত্র থেকে। প্রোটনের মধ্যে বা নিউট্রনের মধ্যে এই কোয়ার্কগুলো

পরস্পরের সঙ্গে একত্রে থাকে আর একটি বোসন কণিকার মধ্যস্থতায়– সেটি হলো গ্লুয়োন ক্ষেত্রের সৃষ্ট গ্লুয়োন কণিকা। এভাবে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রনের মত ফার্মিয়ন কণিকা, অন্যদিকে ফোটন, গ্লুয়োনের মত বোসন কণিকা যার যার ক্ষেত্র থেকে সৃষ্টি হচ্ছে এবং পরস্পর বিক্রিয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

সম্ভাব্য সকল পথের যোগফলঃ

যে ক'জন বিজ্ঞানী বিভিন্ন ভাবে কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন আমেরিকার রিচার্ড ফাইনম্যান তার অন্যতম। পুরো কোয়ান্টাম তত্ত্বের মৌলিক বিষয়টিকে তিনি বেশ একটু ভিন্ন ভাবে দেখেছেন যা অন্য দৃষ্টিভঙ্গিগুলো থেকে আরো বেশি অদ্ভুত বই কম নয়। ১৬৫৭ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ ফার্মা দেখিয়েছিলেন যে আলো সরল রেখায় যাওয়ার কারণ হলো সরল রেখায় গেলেই শুধু এটি এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে সব চেয়ে কম সময়ে যেতে পারে, আর সব চেয়ে কম সময়ে যাওয়াটাই এর নীতি। ফাইনম্যান এই নীতিটিকে অনুসরণ শুধু করলেন না, বরং এর মধ্যে থাকা একটি সমস্যার উত্তরও দেবার চেষ্টা করলেন। সমস্যাটি হলো আলো যখন পথে থাকে তখনই কেমন করে বুঝতে পারে কোন পথে এগুলে শেষ পর্যন্ত তার সব চেয়ে কম সময় লাগবে। এর একটি উত্তর অবশ্য চিরায়ত পদার্থবিদ্যার আলোর তরঙ্গ তত্ত্বেই রয়েছে। এতে বলা যায় আলো আসলে সব পথেই যাচ্ছে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে, সরল রেখায় সহ। কিন্তু শুধু সরলপথ ও তার খুব কাছাকাছি পথে যাওয়া আলোক তরঙ্গই পরস্পর ইন্টারেফেরেন্সের ভাঙ্গাগড়ায় টিকে থাকে, অন্যত্র তা শূন্যে পরিণত হয়। ফাইনম্যান কিন্তু ওই ব্যাখ্যায় না গিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব সম্মত অন্য ব্যাখ্যা দিলেন। তিনি বল্‌লেন আলোক কণিকার গতি ঠিক হবে তার যত বিভিন্ন পথে এটি এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে পারে সব ভাবে যাওয়া পথের যোগফল দ্বারা; একটু অন্যভাবে বল্‌লে কণিকাটির যত রকম 'ইতিহাস' সম্ভব হতে পারে সব ইতিহাসের যোগফলের দ্বারা। যোগফলটি নেয়ার সুবিধার জন্য ওরকম যে অসীম সংখ্যক পথ হতে পারে তার প্রত্যেকটির কতখানি গুরুত্ব তা স্থির করতে ফাইনম্যানের নিয়ম মত একটি 'উচ্চতা' তাতে আরোপ করা তার। ওই যোগফল হলো এসব অসংখ্য উচ্চতার ক্যালকুলাস গণিত বর্ণিত ইন্টেগ্র্যাল।

আমাদের অতি পরিচিত দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্টে ফাইনম্যানের এই ধারণাটি প্রয়োগ করলে কী পাব? আলোর উৎস থেকে নির্গত ফোটন দুটি ফাটলের যে কোন একটির ভেতর দিয়ে গিয়ে পর্দার যে কোন বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছতে পারবে। উৎসে ওই শুরুর বিন্দু এবং পর্দায় এর একটি শেষের বিন্দু ধরে নিলে প্রথমটি

থেকে দ্বিতীয়টিতে যেতে ফোটনটি অসীম সংখ্যক পথের যে কোনটি ধরে– নানা ভাবে ঘুরে ফিরে ফাটলের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, এমনকি একাধিকবার ফাটল অতিক্রম করে যেতে পারে। ফাইনম্যানের নিয়মে এই সবের যোগফল (ইন্টেগ্র্যাল) নিয়ে পর্দার ওই বিন্দুতে ফোটনটি হাজির হওয়া না হওয়ার সম্ভাবনাটি জানা যায়। পর্দায় ঝালর সৃষ্টির পরিমাপকৃত তথ্যের সঙ্গে এই সম্ভাবনা মিলে যায়। কিন্তু প্রশ্ন হলো একই ফোটন এতো অসংখ্য পথে এক সঙ্গে গেলো কী ভাবে? কোয়ান্টাম তত্ত্বের অন্য ভাবে দেখা বিষয়গুলোর মত এই বিষয়টিকেও মেনে নিতে হয় কারণ এটিও বরাবর সফল ফলাফল দিচ্ছে।

ব্যাপারটি যদি একটি ক্রিকেট বলের মত বড় জিনিসের হয় তখনো সেটি অসীম সংখ্যক পথে যাওয়ার কথা। কিন্তু একটি পথ ছাড়া অন্য সব পথের 'উচ্চতা'গুলো যোগফল বের করার সময় কাটাকুটি হয়ে শূন্য হয়ে যায়। শুধু ওই পথটির উচ্চতার গুরুত্ব থাকে আর সে পথটি হলো চিরায়ত বিজ্ঞানের গতিবিদ্যায় পাওয়া পথ। কিন্তু ফোটন বা ইলেকট্রনের মত ক্ষুদ্র কণিকার ক্ষেত্রে একথা বলা যায়না। এখানে প্রত্যেকটি পথেরই কমবেশি গুরুত্ব রয়েছে। এদের যোগফল থেকে ফলাফল পাওয়া যায়। এই ফলাফলে সব পথেরই অবদান থাকে। একরম নানা পথে চলে বলেই এগুলো দুই ফাটল এক্সপেরিমেন্টে ইন্টারফেরেন্স ঝালর সৃষ্টি করতে পারে।

আমরা দেখেছি কী ভাবে কোয়ান্টায়িত ক্ষেত্র তার শক্তি কোয়ান্টামকে কণিকার রূপ দিচ্ছে এবং সেই কণিকার সঙ্গে বিক্রিয়া করছে। উদাহরণ স্বরূপ এভাবে বিদ্যুৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম দুটি চার্জ বিশিষ্ট কণিকার বিক্রিয়ার সময় ফোটন রূপে সৃষ্টি হয়– যেমন ইলেকট্রন-ইলেকট্রন অথবা ইলেকট্রন-প্রোটন বিক্রিয়ায়। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য ওই ফোটনের বিলয় ঘটে। একই ভাবে ইলেকট্রনের মত কণিকারও সৃষ্টি ও বিলয় ঘটতে পারে। সেক্ষেত্রে ব্যাপারটি হবে ইলেকট্রন ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম তত্ত্ব; এমনি ভাবে কোয়ার্ক ক্ষেত্রের কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইত্যাদি। এর সবগুলোতে তত্ত্বটির মূলে থাকে তার ক্ষেত্র-সমীকরণ, যার সমাধান থেকে ফলাফলগুলো আসে। প্রায়শ অবশ্য ক্ষেত্র-সমীকরণগুলোর নিখুঁত সমাধান সম্ভব হয়না। সেক্ষেত্রে পারটারবেশন বা বিচ্যুতি নামের একটি পদ্ধতির কৌশল নেয়া হয়। এতে সমীকরণটির নিখুঁত সমাধানযোগ্য মূল অংশটিকে প্রথমে আলাদা করে নেয়া হয়– একে বলা হয় নূন্যতম পর্যায়ের সমীকরণ। সে সব জটিলতা নিখুঁত সমাধানে বাধা দেয় সেগুলো এতে থাকেনা; তাই সেই সমাধানে প্রকৃত ঘটনা প্রতিফলিত হয়না। সে রকম প্রতিফলন ঘটাতে হলে এর সঙ্গে কিছু কিছু সংশোধনমূলক অংশ যোগ করতে হয়, যাকে মূল সরলতর অংশের কিছু

বিচ্যুতি হিসেবে দেখা যায়। এই অংশ কয়েক ভাগে আসে যাকে একটি পাওয়ার সিরিজ হিসেবে প্রকাশ সম্ভব। অর্থাৎ প্রথম বিচ্যুতিটিকে যদি x^1 হিসেবে প্রকাশ করা হয় তাহলে পরেরটি হবে x^2, এর পরেরটি x^3 ইত্যাদি। x একটি ভগ্নাংশ বলে পর পর বিচ্যুতি গুলো ছোট থেকে খুবই ছোট ও কম গুরুত্বপূর্ণ হয়। এভাবে নূন্যতমের পর আমরা প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি পর্যায়ের সমীকরণ পাবো যা বাস্তবতার ক্রমাগত কাছে হবে। মূল সমাধানের সঙ্গে এসব বিচ্যুতির প্রভাবগুলো যোগ করে যথেষ্ট নিখুঁত ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

বিচ্যুতিগুলোকে যাতে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে বিবেচনা করা যায় সে জন্য ফাইনম্যান বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র কণিকার সঙ্গে কী ভাবে বিক্রিয়া করে তা এক রকম রেখা-চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার ব্যবস্থা করেছেন। একে বলা হয় ফাইনম্যান ড্রায়াগ্রাম। ফাইনম্যানের তত্ত্বে সব পথের যোগফলের নীতিটিই অনুসরণ করা হয়; উৎস থেকে গন্তব্যে যাওয়ার যতগুলো পথ কণিকার কাছে সম্ভব তার মধ্যে সরাসরি পথটিরই শূন্য পর্যায়ের হয়; কিন্তু অন্যান্য পথগুলোকে তুচ্ছ করা যায়না– সেগুলো বিচ্যুতি হিসেবে ঠিকই আসে। সব পথের যোগফল সঠিক ভাবে নির্ণয় করতে ইনটেগ্রাল ক্যালকুলাসের যে অংক তা অত্যন্ত জটিল হতে পারে বলে এই তত্ত্বে হিসেবে বোধগম্যতা বজায় রাখতে ফাইনম্যান ডায়াগ্রাম খুব সহায়ক হয়। আর এ জন্য কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বে এই পদ্ধতিটি বিশেষ মনোযোগ পেয়েছে।

কিন্তু শেষ অবধি কোয়ান্টাম ক্ষেত্র তত্ত্বের প্রত্যেকটি রূপই প্রকৃতির কোন কোন দিকের তথ্যকে অত্যন্ত সফল ভাবে নির্ণয় করতে পেরেছে– কয়েকটি তথ্যের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের নিখুঁত ফলাফল দিয়ে। প্রাথমিক কোয়ান্টাম তত্ত্বে ব্যাখ্যা পাচ্ছিলনা বলে যে সব বিষয় আমরা আগে দেখেছি ক্ষেত্র-তত্ত্ব সেগুলোকেও কোয়ান্টাম তত্ত্বের ভেতর এনে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছে। এ সাফল্য এসেছে ক্ষেত্রকে কোয়ান্টাম তত্ত্বে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করে এবং তার থেকেই কণিকা সমূহের সৃষ্টি, বিলয়, পরস্পর ক্রিয়া ইত্যাদি খুঁজে নিয়ে। একে বলা যায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের সর্বাধুনিক ও সব চেয়ে সৌকর্যমণ্ডিত রূপায়ন।

কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থা

বিজড়িত থাকার মানেঃ

কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থার সঙ্গে আমাদের কিছুটা সাক্ষাত ঘটেছে কোয়ান্টাম ঘড়ি, কোয়ান্টাম কম্পিউটার ইত্যাদির আলোচনা প্রসঙ্গে। এখানে এই

অবস্থাটিকে আরো ভাল করে বুঝতে চাই। ১৯৩৫ সালে আইনস্টাইন আরো দু'জন বিজ্ঞানী পডোলস্কি ও রোজেনকে সঙ্গে নিয়ে এমন কিছু ধারণা প্রকাশ করেছিলেন যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব একটি অসম্পূর্ণ তত্ত্ব; এই তিন জনের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে এই ধারণাটি ইপিআর নামে পরিচিত। ওরকম ধারণা করার কারণ ছিল মনে মনে করা একটি এক্সপেরিমেন্ট। এরকম এক্সপেরিমেন্টে দেখানো যায় যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী সম্পর্কিত দুটি কণিকা পরস্পরের সঙ্গে এমনভাবে বিজড়িত হয়ে থাকে যে একটির অবস্থা অন্যটির অবস্থাকে নির্দিষ্ট করে দেয়, একটিতে অবস্থার পরিবর্তন ঘট্‌লে সে অনুযায়ী অন্যটিতেও পরিবর্তন ঘটে। এরকম বিজড়িত দুটি কণিকার ভরবেগ, অথবা কৌণিক ভরবেগ, অথবা স্পিন ইত্যাদির সম্পর্কের কারণেই এমনটি ঘটে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ কণিকা দুটির উৎস এমন হতে পারে যে একটি স্পিন আপ হলে অন্যটি স্পিন ডাউন হতে বাধ্য হয়। এখানে ব্যাপারটি নাটকীয় হয়ে ওঠে যখন এই দুটি বিজড়িত কণিকার একটিকে অন্যটি থেকে অনেক দূরে, এমনকি কোটি মাইল দূরেও নিয়ে যাওয়া হয়। তখনো এরা কিন্তু বিজড়িতই থাকবে; উপরের উদাহরণে একটির স্পিন বিশেষ কোন দিকে স্থাপিত হলে অন্যটি সঙ্গে সঙ্গে সেই দিকেই উল্‌টো স্পিন গ্রহণ করবে– এবং তা করবে 'তাৎক্ষণিক' ভাবে প্রথমটিকে অনুসরণ করে। অর্থাৎ কিনা প্রথমটি থেকে ঘটনাটির খবর তাৎক্ষণিক অন্যটিতে যাবে– যা আলোর গতির চেয়ে বেশি এবং আইনস্টাইনের আলোর গতির থেকে বেশি গতির কিছু না থাকার নীতির বিরোধী।

ইপিআরের প্রবর্তকরা ওপরে উল্লেখিত অদ্ভুত ঘটনাকে তাঁদের কাল্পনিক এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমেই ভাবতে পেরেছিলেন, আর এজন্যই কোয়ান্টাম তত্ত্বকে অসম্পূর্ণ মনে করে তাকে 'সম্পূর্ণতা' দেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের কাল্পনিক এক্সপেরিমেন্ট পরে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টেও প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে এরকম বিজড়িত অবস্থা কোয়ান্টাম তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এর মধ্যে অসম্পূর্ণ মনে করার মত কিছু নেই। আর এও দেখা গেছে যে সত্যিকার অর্থে এতে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের লঙ্ঘনও ঘটেনা। যে বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থা প্রমাণিত হয়েছে তার একটি দেখা যাক্। এতে ক্যালশিয়াম এটমকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে উত্তেজিত করে তার থেকে নির্গত ফোটনগুলোকে কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থায় পাওয়া যায়। এরকম দুটি ফোটনকে পোলারাইজেশনের দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত অবস্থায় পাওয়া যায়। আলোর তরঙ্গ রূপের মধ্যে তার ক্ষেত্রের কম্পনকে একই সমতলে আনলে তাকে পোলারাইজ হওয়া বলে– এবং এভাবে তাকে ভিন্ন ভিন্ন সমতলে

পোলারাইজড করা যায়। একই ভাবে তাকে ঘূর্ণনের দিক থেকে পোলারাইজ করা যায়। এরই প্রতিফলন ঘটে আলোর ফোটনের পোলারাইজেশনে। ফোটন একটি বোসন যার স্পিনের মান 1। এর চৌম্বক স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার হতে পারে $m_s = +1$ এবং $m_s = -1$। এই মান +1 হবার মানে ফোটনটি বাম ঘূর্ণনের পোলারাইজেশনে রয়েছে, −1 হবার মানে হলো এর ডান ঘূর্ণনের পোলারাইজেশন রয়েছে। তরঙ্গ রূপে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কম্পনের তল তরঙ্গের গতির দিকের সঙ্গে সমকোণে থেকে যখন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে তখনই তা ডান ঘূর্ণনের পোলারাইজেশনে থাকে আর যখন ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে তখন বাম ঘূর্ণনের পোলারাইজেশনে থাকে। এটিই ফোটনের ক্ষেত্রে এই রূপ পায়। ১৯৭৬ সালে বিজ্ঞানী আসপেক্টের এক্সপেরিমেন্ট এভাবে উত্তেজিত ক্যালশিয়াম এটম থেকে পাওয়া বিজড়িত ফোটনের ওপরেই করা হয়েছিলো। তিনি অবশ্য ঘূর্ণন পোলারাইজেশনের বদলে আরো সরাসরি সমতল পোলারাইজেশনের সম্পর্কের দিকটা দেখেছেন। এক্ষেত্রে ভূমি বরাবর পোলারাইজেশন এবং খাড়া পোলারাইজেশন এরকম দুটি অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং এমন সব ফোটন জোড়া সৃষ্টি করা হয় যাতে একটির ভূমি বরাবর পোলারাইজেশন থাকলে অন্যটির খাড়া পোলারাইজেশন থাকার কথা। জোড়ার উভয় সদস্যের মধ্যে এই পোলারাইজেশন মাপার ব্যবস্থা করে সংখ্যা তাত্ত্বিক ভাবে উভয় ক্ষেত্রে ওরকম আশা করা পোলারাইজেশনই পেতে দেখা গেছে। পরে এমনিতরো আরো এক্সপেরিমেন্টে এই সম্পর্ক বজায় থাকতে দেখা গেছে– দুই দল ফোটনের মধ্য অনেক দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও। এসবের থেকে বেশ বোঝা গেছে যে এই বিজড়িত অবস্থা প্রকৃতির একটি অমোঘ নিয়ম। কোন অজানা কৌশলে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে 'সম্পূর্ণ' করে এটিকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই– আপাত দৃষ্টিতে একে যতই অদ্ভুত মনে হোক না কেন।

কণিকা বিজড়িত হয় কী কী ভাবেঃ

ওপরে আসেপেক্টের যে এক্সপেরিমেন্টে ইপিআর ভাবনার প্রথম যে সত্যিকার বাস্তবায়ন দেখানো সম্ভব হয়েছে, এবং এর পর এ ধরণের আরো যে এক্সপেরিমেন্টগুলো হয়েছে তাতে বিজড়িত কণিকা হিসেবে ফোটনকে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই ফোটনের উৎস হলো একই উত্তেজিত ক্যালশিয়াম এটম থেকে ফোটন নিঃসরণে। জন্ম একই জায়গায় হওয়ার কারণেই দুটি ফোটনের মধ্যে কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এমন বিজড়িত কণিকা পাওয়ার

সহজ উপায় হলো এমনি ভাবে একই জায়গায় সৃষ্টি হওয়া ফোটন। কিন্তু এরকম কণিকা পাওয়ার আরো উপায় রয়েছে।

একই উৎস থেকে জন্ম ঘট্‌তে পারে একটি কণিকাকে ভেঙ্গে দুটিতে পরিণত করে। উদাহরণ স্বরূপ উচ্চ শক্তির একটি ফোটন থেকে প্রত্যেকটি তার অর্ধেক শক্তি নিয়ে দুটি ফোটন সৃষ্টি করা যায় যেগুলো বিজড়িত থাকবে। এভাবে বেগুনি রঙের উচ্চ শক্তির লেজারকে বিশেষ কৃস্টালের ওপর ফেল্‌লে এমন কম শক্তির ফোটন জোড়া পাওয়া সম্ভব হয় যা মূল লেজার রশ্মির দুদিকে দুটি বিজড়িত ফোটন চলে যায়। এখানেও একই মূল কণিকা থেকে জন্ম বলেই এরা বিজড়িত।

বিজড়িত কণিকা হিসেবে পাওয়ার জন্য ফোটনই সহজতম বটে, কিন্তু সেটিই সব সময় সব কাজের জন্য সুবিধাজনক নয়। অবশ্য ফোটন ছাড়া অন্য কণিকাকে বিজড়িত অবস্থায় পেতেও আমরা শুরুতে বিজড়িত ফোটন নিয়ে শুরু করতে পারি এবং তাদের থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মে গিয়ে আরো সুবিধাজনক কণিকা পেতে পারি। যেমন ওপরের কায়দায় ফোটন দুটি সৃষ্টির পর সেগুলোকে একই রকম দুটি এটম দিয়ে শোষণ করানো হয়। শোষণের পর এর প্রত্যেকটি এটমের অবস্থা নির্ভর করবে যেই ফোটনটি শোষণ করেছে তার পোলারাইজেশনের ওপর। যেহেতু ফোটন দুটির পোলারাইজেশন পরস্পর বিজড়িত তাই এটম দুটিও বিজড়িত হবে। এভাবে বিজড়িত ফোটনের বদলে বিজড়িত এটম পাওয়ার সুবিধা হলো এটম বস্তুর কণিকা এবং অপেক্ষাকৃত কম গতিশীল– যে দুটি গুণ কোন কোন কাজের জন্য অধিকতর সুবিধাজনক হয়।

ফোটনের সাহায্য না নিয়েও এরকম অন্য বিজড়িত কণিকাও সৃষ্টি করা যায়। যেমন কাছাকাছি থাকা দুটি এটমকে যদি খুব উচ্চ শক্তিতে উত্তেজিত করা যায় তা হলে এগুলো পরস্পর এমন ভাবে বিক্রিয়া করতে পারে যে তাতে কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। সেক্ষেত্রে উভয় এটমের শক্তিমাত্রায় এমনভাবে পরিবর্তন হয় যে একটির উচ্চ ও নিম্ন শক্তিমাত্রার উপরিপাতন অন্যটির উচ্চ ও নিম্ন শক্তিমাত্রার উপরিপাতনের সঙ্গে এক রকম বিপরীত সম্পর্কে সম্পর্কিত– যা পরস্পর কোয়ান্টাম বিজড়িত হবার শামিল। ভবিষ্যতে যে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের পরিকল্পনা করতে আমরা দেখেছি তাতে খুব সম্ভব এরকম এটমই কম্পিউটারের বিট হিসেবে কাজ করবে (কিউবিট), আর তার ফলাফল পাওয়া যাবে বাইরে তার সঙ্গে এভাবে বিজড়িত অন্য এটমে। যে তিনটি প্রক্রিয়ায় বিজড়িত কণিকা পেতে আমরা দেখলাম– একই জায়গায় জন্ম নেয়া দুটি ফোটন, ওই ফোটন থেকে দ্বিতীয় প্রজন্মের কণিকা, অথবা কাছাকাছি

দুই এটমের বিক্রিয়া– সব ক'টিতে আমরা কণিকা দুটিকে একই জায়গায় বা কাছাকাছি থাকতে দেখ্ছি, কোন না কোন ভাবে উভয় কণিকাকে একই ইতিহাসের ভাগিদার হতে দেখ্ছি। পরে এরা পরস্পর থেকে দূরে চলে গেলেও এই ইতিহাস মুছে যায়না। আবার একই কারণে একই ইতিহাসের ভাগিদার নয় এমন দুটি কণিকাকে ধরে এনে কোয়ান্টাম বিজড়িত করার কোন সুযোগ নেই।

সম্পর্ক বজায় রাখা তাৎক্ষণিক, বার্তাটি তাৎক্ষণিক নয়ঃ

আগেই দেখেছি কোয়ান্টাম কম্পিউটারে যে কণিকাকে তথ্য ব্যখ্যা ও প্রক্রিয়া-করণের জন্য 'কিউবিট' হিসেবে ব্যবহার করা হবে তাতে কিউবিটের অবস্থা দেখে কম্পিউটারের ফলাফল জানার জন্য সরাসরি কিউবিটের ওপর পরিমাপ সম্ভব নয়, কারণ তা হলে তার কোয়ান্টাম চরিত্র চুপসে যাবে। সেক্ষেত্রে কম্পিউটার থেকে দূরে থাকা ওই কিউবিট কণিকার সঙ্গে বিজড়িত কণিকার ওপর পরিমাপ করেই কাজটি সারা যায়। যেহেতু এটি কিউবিটের সঙ্গে বিজড়িত, তাই একে দেখেই বুঝতে পারবো কিউবিট্টি কী অবস্থায় আছে।

কম্পিউটারে থাকা কণিকাটিকে আমরা 'ভেতরের কণিকা' বলি এবং বাইরে থাকা এর বিজড়িত কণিকাকে 'বাইরের কণিকা' বলি। মনে করি বাইরের কণিকা কম্পিউটার আর ভেতরের কণিকা থেকে ১০ মাইল দূরে আছে, ভেতরের কণিকা কিউবিট হিসেবে কাজ করতে গিয়ে 0 এবং 1 এই দুই অবস্থার নানা উপরিপাতনে থাকে। যদিও সত্যিকার ক্ষেত্রে করা হয়না, কল্পনার খাতিরে ধরে নেয়া যাক যে কম্পিউটারের কাছের বিজ্ঞানী ওই ভেতরে কণিকাকে মাপলেন এবং উপরিপাতন চুপসে গিয়ে একে 1 অবস্থায় পেলেন (0 অবস্থায়ও পাওয়া যেতো)। যেহেতু বাইরের কণিকা এটির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এর বিপরীত অবস্থায় রয়েছে– তাই পরিমাপের আগ পর্যন্ত এটি ভেতরেরটির সঙ্গে সঙ্গে তাল মিলিয়ে নানা উপরিপাতিত অবস্থায় থাকে। ধরা যাক বাইরের কণিকার কাছের বিজ্ঞানী একে মাপার সিদ্ধান্ত নিলেন। যেই বাইরের কণিকাটিকে মাপা হলো তিনি একে 0 পাবেন, যেহেতু ইতোমধ্যে ভেতরেরটি 1 পাওয়া গেছে। এর থেকে ভেতরেরটির অবস্থা বোঝা যাবে বটে, কিন্তু ভেতরেরটা মেপে 1 পাওয়া গেছে এবং সে কারণেই এখানে 0 এসেছে একথা বাইরের বিজ্ঞানী নিশ্চিত করে বলতে পারবেননা। কারণ এমনোতো হতে পারে যে ভেতরেরটি মাপাই হয়নি, এবং এই 0 পাওয়াটি নেহাৎ বাইরের কণিকাটির মাপার ফলে তার নিজস্ব অবস্থা দিচ্ছে। এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া একমাত্র সম্ভব যখন যিনি ভেতরে মাপছেন আর যিনি বাইরে মাপছেন তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ করা হয় এবং জানা সম্ভব হয়

যে ভেতরেরটি আগেই মাপা হয়েছে কিনা। এই যোগাযোগের জন্য হয় এক জনকে অন্যজনের কাছে যেতে হবে, নয় টেলিফোন বা অন্য কোন রকম সিগন্যালের মাধ্যমে ভেতরের পরিমাপকারীর কাছ থেকে জেনে নিতে হবে– এর কোনটাতেই উভয়ের বার্তা বিনিময়ে আলোর গতির থেকে বেশি গতিতে সম্ভব নয়, তাৎক্ষণিকভাবে তো মোটেই নয়। কাজেই আলোর গতির থেকে অধিক বেগে বার্তা পাঠাতে এই বিজড়িত অবস্থাটি কোন ভাবে কাজে আসবেনা। কারণ বাইরে 0 পাওয়াকে ভেতরেরটির 1 পাওয়ার একটি বার্তা হিসেবে ধরে নেয়া যাবে উভয়ের যোগাযোগের পর। শুধু নিজের কাছের কণিকার অবস্থা দেখে তা সম্ভব নয়। আইনস্টাইনের নিয়ম ভঙ্গ করে এমন বার্তা দেবার কোন সুযোগ নেই, আর তা দেয়া হয়ওনা।

কোয়ান্টাম বিজড়িত অবস্থার ফলে তাৎক্ষণিক ভাবে উভয় কণিকা পরস্পর সম্পর্কিত থাকছে এটি ঠিক, কিন্তু তার ফলে তাৎক্ষণিক বার্তা দেবার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছেনা। এদিক থেকে দেখা যাচ্ছে ইপিআর ধারণার আশঙ্কাটি ঠিক নয়। বিজড়িত অবস্থাটি কোয়ান্টাম তত্ত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ, এই বিজড়িত হওয়া নিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের মধ্য কোন রকম সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হয়নি। অন্তত সে কারণে কোয়ান্টাম তত্ত্বের কোন সংস্কার প্রয়োজন নেই।

কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রথম দিকে একে সবার কাছেই একটি আজব দেশের মত মনে হয়েছিলো, বিজ্ঞানীদের কাছেও। এখন কিন্তু বিজ্ঞানের, এমনকি প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় একে বেশ পরিচিত দৃশ্যপটের মতই মনে করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও চারিদিকের জিনিস নিয়ে যেভাবে আমরা ভাবতে অভ্যস্ত তার কাছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব এখনো একটি আজব দেশ, এবং সব সময় তেমনটিই থাকবে।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরস্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরস্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর।

978-984-95149-8-5